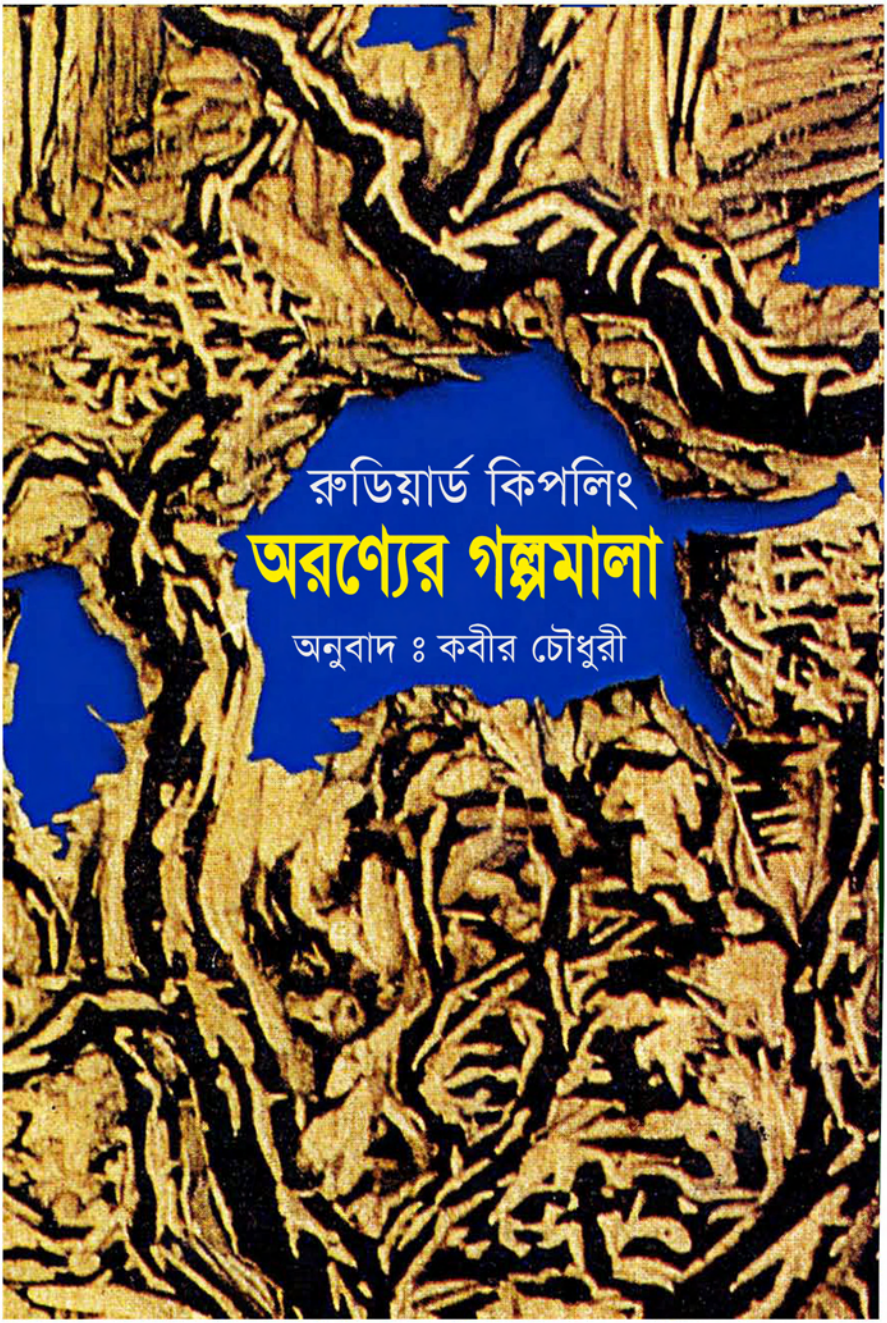
রুডিয়ার্ড কিপলিং
অরণ্যের গল্পমালা
অনুবাদ ঃ কবীর চৌধুরী

রুডিয়ার্ড কিপলিং

অরণ্যের গল্পমালা

অনুবাদ। কবীর চৌধুরী

অন্যপ্রকাশ

banglabooks.in

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৩

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

© | লেখক

অলংকরণ | শেখ সাদী

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ১৪০ টাকা

Aranyer Galpomala | By Kabir Chowdhury
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price : Tk 140 only
ISBN : 984 868 243 0

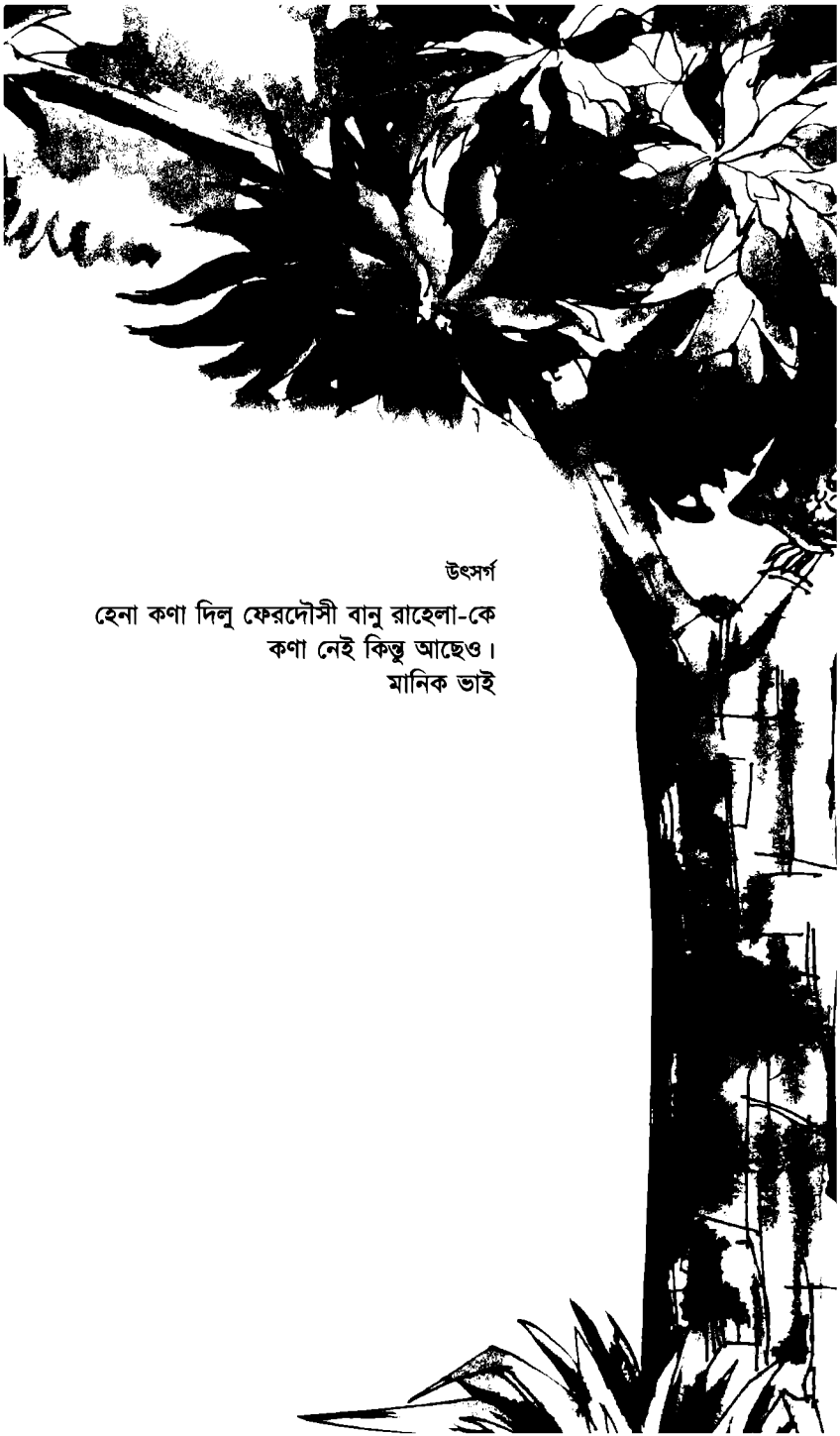

উৎসর্গ

হেনা কণা দিলু ফেরদৌসী বানু রাহেলা-কে
কণা নেই কিন্তু আছেও।
মানিক ভাই

banglabooks.in

ভূমিকা

রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর *দি জাঙ্গল বুক* একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের গল্পমালায় ভারতবর্ষের বনাঞ্চল তার সকল মোহনীয়তা, রহস্য ও আতঙ্ক নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অরণ্যের গাছপালা, পাহাড়পর্বত, নদীনালা ও পশুপাখির জগতকে লেখক যেভাবে পরিবেশন করেছেন তা পাঠককে মুগ্ধ করে। বাঘ, নেকড়ে, হাতি, সাপ, হরিণ, মহিষ, বানর, চিল, ময়ূর, শিয়াল, মৌমাছিসহ অরণ্যের নানা প্রাণী পাঠকের সামনে এসে হাজির হয়। আর এদের মধ্যে স্থান করে নেয় মানবশিশু মৌগলি। তাকে ল্যাংড়া বাঘ শেরখান অরণ্যের নিকটবর্তী এক গ্রাম্যকুটির থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করার আগেই সে আশ্রয় পায় এক নেকড়ে-পরিবারে। সেখানেই সে বেড়ে ওঠে, অরণ্যেরই এক সন্তান রূপে। এই গল্পমালায় সে-ই কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু তার সঙ্গে আছে নেকড়ে-দলপতি আকেলা, তার গুহা-পিতামাতা ও চার নেকড়ে ভাই, তাকে অরণ্যের আইনকানুন ও রীতিনীতি শিক্ষাদানকারী প্রাজ্ঞ ভাল্লুক বালু, বিশালদেহী পাহাড়ি অজগর কা, তার বিশেষ বন্ধু কালো চিতা বাঘিরা এবং আরো অনেকে। এক পর্যায়ে গ্রামের কিছু মানুষও এই গল্পমালায় স্থান করে নেয় মেসুয়া, তার স্বামী, গ্রামের আত্মম্ভরী শিকারি বলদেও প্রমুখ।

কিপলিং একজন অসাধারণ গল্পকার। বর্ণনার গুণে, পরিবেশ সৃষ্টি করার দক্ষতায়, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের রূপায়ণে তিনি পাঠককে প্রতিটি গল্পে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখেন। উপরন্তু, অরণ্যের কাহিনী ও অরণ্যের চমৎকার নীতিমালার মধ্য দিয়ে তিনি সৌজন্য, সাহস, ঔদার্য, বিশ্বস্ততা, মমত্ববোধের মতো মানবিক মূল্যবোধেরও উদ্বোধন ঘটান পাঠকচিত্তে। তবে আসল আকর্ষণ নিহিত থাকে গল্পের মধ্যে, সারাক্ষণ তা পাঠকের কৌতূহল উজ্জীবিত রাখে, প্রতি মুহূর্তে তার মন উত্তেজনায় টানটান হয়ে থাকে।

কিপলিং-এর দি *জাঙ্গল বুক* নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ঈষৎ রূপান্তরিত আকারে এর গল্পগুলি চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। আমি *অরণ্যের গল্পমালা* নামে এই গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করে বর্তমান গ্রন্থে পরিবেশন করলাম। নতুন করে পড়ার সময় *দি জাঙ্গল বুক* আমাকে আবারো গভীর আনন্দ দেয়, যেমন দিয়েছিল অর্ধশতাব্দীরও আগে আমি যখন এগুলি প্রথম পড়ি।

রুডিয়ার্ড কিপলিং জন্মগ্রহণ করেন ভারতের বোম্বাই শহরে, এখন যার নাম মুম্বাই, ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে। তাঁর বাবা জন লকউড কিপলিং ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত লাহোর মিউজিয়ামের কিউরেটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রুডিয়ার্ড কিপলিং পড়াশোনা করেন বিলেতে, কিন্তু সতেরো বছর বয়সে ভারতে ফিরে এসে পত্রিকা সম্পাদনা ও লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম দিকে তিনি কাব্যচর্চা করেন, পরে গল্প-উপন্যাস তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান অঙ্গন হয়ে ওঠে। ভারতের পটভূমিতে রচিত কিপলিং-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'কিম' (১৯০১), 'দি জাঙ্গল বুক' (১৮৯৪), 'ট্র্যাফিকস অ্যান্ড ডিসকভারিজ' (১৯০৪) এবং 'ডেবিটস অ্যান্ড ক্রেডিটস' (১৯২৬)। ব্রিটিশ রাজ-এর পক্ষে লেখালেখির জন্য কিপলিংকে অনেক সময় 'দি পোয়েট অব এম্পায়ার' তথা সাম্রাজ্যের কবি বলে অভিহিত করা হয়, তবে অরণ্যের গল্পমালায় সে জাতীয় অনুভূতির কোনো প্রকাশ ঘটে নি।

তাঁর সাহিত্য-কর্মের উচ্চ মূল্যায়ন করে নোবেল কমিটি ১৯০৭ সালে রুডিয়ার্ড কিপলিংকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। কিপলিং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩৬ সালে।

ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০৩ **কবীর চৌধুরী**

সূচি

মৌগলির ভ্রাতৃবৃন্দ ১১

কা'র শিকার ৩৭

ভয় কীভাবে এলো ৭১

বাঘ! বাঘ! ৯৩

অরণ্যের অনুপ্রবেশ ১১৭

লাল কুকুর ১৫১

বসন্তের দৌড় ১৮৩

মৌগলির ভ্রাতৃবৃন্দ

সিওনি পর্বতমালায় তখন সন্ধ্যা নেমেছে। প্রচণ্ড গরম। সাতটা বাজে তখন। বাবা-নেকড়ে তার দিনের

বিশ্রাম শেষে জেগে উঠে গা-হাত-পা টানটান করল, হাই তুলল, তারপর তার থাবার প্রান্তদেশের জড়তা কাটাবার জন্য একটার পর একটা থাবা সামনে ছড়িয়ে দিল। মা-নেকড়ে তার ধূসর ঝোলা নাক নিয়ে তাকে ঘিরে হুটোপুটি করা চার বাচ্চার সঙ্গে শুয়ে আছে। বাচ্চাগুলি লাফাচ্ছে, খুশিতে চেঁচামেচি করছে। ওরা সবাই যে গুহাটিতে বাস করে তার ভেতরে গুহার মুখ দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাবা-নেকড়ে একটা গরগর ধ্বনি করে বলল, আবার শিকারে বেরুবার সময় হলো। কথাটা বলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে লাফ দেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার চোখের সামনে একটা ছোট ছায়া পড়ল, ঝাঁকড়া লেজবিশিষ্ট, চৌকাঠ পেরিয়ে ঘ্যানঘ্যানে গলায় সে বলল, হে নেকড়ে প্রধান, সৌভাগ্য আপনার সঙ্গী হোক, আর সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক এই মহান শিশুরা, তাদের দন্তরাজি যেন হয় শক্তিশালী এবং শুভ্র, আর তারা যেন এই দুনিয়ার বুভুক্ষুদের কথা কদাপি বিস্মৃত না হয়।

ওটা ছিল শেয়াল— তাবাকি, থালা-চাটা— ভারতের সব নেকড়ে যাকে ঘেন্না করে। তাবাকি সারাক্ষণ গোলমাল পাকায়, নানা কিস্‌সা ছড়ায়, গ্রামের আস্তাকুঁড় থেকে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর চামড়ার টুকরা তুলে তুলে খায়। কিন্তু সবাই তাকে ভয়ও পায়, কারণ অরণ্যের প্রাণীদের মধ্যে পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা তাবাকিরই সব চাইতে বেশি এবং পাগল হয়ে গেলে সে আর কাউকে ভয় করে না। তখন সে কেবল ছোটাছুটি করে, বনের সবকিছুকে কামড়ে দেয়। ওই সময় সবাই তার কাছ থেকে পালায়, এমনকি বাঘও। পাগল হয়ে যাওয়াটা বন্য প্রাণীদের কাছে সবচাইতে জঘন্য ব্যাপার। আমরা এটাকে বলি জলাতঙ্ক কিন্তু ওরা বলে— দেওয়ানি— উন্মত্ততা— আর তখন সবাই তার সামনে থেকে ছুটে পালায়।

বাবা-নেকড়ে গম্ভীর গলায় বলল, এসো ভেতরে, দেখে যাও এখানে কোনো খাবার নেই।

তাবাকি জানাল, হ্যাঁ, নেকড়ের জন্য নেই, কিন্তু আমার মতো তুচ্ছ প্রাণীর জন্য একটা শুকনো হাড্ডিও মস্ত ভোজ। আমরা, এই গিদর-লোক, আমাদের বাছাবাছি করার কি অধিকার আছে?

সে স্যুট করে গুহার পেছনের দিকে চলে গিয়ে সেখানে হরিণের একটা হাড় পেল, তার গায়ে তখনো কিছু মাংস লেগে ছিল। মহানন্দে সে ওই হাড় চিবুতে শুরু করল। তারপর ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, এই চমৎকার খানার

জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সন্তানরা কী সুন্দর দেখতে! কতটুকু বাচ্চা এখনো! কিন্তু, না, আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে রাজার সন্তানরা প্রথম থেকেই পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে।

তাবাকি ঠিকই জানত যে, ছেলেমেয়েদেরকে মুখের সামনে প্রশংসা করতে নেই, বদনজর লাগতে পারে, আর তার কথায় মা আর বাবা-নেকড়ের মুখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে সে মনে মনে খুশি হলো।

এই অপকীর্তিটি করার পর সে স্থির হয়ে বসে থাকল, তারপর বিদ্বেষভরা গলায় বলল, বড় বাঘ শের খান তার শিকারের জায়গা পরিবর্তন করেছে। আগামী চাঁদের দিনগুলিতে সে এই পাহাড়ি এলাকায় শিকার করবে। আমাকে বলেছে শের খান।

কুড়ি মাইল দূরে ওয়েনগুঙ্গা নদীর কাছে বাস করত শের খান নামের বাঘটি।

বাবা-নেকড়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এটা করার কোনো অধিকার ওর নেই। অরণ্যের আইন অনুযায়ী আগে থেকে যথাযথভাবে সতর্ক না করে সে তার আস্তানা পরিবর্তন করতে পারে না। দশ মাইলের মধ্যে শিকার করার মতো যত প্রাণী আছে সব তাহলে ভয় পেয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাবে... অথচ আমাকে... আমাকে এই ক'দিনের মধ্যে কিছু শিকার না করলেই নয়।

মা-নেকড়ে ধীর গলায় বলল, ওর মা ওকে খামকা লেংড়ি নাম দেয় নি। জন্ম থেকেই ওর একটা পা খোঁড়া। সে জন্যই ও গরু ছাগল মারে। ওয়েনগুঙ্গা গাঁয়ের লোকেরা ওর উপর ক্ষেপে গেছে, আর তাই ও আমাদের এখানে আসছে যেন আমাদের গাঁয়ের লোকেরা আমাদের উপর ক্ষেপে ওঠে। ওর জন্য তারা সারা জঙ্গল তছনছ করবে, শের খান তখন থাকবে অনেক দূরে, ওরা ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেবে, আর আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। সত্যিই, শের খানের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই! তাবাকির গলা শোনা গেল— আপনার কৃতজ্ঞতার কথা কি আমি ওকে জানাব? বাবা-নেকড়ে ধমকে উঠল, ভাগো এখান থেকে। যাও, তোমার প্রভুর সঙ্গে গিয়ে শিকার করো। এক রাতের জন্য তুমি যথেষ্ট অপকার করেছ।

তাবাকি শান্ত গলায় বলল, যাচ্ছি। ওই যে নিচের ঝোপজঙ্গল থেকে শের খানের গলা ভেসে আসছে। কষ্ট করে খবরটা দেবার জন্য আমার এখানে আসার কোনো দরকার ছিল না।

বাবা-নেকড়ে কান পেতে শুনল। নিচে ছোট নদী পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকা থেকে ক্রুদ্ধ, শিকার ধরতে না পারা, হিংস্র ও বিরক্ত এক বাঘের শুষ্ক গর্জন ভেসে এলো। সমস্ত অরণ্য সে গর্জন শুনলেও তার যেন কিছু যায় আসে না।

বোকাস্য বোকা! বাবা-নেকড়ে বলল। ওরকম হৈচৈ করে রাতের কাজ শুরু করছে। ও কি মনে করে যে আমাদের হরিণগুলি ওর ওয়েনগুঙ্গার বলদের মতো মোটা?

শ্‌স্! শের খান আজ বলদ কিংবা হরিণ শিকারে বেরোয় নি। আজ ও শিকার করবে মানুষ। মা-নেকড়ে বলল। নিচে বাঘের গলা থেকে এখন বেরুচ্ছে ঘড়ঘড় আওয়াজ, সে আওয়াজ যেন ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে। কাঠুরে আর খোলা মাঠে নিদ্রামগ্ন বেদের দল এই আওয়াজ শুনে হতচকিত হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো সোজা বাঘের মুখে ছুটে যায়।

তার সবগুলি সাদা দাঁত ঝিকিয়ে বাবা-নেকড়ে বলল, মানুষ! কেন, জঙ্গলে কি গুবরে পোকা আর খালে-পুকুরে ব্যাঙের আকাল পড়েছে যে ওকে মানুষ শিকার করতে হবে? তাও আবার আমাদের এলাকায়?

জঙ্গলের আইন কোনো যুক্তিহীন নির্দেশ দেয় না। এই আইন সকল পশুকে মানুষ খেতে নিষেধ করে। ব্যতিক্রম শুধু যখন কোনো পশু তার সন্তানদের শিকার করার কৌশল শেখাতে চায় তখন। তখনো তাকে এই শিকার করতে হবে নিজের দল বা গোষ্ঠীর এলাকার বাইরে গিয়ে। এর প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষ-হত্যার পরিণতিতে আগে হোক কিংবা পরে, হাতির পিঠে চড়ে সাদা চামড়ার মানুষেরা এসে পৌঁছবে, তাদের সঙ্গে আসবে বন্দুক, আর ঢোল-ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শত শত বাদামি চামড়ার মানুষ। আর তখন অরণ্যের সবাই দুঃখ ভোগ করে। পশুরা নিজেদের মধ্যে অবশ্য যে কারণ দেখায় তা এই যে, সকল জীবিত প্রাণীর মধ্যে মানুষই সবচাইতে অসহায় ও প্রতিরক্ষাহীন, তাকে স্পর্শ করা খেলোয়াড়োচিত কাজ নয়। তারা আরো বলে এবং সেটা সত্য— মানুষখেকোদের চামড়ার রোগ দেখা দেয়, তাদের দাঁত পড়ে যায়। এই সময় ঘড়ঘড় আওয়াজটা বৃদ্ধি পেল, শেষে রূপান্তরিত হলো প্রচণ্ড হুঙ্কারে। বাঘ এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তারপর শের খানের গলা থেকে একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো, অব্যাঘ্রজনোচিত চিৎকার। মা-নেকড়ে বলল, শিকার ফস্কে গেছে। কী ওটা?

বাবা-নেকড়ে কয়েক পা ছুটে বাইরে এল। সে শের খানকে ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি করে হিংস্রভাবে কী সব বিড়বিড় করতে শুনতে পেল।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে বাবা-নেকড়ে বলল, বোকাটার মাথায় কোনো বুদ্ধি নেই। কাঠুরেদের পাশে রাখা আগুনের কুণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও তার পা পুড়িয়েছে। তাবাকি আছে ওর সঙ্গে।

এই সময় মা-নেকড়ে এক কান খাড়া করে বলে উঠল, পাহাড় বেয়ে কিছু একটা উপরে ওঠে আসছে। তৈরি হও।

ঝোপটা একটু নড়ে উঠল, বাবা-নেকড়ে গুঁড়ি মেরে, লাফ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মাটিতে অবস্থান নিল। তারপরই, আপনি যদি সেখানে উপস্থিত থাকতেন, পৃথিবীর সবচাইতে আশ্চর্য একটি দৃশ্য আপনার চোখে পড়ত— লাফ দেবার পর মাঝপথে একটা নেকড়ের থমকে থেমে যাওয়ার দৃশ্য। কিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা দেখার আগেই সে লাফ দিয়েছিল, তারপরই সে নিজেকে থামাতে চেষ্টা করে। ফল হলো এই যে, সে সোজা আকাশের দিকে তিন-চার ফুট উঠে গেল, তারপর প্রায় যেখান থেকে লাফ দিয়েছিল, সেখানেই মাটিতে ধপ করে নেমে এলো।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলল, মানুষ! একটা মানুষের বাচ্চা। দেখো! ঠিক তার সামনে ছোট একটা গাছের শাখা ধরে বাদামি রঙের ছোট্ট একটি শিশু দাঁড়িয়ে আছে, সবে হাঁটতে শিখেছে, ন্যাংটা, টোল পড়া গাল— কোনো নেকড়ের গুহার সামনে এরকম কোনো কিছুর আবির্ভাব ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। বাচ্চাটা বাবা-নেকড়ের দিকে মুখ উঁচু করে হেঠে উঠল।

মানুষের বাচ্চা ? মা-নেকড়ে বলল। আমি কোনো দিন মানুষের বাচ্চা দেখি নি। ওটাকে আমার কাছে নিয়ে আসো।

নিজের বাচ্চাকে বহন করতে অভ্যস্ত একটা নেকড়ে, প্রয়োজন হলে, না ভেঙে একটা ডিম পর্যন্ত মুখে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আর তাই বাবা-নেকড়ের চোয়াল শিশুটির পিঠে চেপে বসলেও তার চামড়ায় একটা দাঁতের আঁচড়ও পড়ল না। সে বাচ্চাটাকে এনে নিজের বাচ্চাদের পাশে শুইয়ে দিল।

কোমল কণ্ঠে মা-নেকড়ে বলল, ইস্, কতটুকুন রে! ন্যাংটাপুটো— আর, আর কেমন সপ্রতিভ!

মানবশিশুটি গরম ত্বকের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য নেকড়ে-শিশুদের মধ্য দিয়ে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে গেল।

আরে! ও যে ওদের সঙ্গে নিজেও খেতে লেগে গেছে। তাহলে এই হলো মানুষের বাচ্চা। নিজের সন্তানদের সঙ্গে একটা মানবসন্তানের কথা কি আর কোনো নেকড়ে কোনোদিন গর্ব করে বলতে পেরেছে ?

বাবা-নেকড়ে বলল, আমি মাঝে মাঝে এরকম কথা শুনেছি বটে, কিন্তু আমাদের দলে কিংবা আমার জীবনে আমি তেমন কোনো ঘটনার কথা শুনি নি। দেখো, দেখো, গায়ে একটা রোমও নেই। পায়ের সামান্য খোঁচায় ওকে এক মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারি। কিন্তু, দেখো, কেমন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এক রত্তি ভয়ডর নেই।

এমন সময় গুহামুখ দিয়ে চাঁদের আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ হলো। বিরাট চৌকো মাথা আর বিশাল কাঁধ নিয়ে শের খান সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পেছনে তাবাকি চিঁচিঁ করে বলে উঠল, হুজুর, হুজুর, ওটা এর মধ্যে ঢুকে গেছে। বাবা-নেকড়ে বলল, শের খান আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত করলেন। একথা বললেও বাবা-নেকড়ের চোখে জ্বলে উঠল ক্রোধের আগুন। তো, শের খান এখানে কী চান ? শের খান বলল, আমার শিকার। একটা মানবশিশু এদিকে এসেছে। ওর বাবা-মা পালিয়ে গেছে। আমাকে দাও আমার শিকার!

শের খান কাঠুরেদের আগুনের কুণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের পা পুড়িয়ে ফেলেছিল। দগ্ধ পায়ের যন্ত্রণায় সে তখন ক্ষিপ্ত। কিন্তু বাবা-নেকড়ে জানত যে অত সঙ্কীর্ণ গুহামুখ দিয়ে কোনো বাঘেরই প্রবেশ করার সাধ্য নেই। বর্তমান অবস্থাতেই শের খানের সামনের পা দু'টি ও কাঁধ জায়গার অভাবে চিপ্টে যাচ্ছিল। একটা মানুষ পিপার মধ্যে বসে যুদ্ধ করতে চাইলে যেমন হতো শের খানের অবস্থা এখন প্রায় সেরকম।

বাবা-নেকড়ে বলল, নেকড়েরা স্বাধীন প্রাণী। তাদের যাবতীয় নির্দেশ আসে তাদের নিজেদের দলপতির কাছ থেকে। গরুমারা, ডোরাকাটা, কারো হুকুম পালন করতে তারা বাধ্য নয়। এই মানবশিশু আমাদের। যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমরা একে হত্যা করব।

কী এই সব ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ? কী মানে এর ? এই আমি দিব্যি গেলে বলছি, আমার ন্যায্য হিস্যার জন্য কি আমাকে তোমাদের এই কুত্তার ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? আমি, শের খান কথা বলছি, আর কেউ নয় !

বাঘের গর্জনে সারা গুহা যেন বাজের আওয়াজে ভরে গেল। মা-নেকড়ে গা ঝেড়ে বাচ্চাদের সরিয়ে এক লাফে সামনে এগিয়ে এল। তার চোখ অন্ধকার রাতে দু'টি সবুজ চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছে। সে শের খানের জ্বলন্ত চোখের

উপর চোখ রেখে বলল, আর আমি হলাম অসুর রক্ষা, আমি তোমার কথার জবাব দিচ্ছি। শোনো, লেংড়ি, এই মানবশিশু আমার, আমার! ওকে মারা যাবে না। ও আমাদের দলে থাকবে, দলের সঙ্গে বেড়ে উঠবে, দৌড়াবে, শিকার করবে এবং অবশেষে, শোনো, ছোট্ট ন্যাংটা শিশু-ঘাতক, ব্যাঙ-খেকো, মাছ-শিকারি— অবশেষে সে একদিন তোমাকে শিকার করবে। এবার দূর হও এখান থেকে, নইলে আমি যে শম্বর হরিণটা মেরেছি তার নামে শপথ করে বলছি (আমি কোনো উপোসী গরুছাগল খাই না), তুমি, অরণ্যের ঝলসানো পশু, তুমি যখন তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাবে তখন তোমার জন্মলগ্নের চাইতেও বেশি খোঁড়া হবে তোমার অবস্থা! এবার পালাও!

বাবা-নেকড়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে একদা আর পাঁচটা নেকড়ের সঙ্গে ন্যায্যভাবে লড়াই করে মা-নেকড়েকে জিতে নিয়েছিল। ও তখন দলের সঙ্গে ছুটে বেড়াত আর ওই সময় প্রশংসাসূচকভাবেও তাকে অসুর-রক্ষা ডাকা হতো না। মা-নেকড়ের সেই দিনগুলির কথা বাবা-নেকড়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। শের খান বাবা-নেকড়ের মুখোমুখি হতে পারত, কিন্তু মা-নেকড়ের মুখোমুখি নয়, কারণ সে খুব ভালোভাবেই জানত যে, সে এখন যেখানে আছে সেখানে মা-নেকড়ের অবস্থান অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং ও মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যাবে। তাই সে গরগর করতে করতে গুহামুখ থেকে সরে এলো, তারপর নিরাপদ দূরত্বে এসে চেঁচিয়ে বলল, সব কুকুরই নিজের উঠোনে ঘেউ ঘেউ করে। মানবশিশু লালন করার বিষয়ে দল কী বলে আমরা সেটা দেখব। ওই শিশু আমার এবং শেষ পর্যন্ত ও আমার দাঁতেই আসবে। বুঝলে, ঝাঁকড়া লেজের চোরেরা ?

মা-নেকড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাচ্চাদের পাশে শুয়ে পড়ল। বাবা-নেকড়ে গম্ভীর মুখে তাকে উদ্দেশ করে বলল, শের খান একটা সত্য কথা বলেছে। দলের সামনে এই শিশুকে দেখাতে হবে। তুমি কি তবু ওকে রাখতে চাও ?

রাখতে চাই ? মা-নেকড়ে ঘন ঘন শ্বাস টেনে বলল, ও রাতের বেলা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, ন্যাংটা, একা, ক্ষুধার্ত, তবু কত নির্ভয়! দেখো, এর মধ্যে আমার এক বাচ্চাকে কেমন ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়েছে। আর ওই ল্যাংড়া কসাইটা ওকে মেরে ফেলত, তারপর ওয়েনগুঙ্গাতে পালিয়ে যেত, আর তখন আমাদের গাঁয়ের মানুষগুলি প্রতিশোধ নেবার জন্য আমাদের সব আস্তানায় হানা দিত। রাখতে চাই ? অবশ্য আমি ওকে রাখতে চাই। চুপ করে শুয়ে থাকো, বাচ্চা ব্যাঙ সোনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মৌগলি— ব্যাঙ-মৌগলি— ওটাই

তোমার নাম। এবং একদিন আসবে যখন আজ শের খান যেভাবে তোমাকে শিকার করতে চেয়েছে সেইভাবে তাকে তুমি শিকার করবে।

কিন্তু আমাদের দল কী বলবে ? বাবা-নেকড়ে প্রশ্ন করল। অরণ্যের আইনের বিধান খুব পরিষ্কার। কোনো নেকড়ে তার বিয়ের পর নিজের দল থেকে আপন পথে সরে যাবে, কিন্তু তার বাচ্চারা চলতে ফিরতে পারার মতো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দলীয় পরিষদমণ্ডলীর সামনে তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। সাধারণত প্রতি মাসে পূর্ণিমার রাতে দলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য অন্য নেকড়েরা যেন বাচ্চাদের চিহ্নিত করে রাখতে পারে। পরিদর্শন সমাপ্ত হবার পর বাচ্চারা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে এবং তাদের হরিণ শিকার করবার আগে দলের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নেকড়ে কোনো অজুহাতেই তাদের কাউকে হত্যা করতে পারবে না। করলে, হত্যাকারীর খোঁজ পাওয়া গেলে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। আর একটু চিন্তা করে দেখলেই আপনি দেখবেন যে এরকম হওয়াই উচিত।

তার বাচ্চারা একটু ছোটাছুটি করতে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত বাবা-নেকড়ে অপেক্ষা করল। তারপর দলীয় সভার দিন নিজের বাচ্চা, মৌগলি, আর মা-নেকড়েকে নিয়ে সভার টিলামঞ্চে গিয়ে হাজির হলো। পাথর আর বড় বড় শিলাখণ্ডে পূর্ণ ওই পাহাড়ি টিলায় একশো নেকড়ে লুকিয়ে থাকতে পারে। আকেলা, বিরাটদেহী ধূসর নিঃসঙ্গ নেকড়ে, নিজস্ব পাথরের উপর সারা শরীর লম্বা করে শুয়ে আছে। শক্তি আর চাতুর্য দিয়ে সে দলকে পরিচালিত করে আসছে। তার নিচে নানা আকার ও রঙের চল্লিশ-পঞ্চাশটা নেকড়ে বসে আছে। ওদের মধ্যে যেমন আছে প্রবীণ ধূসর রঙের নেকড়ে, যারা একাই একটা বড় হরিণ ঘায়েল করতে পারে, তেমনি আছে কালো রঙের তিন বছরের নবীন নেকড়ে যারা ভাবে যে তারাও ওই রকম করতে সক্ষম। নিঃসঙ্গ নেকড়ে আকেলা এ ক'বছর ধরে এদের সবার নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। তার যুবক-বয়সে সে দুবার নেকড়ের ফাঁদে ধরা পড়েছিল, একবার প্রচণ্ড মারের পর মৃত ভেবে তাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। অতএব মানুষের স্বভাব ও আচার পদ্ধতি তার ভালো জানা ছিল।

টিলার উপরে কথাবার্তা বিশেষ হচ্ছিল না। বৃত্তের মাঝখানে নেকড়ে-বাচ্চারা হুটোপুটি করছিল। তাদের ঘিরে বসেছিল বাচ্চাদের মা-বাবা। মাঝে-মাঝে একটি বয়স্ক নেকড়ে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে কোনো একটি নেকড়ে-বাচ্চাকে মনোযোগ দিয়ে দেখে আবার নিঃশব্দ পায়ে নিজের জায়গায় এসে বসছে।

ও একটা মানুষ, একটা মানুষের বাচ্চা, আর আমি ওকে ঘৃণা করি আমার অস্থিমজ্জার অন্তঃস্থল থেকে!

কখনো কখনো কোনো মা তার বাচ্চাকে চাঁদের আলোয় সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেন বাচ্চাটা দলের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। আকেলা তার শিলাখণ্ডের উপর থেকে উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকে, তোমরা আইন জানো— তোমরা আইন জানো। ও নেকড়ে-দল, ভালো করে দেখো ! আর উদ্বেগাকুল মায়েরা ওই ডাক নিজেদের গলায় তুলে নিয়ে বলতে থাকল, দেখো, ভালো করে দেখো, ও নেকড়ের দল!

অবশেষে— যখন তার পালা এলো, মা নেকড়ের ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল— বাবা-নেকড়ে ব্যাঙ-মৌগলিকে, ওই নামেই তারা ওকে ডাকত, বৃত্তের মাঝখানে ঠেলে এগিয়ে দিল। ও সেখানে বসে হাসছিল তখন, আর চন্দ্রালোকে চকচক করা কয়েকটা পাথরের টুকরো নিয়ে আপন মনে খেলছিল।

আকেলা নিজের প্রসারিত থাবার উপর থেকে মাথা একবারও না তুলে তার একঘেয়ে ডাক ডেকেই যাচ্ছিল— দেখো ভালো করে। টিলার পেছন দিক থেকে এই সময় একটা চাপা গর্জন শোনা গেল— শের খানের চিৎকার— ওই বাচ্চা আমার জিনিস। আমাকে দাও। মানুষের বাচ্চা দিয়ে স্বাধীন প্রাণীকুলের কী প্রয়োজন ?

আকেলা তার কান পর্যন্ত নাড়াল না, শুধু বলল, ভালো করে দেখো, ও নেকড়ে দল! স্বাধীন প্রাণীকুলের নিজেদের নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ নিয়ে কী করবার আছে ? দেখো, ভালো করে দেখো !

এবার একযোগে কয়েকটি ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। তারপর চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করা একটি তরুণ নেকড়ে আকেলার প্রতি শের খানের প্রশ্নই ছুঁড়ে দিল— মানুষের বাচ্চা দিয়ে স্বাধীন প্রাণীকুলের কী প্রয়োজন ?

এখন অরণ্যের আইনের নির্দেশ অনুযায়ী দল কর্তৃক কোনো বাচ্চা গৃহীত হওয়ার প্রশ্নে বিতর্ক দেখা দিলে তার মা-বাবা ছাড়া দলের অন্য দুজন সদস্যকে বাচ্চার পক্ষে মত দিতে হবে।

আকেলা বলল, কে এই শিশুর পক্ষে কথা বলবে ? স্বাধীন প্রাণীকুলের মধ্য থেকে কে কথা বলবে ?

কেউ কথা বলল না, আর মা-নেকড়ে নিঃশব্দে তৈরি হয়ে নিল। যদি শেষ পর্যন্ত লড়তে হয় তাহলে, সে জানত, এইটেই হবে তার শেষ লড়াই।

তখন অন্য যে একটিমাত্র প্রাণীর নেকড়েদের দলীয় পরিষদমণ্ডলীর সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি আছে সেই বালু, নিদ্রাতুর ধূসর রঙের একটি ভালুক, যে নেকড়েশিশুদের অরণ্যের আইন শেখায়, বুড়ো বালু, যে তার ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যাওয়া-আসা করতে পারে, কারণ সে শুধু বাদাম, শিকড়-বাকড়, আর মধু খায় — সেই বালু তার পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোঁত করে একটা শব্দ করল। তারপর বলল, এই মানবশিশুটি— মানুষের এই বাচ্চা— আমি তার পক্ষে কথা বলছি। একটা মানুষের বাচ্চার মধ্যে ক্ষতিকর কিছু নেই। আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না কিন্তু আমি যা বলছি তা সত্য। ওকে দলের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে দাও, অন্যদের সঙ্গে সেও দলভুক্ত হোক। আমি নিজে তাকে সবকিছু শেখাব। আকেলা বলল, আরো একজন চাই। বালু তার মতামত দিয়েছে, সে আমাদের বাচ্চা-নেকড়েদের শিক্ষক। বালু ছাড়া আর কে বলবে ?

ঝুপ করে বৃত্তের মাঝখানে একটা কালো ছায়া নামল। এ হলো কালো চিতা বাঘিরা, সর্বাঙ্গ কালির মতো কালো, শুধু বিশেষ আলোয় তার গায়ে সিল্কের প্যাটার্নের মতো চিতার ফুটকিগুলি চোখে পড়ে। বাঘিরা সবার চেনা। কেউই তার পথের সামনে পড়তে চাইত না, কারণ বাঘিরা ছিল তাবাকির মতো ধূর্ত, বন্য মহিষের মতো দুঃসাহসী, আর আহত হাতির মতো বেপরোয়া। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ছিল গাছ থেকে ঝরে পড়া বুনো মধুর মতো কোমল, আর তার গায়ের ত্বক ছিল পালকের চাইতেও নরম।

সে অনুমোদনের ভঙ্গিতে বলল, ও আকেলা, আর তোমরা, স্বাধীন প্রাণীকুল, তোমাদের সভায় আমার কিছু বলার অধিকার নেই, কিন্তু অরণ্যের আইন বলে যে, কোনো নতুন শিশু সম্পর্কে যদি বিতর্ক দেখা দেয়, যা হত্যার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, তাহলে সেই শিশুর প্রাণ একটা বিশেষ মূল্যে কিনে নেয়া যায়। এবং কে সেই মূল্য দিতে পারবে, কে পারবে না, সে সম্পর্কে আইন কিছুই বলে না। আমি ঠিক বলেছি?

তরুণ নেকড়েগুলি, সব সময় যারা ক্ষুধার্ত, হৈহৈ করে বলল, উত্তম! উত্তম! সবাই বাঘিরার কথা শোনো। একটা মূল্যে শিশুটিকে কেনা যাবে। সেটাই আইন।

আমি জানি যে এখানে কথা বলার আমার কোনো অধিকার নেই, তাই আমি তোমাদের অনুমতি চাই।

বিশটি কণ্ঠ সমস্বরে বলল, বলো, বলো।

একটা ন্যাংটা শিশুকে হত্যা করা লজ্জাজনক কাজ। তা ছাড়া বড় হলে সে হয়তো তোমাদের জন্য ভালো খেলার সাথী হবে। বালু তার পক্ষে কথা বলেছে। এখন বালুর কথার সঙ্গে আমি যোগ করছি একটি ষাঁড়, মোটা-তাজা, সদ্য মেরেছি আমি, এখান থেকে আধ মাইলেরও কম দূরত্বে পড়ে আছে, তোমরা যদি আইনের বিধান অনুযায়ী মানবশিশুটিকে গ্রহণ করো— এটা করা কি খুব কঠিন?

তখন অনেকগুলো কণ্ঠ শোনা গেল, হৈহৈ করে তারা বলল, ক্ষতি কী? শীতকালের বৃষ্টিতে ও মরে যাবে। গ্রীষ্মের গরমে ও ঝলসে যাবে। একটা ন্যাংটা ব্যাঙ আমাদের কী ক্ষতি করতে পারবে? দলের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করুক ও। ষাঁড়টা কোথায় বাঘিরা? হ্যাঁ, ওকে গ্রহণ করে নেয়া যাক। তখন আকেলা তার ভারি গম্ভীর গলায় বলল, ভালো করে দেখো, ভালো করে দেখো, ও নেকড়ের দল!

মৌগলি তখনো একাগ্র চিত্তে পাথরের টুকরোগুলি নিয়ে খেলছিল। নেকড়েরা একের পর এক এসে তাকে দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু মৌগলি তা লক্ষও করল না।

অবশেষে ওরা সবাই পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিহত ষাঁড়ের সন্ধানে চলে গেল। সেখানে রইল শুধু আকেলা, বাঘিরা, বালু আর মৌগলির আপন নেকড়েরা। শের খান রাতের অন্ধকারে তখনো গর্জাচ্ছিল, কারণ মৌগলিকে তার হাতে তুলে না দেয়ায় তার ক্রোধ ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। বাঘিরা গোঁফের আড়াল থেকে বলল, হ্যাঁ, গর্জন করো খুব ভালো করে, কারণ একটা সময় আসবে যখন এই ন্যাংটা কচি বাচ্চাই তোমার গলা থেকে ভিন্ন চিৎকার বের করে আনবে। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে মানুষ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

আকেলা বলল, কাজটা ভালোই হয়েছে। মানুষ আর তার শিশুরা খুব জ্ঞানী। এই শিশু এক সময় কাজে আসতে পারে।

সত্যিকার প্রয়োজনের মুহূর্তেও হয়তো সাহায্য করতে পারবে। চিরদিনের জন্য কেউ দলের নেতৃত্ব দেবে তেমনটা আশা করা যায় না।

আকেলা কোনো কথা বলল না। সে ভাবছিল যে প্রত্যেক দলের প্রত্যেক নেতার ক্ষেত্রেই একটা সময় আসে যখন তার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়, দিন-দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তখন নেকড়েরা তাকে হত্যা করে, একজন নতুন নেতার অভ্যুদয় ঘটে– আর তার পালা এলে সেও ওই একইভাবে নিহত হয়।

সে বাবা-নেকড়েকে উদ্দেশ করে বলল, ওকে নিয়ে যাও, আর স্বাধীন প্রাণীকুলের উপযুক্ত করে তাকে প্রশিক্ষিত করে তোলো।

আর এভাবেই একটা ষাঁড়ের মূল্য ও বালুর সুপারিশের জোরে মৌগলি সিওনি নেকড়ে-দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখন আপনাকে দশ-এগারো বছরের ইতিহাস বাদ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং নেকড়েকুলের মধ্যে মৌগলি কী আশ্চর্য জীবন যাপন করেছিল তা শুধু কল্পনা করে নিতে হবে, কারণ সেসব কথা বলতে গেলে অনেকগুলি বই-এর দরকার হবে। নেকড়ে-শিশুদের মধ্যে সে বড় হয়ে ওঠে, যদিও সে ছোট থাকতেই ওরা প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক নেকড়ে হয়ে উঠেছিল। বাবা-নেকড়ে জঙ্গলের বিভিন্ন জিনিসের কী অর্থ তা তাকে ভালোভাবে শেখায়। ঘাসের প্রতিটি মরমর ধ্বনি, রাতের তপ্ত বাতাসের প্রতিটি নিঃশ্বাস, মাথার উপর প্যাঁচার ডাকের

প্রতিটি সুর, গাছের শাখা থেকে ঝুলে থাকা বাদুড়ের ডালের গায়ে নখের প্রতিটি আঁচড়ের শব্দ, জলের মধ্যে প্রতিটি ছোট মাছের লেজ ঝাপটানোর আওয়াজ— এই সব কিছুর অর্থ মৌগলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে শিখল, একজন ব্যবসায়ী যেমন তার নিজের আপিসের কাজকর্ম শিখে নেয় ঠিক সেইভাবে। শেখার কাজ স্থগিত থাকলে সে রোদে বসে থাকত আর ঘুমাত, তারপর খেত আর আবার ঘুমাত। যখন তার নিজেকে অপরিষ্কার মনে হতো বা গরম লাগত তখন বনের জলাশয়গুলোতে সে সাঁতার কাটত। মধু খেতে ইচ্ছা করলে সে তার সন্ধানে গাছে উঠত। বালু তাকে বলেছিল সে কাঁচা মাংসের মতো মধু আর বাদামও সমান সুস্বাদু, আর গাছে কীভাবে চড়তে হয় বাঘিরা সেটা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। বাঘিরা একটা গাছের ডালে শুয়ে ডাক দিত— এসো, ছোট্ট ভাইটি আমার। আর প্রথম দিকে মৌগলি একটি অত্যন্ত শ্লথগতি ছোট্ট পোকার মতো গাছের ডাল আঁকড়ে পড়ে থাকত, কিন্তু পরে ধূসর বানরের মতোই সে গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে দ্রুত উঠে যেতে শিখে গেল। দলীয় পরিষদমণ্ডলীর সভাতেও সে যোগ দিল এবং সেখানে সে একটা জিনিস আবিষ্কার করল। যদি কোনো নেকড়ের চোখের দিকে সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাহলে ওই নেকড়েকে চোখ নামিয়ে নিতে হয়, সে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। এটা জানার পর থেকে মৌগলি মাঝে মাঝে মজা করার জন্যই কোনো একটা নেকড়ের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। অন্যান্য সময় সে তার বন্ধুদের পায়ের পাতা থেকে লম্বা লম্বা কাঁটা তুলে দিত। নেকড়ের পায়ে কাঁটা আর গায়ে চোরকাঁটা আটকে থাকলে তাদের কষ্টের সীমা থাকত না। রাতের বেলায় মৌগলি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে শস্যক্ষেতের দিকে চলে যেত। সেখানে সে কুটিরের বাসিন্দা গ্রামবাসীদের লক্ষ করত কৌতূহলের সঙ্গে। কিন্তু মানুষ সম্পর্কে তার মনে একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব ছিল। বাঘিরা তাকে একদিন জঙ্গলের মধ্যে সুকৌশলে লুকানো একটা চৌকো ঝাঁপ দেয়া বাক্স দেখিয়েছিল। মৌগলি প্রায় তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল। বাঘিরা ওকে বলে দেয় যে, ওটা একটা ফাঁদ। সে সব চাইতে বেশি ভালোবাসত রাতের অন্ধকারে বাঘিরার সঙ্গে অরণ্যের উষ্ণ প্রাণকেন্দ্রে যেতে, তন্দ্রাচ্ছন্ন সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমাতে, রাতের বেলায় বাঘিরা কীভাবে তার শিকার কব্জা করে তা দেখতে। খিদে পেলে বাঘিরা ডানে-বাঁয়ে নির্বিচারে শিকার করত, মৌগলিও তাই করত— শুধু একটা ব্যতিক্রম ছিল। বাঘিরা তাকে বলেছে সে যেন কখনোই গবাদিপশু হত্যা না করে, কারণ দলে তাকে কিনে নেয়া হয়েছে একটা

ষাঁড়ের জীবনের মূল্যে। সমস্ত অরণ্যই তোমার। তোমার শক্তি থাকলে তুমি সবকিছু মারতে পারবে কিন্তু যে ষাঁড়ের প্রাণের মূল্যে তোমাকে কেনা হয়েছে তার খাতিরে তুমি কখনো কোনো গরু-বাছুর মারবে না কিংবা তাদের মাংস খাবে না, তারা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এই হলো অরণ্যের আইন। মৌগলি এ আইন বিশ্বস্ততার সঙ্গে মেনে চলেছে।

যে ছেলে জানেই না যে সে শিখে চলেছে, এ পৃথিবীতে খাওয়ার কথা ছাড়া যার ভাবনার আর কোনো কিছুই নেই, সে যেমন নিশ্চিতভাবে বেড়ে ওঠে, গায়ে জোর হয় তার, মৌগলির ক্ষেত্রেও তাই হলো।

মা-নেকড়ে তাকে দু'একবার বলেছে যে, শের খান এমন একটি প্রাণী যাকে বিশ্বাস করা যায় না এবং একটা দিন আসবে যখন শের খানকে তার হত্যা করতে হবে। একটি তরুণ নেকড়ে এই পরামর্শ দিনের প্রতিটি ঘণ্টা মনে রাখলেও মৌগলি তা ভুলে যেত— কারণ সে ছিল একটি মনুষ্য বালকমাত্র, সে যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত তাহলে নেকড়ে বলেই সে নিজের পরিচয় দিত।

জঙ্গলের ভেতর শের খানের সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা হতো। আকেলা দিন দিন বুড়ো আর দুর্বল হয়ে গেলে শের খান দলের তরুণ নেকড়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলল। তার কাছ থেকে খাবারের টুকরো-টাকরা পাবার জন্য ওরা শের খানের পেছন পেছন ঘুরত। আকেলার যদি নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি প্রয়োগের সামর্থ্য থাকত তা হলে সে এটা কখনোই হতে দিত না। এই অবস্থায় শের খান তরুণ নেকড়েদের খোশামোদ করে বলতে লাগল যে, তাদের মতো শিকারিরা কেমন করে একটা মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ো নেকড়ে আর একটা মানবশিশুর নেতৃত্ব মেনে চলছে, এটা সে বুঝতে পারে না। শের খান বলত, আমি শুনলাম দলীয় সভায় তোমরা ওর চোখে চোখ রাখতে ভয় পাও। তরুণ নেকড়েরা একথা শুনে রাগে গরগর করে উঠত, তাদের গায়ের রোম খাড়া হয়ে যেত।

বাঘিরা, যে সবকিছু লক্ষ করত, সবকিছু শুনত, এ ব্যাপারটিও কিছু কিছু জেনেছিল। দু'একবার সে মৌগলিকে বলেও ছিল যে শের খান একদিন তাকে হত্যা করবে। কিন্তু মৌগলি হেসে জবাব দিত, আমার সঙ্গে দল আছে, তুমি আছ, আর বালুও আছে। বালু যত অলসই হোক আমার জন্য দু'একটা ঘুসি নিশ্চয় লাগাবে। আমি কেন ভয় করব ?

খুব গরম একদিনে বাঘিরার মনে নতুন একটা ধারণা জন্ম নিল। কোথাও সে কথাটা শুনেছিল। সম্ভবত ইক্কি শজারু তাকে বলেছিল।

একদিন সে আর মৌগলি যখন গভীর অরণ্যে, বাঘিরার সুন্দর কালো গায়ে মৌগলি যখন তার মাথা রেখে শুয়েছিল, তখন বাঘিরা তাকে বলল, ছোট ভাইটি আমার, আমি তোমাকে কতবার বলেছি যে শের খান তোমার শত্রু ?

তো মৌগলি গুনতে জানত না, তাই সে জবাব দিল, ওই হাতে যতগুলি বাদাম আছে ততবার। কিন্তু তাতে কী ? আমার এখন ঘুম পাচ্ছে, বাঘিরা। আর শের খানের আছে শুধু লম্বা লেজ আর বড় বড় কথা, মাও নামের ময়ূরটার মতো।

কিন্তু এখন ঘুমানোর সময় নয়। বালু সেকথা জানে, আমি জানি, দল জানে। এমনকি বোকা হরিণরাও জানে। তাবাকি তো তোমাকেও বলেছে।

হো! হো! মৌগলি হাসল। অল্প ক'দিন আগে তাবাকি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বাজে কথা বলেছিল। আমি একটা ন্যাংটা মানুষের বাচ্চা, আমি শুয়োরের বাদাম কুড়োবারও যোগ্য নই ইত্যাদি। আমি তখন তাবাকিকে ভদ্রতা শেখাবার জন্য তার লেজ ধরে তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে দু'বার তালগাছের গায়ে ঠুকে দিয়েছিলাম।

বোকার মতো কাজ হয়েছে সেটা। তাবাকি সারাক্ষণ নানা শয়তানি করলেও তোমাকে হয়তো তোমার জানা দরকার এমন কোনো খবর দিত। ছোট্ট ভাইটি, চোখ দুটো খোলো। শের খান জঙ্গলে তোমাকে হত্যা করতে সাহস পাবে না। কিন্তু মনে রেখো, আকেলা বুড়ো হয়ে গেছে, এমন দিন আসবে যখন সে আর তার হরিণ মারতে পারবে না, আর তখন সে আর দলের নেতা থাকবে না। তোমাকে যখন প্রথম আমাদের দলীয় সভায় আনা হয় তখন যেসব নেকড়ে তোমাকে ভালো করে দেখেছিল তারাও এখন বুড়ো হয়ে গেছে। আর শের খানের কথাবার্তা শুনে তরুণ নেকড়েরা মনে করে যে, দলের মধ্যে মানুষের বাচ্চার কোনো স্থান নেই। আর অল্প দিনের মধ্যে তুমি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হবে।

কিন্তু একটা মানুষ কি তার ভাইদের সঙ্গে চলতে ফিরতে দৌড়াতে পারবে না, মৌগলি বলল। আমি জন্মেছি জঙ্গলে। আমি অরণ্যের আইন মেনে চলেছি। আমাদের মধ্যে এমন একটি নেকড়েও নেই যার পায়ের পাতা থেকে আমি কাঁটা তুলে দিই নি। নিশ্চয়ই ওরা আমার ভাই।

বাঘিরা টানটান হয়ে শুয়ে তার চোখ দুটি অর্ধেক বন্ধ করে বলল, ছোট্ট ভাইটি, আমার চোয়ালের নিচে হাত দিয়ে দেখো।

মৌগলি তার বলিষ্ঠ বাদামি হাত বাঘিরার রেশমের মতো কোমল চিবুকের নিচে স্থাপন করল। ঢেউ খেলানো বিশাল পেশিগুলি চকচকে রোমের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। মৌগলির হাত গিয়ে লাগল রোমহীন ছোট্ট একটা জায়গায়। বাঘিরা বলল, শোনো, জঙ্গলের কেউ একথা জানে না যে, আমার, এই বাঘিরার গলায়, গলবন্ধের চিহ্ন আছে। ছোট্ট ভাইটি, আমার জন্ম হয়েছিল মানুষের মধ্যে, আর আমার মা মারা যায় মানুষের মধ্যেই, উদয়পুরের মহারাজার প্রাসাদের খাঁচার ভেতর। এই কারণেই তোমার ছোট্ট ন্যাংটা শিশু অবস্থায় দলের সভায় আমি তোমার দাম দিই। হ্যাঁ, আমিও জন্মগ্রহণ করি মানুষের মধ্যে। জঙ্গল আমি কখনো দেখি নি। ওরা আমাকে শিকের ভেতর দিয়ে একটা লোহার পাত্রে খাবার দিত। কিন্তু এক রাতে আমি অনুভব করলাম যে, আমি বাঘিরা— কালো চিতা বাঘিরা, কোনো মানুষের খেলনা নয়, আর তখন আমি আমার থাবার এক আঘাতে ওদের ঠুনকো তালা ভেঙে চলে আসি। আর যেহেতু মানুষের আচার-আচরণ আমার জানা ছিল সেহেতু আমি জঙ্গলে শের খানের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠি। তাই না ?

হ্যাঁ, মৌগলি বলল। সারা জঙ্গল বাঘিরাকে ভয় করে— মৌগলি ছাড়া সবাই।

কালো চিতা খুব নরম গলায় বলল, ওহ্, তুমি তো মানবশিশু। আর আমি যেমন জঙ্গলে ফিরে এসেছি তোমাকেও তেমনি একদিন মানুষের কাছে ফিরে যেতে হবে, যে মানুষ তোমার ভাই— যদি না দলীয় সভায় তোমাকে হত্যা করা হয়।

কিন্তু কেন— আমাকে কেউ হত্যা করতে চাইবে কেন ? মৌগলি বলল।

আমার দিকে তাকাও, বাঘিরা বলল। মৌগলি এক দৃষ্টিতে ওর দু'চোখের মাঝখানে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। আধ মিনিটের মধ্যে বড় চিতা তার চোখ সরিয়ে নিল।

ঝরা পাতার উপর নিজের থাবা একটু সরিয়ে বাঘিরা বলল, এই জন্য। আমি পর্যন্ত তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না, যে-আমি মানুষের মধ্যে জন্মেছি, যে-আমি তোমাকে ভালোবাসি, ছোট ভাইটি আমার। ওরা তোমার চোখে চোখ রাখতে পারে না বলে তোমাকে ঘৃণা করে— তুমি জ্ঞানী

সেই জন্য তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি ওদের পা থেকে কাঁটা তুলে দিয়েছ সেই জন্য ওরা তোমাকে ঘৃণা করে— ওরা তোমাকে ঘৃণা করে কারণ তুমি একজন মানুষ।

গোমড়ামুখ করে মৌগলি বলল, আমি এসব জানতাম না। তারপর সে তার ঘন কালো ভ্রুযুগল কুঞ্চিত করল।

শোনো মৌগলি, বাঘিরা বলল, জঙ্গলের নিয়ম কী? প্রথমে আঘাত হানা, তারপর কথা। তোমার অসতর্কতার জন্যই ওরা জানে যে, তুমি একজন মানুষ। একটু বুঝতে চেষ্টা কর। কিছুদিন ধরে প্রতিটি হরিণ শিকারের জন্য আকেলাকে ক্রমাগত বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। আমার মন বলছে শিগগিরই একদিন আকেলা তার শিকার ঘায়েল করতে ব্যর্থ হবে, আর তখন দল তার বিরুদ্ধে চলে যাবে, আর তোমার বিরুদ্ধেও। তারা টিলার উপর দলের সভা বসাবে আর তখন— আর তখন— এই তো, এই তো আমি পেয়ে গেছি! বাঘিরা লাফ দিয়ে উঠে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি উপত্যকায় চাষীদের কুটিরের দিকে যাও। ওরা সেখানে লাল ফুলের চাষ করে, তুমি ওই ফুলের কিছুটা নিয়ে এসো। তাহলে যখন সময় আসবে তখন আমার কিংবা বালুর কিংবা দলের যে-কজন তোমাকে ভালোবাসে তাদের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী একজন মিত্র তুমি পাবে। যাও, লাল ফুল নিয়ে এসো।

লাল ফুল বলতে বাঘিরা আগুন বোঝাচ্ছিল। জঙ্গলের কোনো প্রাণী সরাসরি আগুনের নাম নেয় না। সব পশু আগুনকে যমের মতো ভয় করে, আর তার উল্লেখ করে হাজারটা ভিন্নভাবে, ভিন্ন ভঙ্গিতে।

লাল ফুল? মৌগলি বলল। সন্ধ্যার সময় চাষীদের কুটিরে যা ফুটে থাকে? ঠিক আছে, আমি কিছু নিয়ে আসব।

বাঘিরা সগর্বে বলল, এই তো মানুষের বাচ্চার মতো কথা। মনে রেখো, ছোট ছোট পাত্রে ওই ফুল ফোটে। তাড়াতাড়ি একটা পাত্র নিয়ে আসো, আর তোমার সঙ্গে রাখবে সেটা, যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগাতে পার।

হ্যাঁ, মৌগলি বলল। আমি যাচ্ছি, কিন্তু ও আমার বাঘিরা, সে কালো চিতার অসামান্য সুন্দর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি কি নিশ্চিত যে এইসব শের খানের কাণ্ড?

যে ভাঙা তালা আমাকে মুক্তি দিয়েছে তার নামে শপথ করে বলছি, ছোট ভাইটি, আমি সত্যিই নিশ্চিত।

তাহলে যে ষাঁড়ের মূল্যে আমাকে কেনা হয়েছে সেই ষাঁড়ের নামে আমি বলছি, এর জন্য শের খানকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেব, তার চাইতে বরং বেশিই দেব।

এই তো একটা মানুষ। পুরো মানুষ। বাঘিরা বলল আপন মনে, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। শের খান, দশ বছর আগের তোমার ওই ব্যাঙ-শিকারের চাইতে দুর্ভাগ্যজনক শিকার আর তুমি কখনো করো নি।

মৌগলি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জোরে জোরে দৌড়াতে লাগল। বুকে হাঁফ ধরে গেল তার। সাঁঝের কুয়াশা নামতে শুরু করেছে তখন। মৌগলি একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেদের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। বাচ্চারা তখন গুহায় নেই, কিন্তু মা-নেকড়ে গুহার পেছনদিকে শুয়েছিল। মৌগলির নিঃশ্বাসের ধরন শুনেই সে বুঝল যে একটা কিছু তার আদরের ব্যাঙকে বিচলিত করেছে।

কী হয়েছে, বাছা ?

বাইরে থেকেই মৌগলি বলল, শের খানের গালগল্প। আজ রাতে আমি চাষীদের ক্ষেত-এলাকায় শিকার করব। বলেই সে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে উপত্যকার তলদেশে স্রোতস্বিনীর দিকে দ্রুতবেগে নেমে গেল। তারপর সে একটু থামল। নেকড়ে-দল শিকারে বেরিয়েছে। তার শব্দ শুনতে পেল সে। তাড়া খাওয়া একটা শম্বর হরিণের ডাক তার কানে এল। হরিণটার পালাবার পথ বন্ধ। তরুণ নেকড়েরা তীক্ষ্ণ অশোভন চিৎকার করতে শুরু করেছে, আকেলা ! আকেলা ! নিঃসঙ্গ নেকড়েকে তার শক্তির পরিচয় প্রদর্শন করতে দাও। দলপতির জন্য জায়গা ছাড়ো। ঝাঁপিয়ে পড়ো, আকেলা !

নিঃসঙ্গ নেকড়ে নিঃসন্দেহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তার শিকারকে ভালো করে পাকড়াতে ব্যর্থও হয়েছিল, কারণ মৌগলি আকেলার দাঁতের কিড়মিড় শব্দ শুনল, তারপরই একটা চাপা গর্জন। শম্বরটা তার সামনের দুপায়ের প্রচণ্ড আঘাতে আকেলাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে।

মৌগলি আর অপেক্ষা করল না। সে ছুটে চলল, তার পেছনে নেকড়েদের চিৎকারের শব্দ ক্ষীণ হয়ে এলো। সে ছুটে গেল চাষীদের ক্ষেত-খামারের দিকে, গাঁয়ের মানুষদের বাস যেখানে।

একটা ন্যাংটা ব্যাঙ আমাদের কী ক্ষতি করতে পারবে? দলের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করুক ও।

একটা কুটিরের জানালার পাশে গবাদিপশুর জন্য রাখা খড়ের গাদায় আরাম করে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মৌগলি বলল, বাঘিরা ঠিকই বলেছে। কাল আকেলা ও আমার জন্য একটা চূড়ান্ত দিন হবে।

সে জানালার গায়ে নিজের মুখ চেপে ধরল। মেঝেতে অগ্নিকুণ্ডের জায়গায় রক্ষিত আগুনটা সে লক্ষ করল মনোযোগ দিয়ে। চাষী-বউ রাতে উঠে তাকে কালো কালো কয়েকটা টুকরা খাওয়াল। তারপর ভোর হলে কুয়াশা যখন সাদা আর ঠাণ্ডা, তখন সে ওদের ছোট ছেলেটাকে দেখল। সে ভেতরে মাটির শক্ত আস্তর দেয়া একটা বেতের পাত্র হাতে তুলে নিল। আগুন-লাল কয়লার টুকরো দিয়ে পাত্রটা পূর্ণ করল, তারপর সে গরুর তদারকি করার জন্য গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মৌগলি মনে মনে বলল, ব্যস, এইটুকুই ? একটা ছোট ছেলে যদি পারে তাহলে ভয়ের কী আছে ? সে কোনা ঘুরে ছেলেটির মুখোমুখি হলো, তারপর ওর হাত থেকে পাত্রটা নিজের হাতে নিয়ে চোখের নিমেষে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছেলেটি তখন ভয়ে আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। মৌগলি চাষী-বউকে পাত্রে ফুঁ দিতে দেখেছিল। সে-ও ওইভাবে ফুঁ দিতে দিতে বলল, ওরা একদম আমার মতো দেখতে। এখন আমি যদি এটাকে কিছু খেতে না দিই তাহলে তো এটা মরে যাবে। সে কিছু ডালপালা আর গাছের শুকনো বাকল লাল জিনিসটার উপর ফেলে দিল। পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠে সে বাঘিরাকে দেখতে পেল। সকালের কুয়াশা তার গায়ে মুক্তাবিন্দুর মতো ঝিলমিল করছিল।

চিতা বলল, আকেলা শিকার ধরতে পারে নি, ওরা তাকে গত রাতেই হত্যা করত, কিন্তু ওরা তোমাকেও চাইছিল। পাহাড়ের সর্বত্র ওরা তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে।

কাল রাতে আমি চাষীদের ক্ষেত-এলাকায় শিকার করেছি। দেখো, আমি প্রস্তুত। মৌগলি তার অগ্নিপাত্র তুলে ধরল।

খুব ভালো। আমি মানুষকে এর মধ্যে গাছের শুকনো শাখা গুঁজে দিতে দেখেছি, তখন ওর মাথায় লাল ফুল ফুটে ওঠে। তুমি ভয় পাচ্ছ না, মৌগলি ?

না। ভয় পাব কেন ? এখন আমার মনে পড়ছে— যদি স্বপ্নে না দেখে থাকি— আমি তখনো নেকড়ে হই নি, তার আগের কথা, আমি এই রকম লাল ফুলের পাশে শুয়ে থাকতাম, কী মিষ্টি গরম আর আরাম লাগত।

মৌগলি দিনভর গুহায় বসে তার অগ্নিপাত্রের পরিচর্যা করল, তার মধ্যে শুকনো ডালপালা ফেলে দিলে কী রকম দেখায় তা মন দিয়ে লক্ষ করল। গাছের একটা শাখা তার পছন্দ হলো। সন্ধ্যার দিকে তাবাকি গুহায় এসে রূঢ়ভাবে তাকে জানাল যে টিলার সভায় তার ডাক পড়েছে। শুনে মৌগলি এমনভাবে হাসল যে তাবাকি ছুটে পালিয়ে গেল। তারপর মৌগলি সভায় গিয়ে হাজির হলো। তখনো সে হাসছে। নিঃসঙ্গ নেকড়ে আকেলা তার শিলাখণ্ডের পাশে শুয়ে আছে। তার মানে দলের নেতৃত্ব এখন উন্মুক্ত। শের খান তার এটোকাঁটার প্রসাদ পাওয়া অনুগামী নেকড়েদের নিয়ে প্রকাশ্যে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা তার চাটুকারিতায় ব্যস্ত। বাঘিরা মৌগলির খুব কাছে শুয়ে আছে। অগ্নিপাত্রটা মৌগলি তার দু'হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে। সবাই জড়ো হবার পর শের খান কথা বলতে শুরু করল— আকেলা পূর্ণ ক্ষমতায় থাকলে যা সে কখনোই করতে সাহস পেতো না।

বাঘিরা ফিসফিস করে বলল, ওর কথা বলার কোনো অধিকার নেই। তুমি বলে দাও সবাইকে। ও একটা কুত্তার বাচ্চা। ভয় পাবে।

মৌগলি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সে উচ্চ কণ্ঠে বলল, স্বাধীন প্রাণীকুল, শের খান কি দলের নেতৃত্ব দেয় ? আমাদের দলের নেতৃত্বের ব্যাপারে একটা বাঘের কী বলার আছে ?

যেহেতু নেতৃত্বের ব্যাপারটা এখনো উন্মুক্ত এবং আমাকে বলতে বলা হয়েছে— শের খান আরম্ভ করল।

কে বলতে বলেছে ? মৌগলি প্রশ্ন করল। আমরা কি সবাই শেয়াল যে গরুমারা একটা কসাইর পা চাটতে হবে ? দলের নেতৃত্বের বিষয় দলই ফয়সালা করবে।

নানা দিক থেকে নানা চিৎকার উঠল। চুপ কর তুমি, মানুষের বাচ্চা !

ওকে বলতে দাও, ও আমাদের আইন মেনে চলেছে। অবশেষে দলের প্রধান কয়েকজন গর্জন করে উঠল, মরা-নেকড়েকে বলতে দাও!

দলের নেতা যখন শিকারে ব্যর্থ হয় তখন যতদিন সে বেঁচে থাকে ততদিন তাকে মরা-নেকড়ে বলে ডাকা হয়, অবশ্য তার জীবনকাল এই ঘটনার পর সচরাচর আর খুব দীর্ঘ হয় না।

আকেলা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তার বৃদ্ধ মাথাটি উঁচু করে বলল, স্বাধীন প্রাণীকুল, আর তোমরা শের খানের শেয়ালরা, তোমরাও শোনো। অনেক বছর ধরে তোমাদেরকে শিকারের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমি নেতৃত্ব দিয়েছি এবং আমার সময়ে তোমাদের কেউ ফাঁদে ধরা পড়ো নি, কারো অঙ্গহানি হয় নি। এখন আমি আমার শিকারকে ঘায়েল করতে ব্যর্থ হয়েছি। তোমরা জানো যে, একটা চক্রান্ত করে এটা করা হয়েছে। আমার দুর্বলতা প্রচার করার জন্য তোমরা আমাকে একটা অপরীক্ষিত হরিণের দিকে নিয়ে যাও। খুব চালাকির সঙ্গে এ কাজটা করা হয়েছে। এখন এই টিলার উপরে আমাকে হত্যা করার অধিকার তোমাদের আছে। অতএব আমি জিজ্ঞাসা করছি, নিঃসঙ্গ নেকড়ের জীবনের ইতি টানার জন্য কে এগিয়ে আসবে ? জঙ্গলের আইন অনুযায়ী আমি দাবি করছি, তোমাদেরকে এক এক করে আসতে হবে।

একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। কোনো একক নেকড়েই আকেলার সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে নামতে উৎসাহ বোধ করল না। তখন শের খান গর্জে উঠল,

বাহ্! একটা দন্তহীন বেকুবকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কী আছে ? ওর মৃত্যু এমনিতেই অবধারিত ! আসলে এই মানুষের বাচ্চাটাই বড় বেশি দিন বেঁচেছে। স্বাধীন প্রাণীকুল, প্রথম থেকেই ওটা ছিল আমার মাংস, আমার খাদ্য। ওকে আমার হাতে তুলে দাও। এই মানুষ-নেকড়ের বোকামি আমার আর সহ্য হয় না। দশ বছর ধরে ও জঙ্গলকে বহু জ্বালিয়েছে। মানবসন্তানটিকে আমার হাতে তুলে দাও, নইলে আমি সর্বদা এখানেই শিকার করব আর তোমাদের কাউকে একটা হাড়ও দেব না। ও একটা মানুষ, একটা মানুষের বাচ্চা, আর আমি ওকে ঘৃণা করি আমার অস্থিমজ্জার অন্তঃস্থল থেকে !

এবার দলের অর্ধেকেরও বেশি নেকড়ে চিৎকার করে উঠল, একটা মানুষ ! একটা মানুষ ! আমাদের সঙ্গে একটা মানুষের কী সম্পর্ক ? ও চলে যাক তার নিজের জায়গায়।

আর গ্রামের সব লোকজনকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিক ? শের খান হৈহৈ করে বলল। না, ওকে আমার হাতে তুলে দাও। ও একটা মানুষ, আর আমরা কেউই ওর চোখে চোখ রাখতে পারি না।

আকেলা আবার তার মাথা তুলে বলল, ও আমাদের খাবার খেয়েছে। ও আমাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। আমাদের জন্য ও শিকার তাড়িয়ে এনেছে। অরণ্যের কোনো আইন ও ভঙ্গ করে নি।

আর ওকে যখন দলে গ্রহণ করা হয় তখন আমি একটা ষাঁড় দিয়ে ওর দাম দিয়েছি। একটা ষাঁড়ের মূল্য খুব বেশি নয়, কিন্তু বাঘিরার সম্মানের মূল্যের জন্য বাঘিরা হয়তো লড়াই করবে। এই কথাগুলি বাঘিরা বলল তার সবচাইতে শান্ত কোমল স্বরে।

দল চাপা গর্জন করে উঠল, দশ বছর আগে দেয়া একটা ষাঁড়! আমাদের কাছে দশ বছরের পুরনো হাড়ের কী মূল্য ? কিংবা কী মূল্য একটা প্রতিশ্রুতির ?

তার তীক্ষ্ণ সাদা দন্তরাজি উন্মোচিত করে বাঘিরা বলল, তা তোমরা কি নিজেদের স্বাধীন প্রাণীকুল বলে অভিহিত কর ?

শের খান আবারো গর্জে উঠল, কোনো মানবসন্তান অরণ্যের লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবে না। দাও, ওকে আমার হাতে তুলে দাও।

আকেলা তার আগের কথার খেই ধরে বলল, রক্তের বন্ধন ছাড়া আর সবদিক থেকেই ও আমাদের ভাই, তবু তোমরা ওকে এখানেই হত্যা করতে

চাও ? সত্যিই আমি বড় বেশি দিন বেঁচেছি। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন আছো গরুবাছুর-খেকো, আর অন্যদের সম্পর্কে আমি শুনেছি যে, শের খানের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে তোমরা এখন অন্ধকার রাতে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের দোরগোড়া থেকে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে আসো। কাজেই আমি জানি যে তোমরা সব ভীরু কাপুরুষ, আর আমি এখন এই ভীরু কাপুরুষদের উদ্দেশ করেই বলছি। এটা নিশ্চিত যে, আমি মৃত্যুবরণ করব, আর আমার জীবনেরও কোনো মূল্য নেই, তা না হলে ওই মানবশিশুর জায়গায় আমি আমার নিজের প্রাণ তোমাদের হাতে তুলে দিতাম। কিন্তু দলের সম্মানের খাতিরে— নেতা না থাকায় ওই তুচ্ছ ব্যাপারটার কথা তোমরা হয়তো ভুলে গেছো— আমি কথা দিচ্ছি, তোমরা যদি এই মানবশিশুকে তার নিজের জায়গায় যেতে দাও তাহলে আমার মৃত্যুর সময় যখন আসবে তখন তোমাদের কারো গায়ে আমি আমার একটি দাঁতও বসাব না। আমি বিনা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করব। এর ফলে দলের অন্তত তিনটি জীবন রক্ষা পাবে। এর বেশি আর আমার করার নেই, কিন্তু তোমরা চাইলে, যে ভাইয়ের কোনো অপরাধ নেই, অরণ্যের আইন অনুযায়ী যে ভাইয়ের পক্ষে কথা বলা হয়েছে, অরণ্যের আইন অনুযায়ী যাকে দলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই ভাইকে হত্যা করার লজ্জা থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি।

দল আবারো খেঁকিয়ে উঠল, ও একটা মানুষ—মানুষ—মানুষ! বেশিরভাগ নেকড়ে এবার শের খানের চারপাশে জড়ো হলো, আর শের খানের লেজ মাটিতে শপশপ করে আছড়ে পড়তে শুরু করল।

বাঘিরা মৌগলিকে বলল, এখন সব তোমার হাতে। লড়াই করা ছাড়া আমরা নিজেরা আর কিছুই করতে পারব না। মৌগলি তখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার হাতে অগ্নিপাত্র। সে দুহাত প্রসারিত করল, দলীয় পরিষদমণ্ডলীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাই তুলল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে রাগে আর ক্ষোভে সে ফেটে পড়ছিল, কারণ নেকড়ে জনোচিতভাবেই নেকড়েরা কখনোই ওকে বুঝতে দেয় নি ওরা ওকে কতখানি ঘৃণা করে। সে চিৎকার করে বলল, তোমরা সবাই শোনো ! কুকুরের মতো এইরকম ঘেউঘেউ করার কোনো আবশ্যকতা নেই। আমি তোমাদের সঙ্গে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নেকড়ে হয়েই থাকতাম, কিন্তু আজ রাতে তোমরা আমাকে বারবার বলেছ যে, আমি মানুষ, আর আমি এখন অনুভব করছি যে তোমাদের কথাই ঠিক। অতএব আর আমি

তোমাদেরকে ভাই বলে ডাকব না, ডাকব কুকুর বলে, একটা মানুষের যেভাবে ডাকা উচিত। তোমরা কী করবে আর কী করবে না, সেটা বলবার তোমরা কেউ নও। সেটা আমি ঠিক করব। আমরা যেন ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বুঝতে পারি, সে জন্য আমি, মানুষ, সামান্য কিছু লাল ফুল নিয়ে এসেছি, তোমরা, কুকুররা, যাকে ভয় পাও।

সে অগ্নিপাত্রটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লাল কয়েক টুকরো কয়লা একগুচ্ছ শুকনা শ্যাওলার উপর পড়ে তাকে প্রজ্জ্বলিত করল, আর লেলিহান অগ্নি শিখার সামনে থেকে ভয়ে সমগ্র পরিষদমণ্ডল পেছনে হটে গেল।

মৌগলি তার হাতের মরা ডালটা আগুনের মধ্যে গুঁজে দিল, শুকনো শাখা-প্রশাখাগুলি জ্বলে উঠল, মটমট শব্দ করল, আর মৌগলি ডালটা নিজের মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে ভীত কম্পমান নেকড়েদের দিকে এগিয়ে গেল।

বাঘিরা নিচু গলায় বলল, তুমিই এখানে কর্তা। আকেলাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও। সে সবসময় তোমার বন্ধু ছিল।

আকেলা, কঠোর বয়োবৃদ্ধ নেকড়ে, জীবনে কখনো কারো দয়া চায় নি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৌগলি, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, দীর্ঘ কালো চুল কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, দুলছে, প্রজ্বলিত ডালের আলোয় ছায়াগুলি লাফাচ্ছে, কাঁপছে। আকেলা তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল।

খুব ভালো, ধীরে ধীরে চারদিকে তাকিয়ে মৌগলি বলল, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা সবাই কুকুর। আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার নিজের লোকজনের কাছে চলে যাচ্ছি— যদি তারা আমার নিজের লোকজন হয়। অরণ্য আমার জন্য রুদ্ধ, আর আমাকে ভুলে যেতে হবে তোমাদের কথাবার্তা আর তোমাদের সাহচর্য, কিন্তু তোমাদের চাইতে বেশি দয়া দেখাব আমি। যেহেতু শুধু রক্তের বন্ধন ছাড়া আর সব দিক দিয়েই আমি ছিলাম তোমাদের ভাই, সেহেতু আমি কথা দিচ্ছি যে, আমি যখন মানুষের সমাজে একজন মানুষ হয়ে থাকব তখন আমি তাদের কাছে তোমাদের সম্পর্কে কোনো প্রতারণামূলক আচরণ করব না, যেমন আচরণ তোমরা করেছ আমার সঙ্গে। সে আগুনের গায়ে পা দিয়ে একটা লাথি মারল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বে উত্থিত হলো। আমাদের কারো সঙ্গে দলের কোনো লড়াই হবে না। কিন্তু যাবার আগে এখানে আমার একটা ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

শের খান যেখানে অগ্নিশিখার সামনে হাবার মতো বসে চোখ পিটপিট করছিল, মৌগলি সেখানে দ্রুত দৃঢ় পায়ে এগিয়ে তার চিবুকের নিচের কেশগুচ্ছ টেনে ধরল। পাছে কোনো অঘটন ঘটে এই আশঙ্কায় বাঘিরা মৌগলির পেছন পেছন গেল। মৌগলি চিৎকার করে বলল, উঠে দাঁড়াও, কুকুর ! মানুষ যখন কথা বলবে তখন উঠে দাঁড়াবে, বুঝলে ? নইলে তোমার গায়ের ওই চামড়ায় আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

শের খানের কান দুটি তার মাথার পাশে লেপ্টে নেতিয়ে পড়েছে, তার চোখ দুটি বন্ধ, জ্বলন্ত গাছের ডালটি তখন তার খুবই কাছে।

আমার ছোটবেলায় গরু-বাছুরের এই হত্যাকারী আমাকে মারে নি সেই জন্য দলীয় সভায় আমাকে হত্যা করার কথা সে বলেছে। দেখো, আমরা যখন মানুষ তখন আমরা এইভাবে কুকুর পেটাই। তোমার গোঁফ এক চুল নাড়ালে, লেংড়ি, সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার গলার মধ্যে এই লাল ফুল ঠুসে ঢুকিয়ে দেব। সে তার হাতের ডাল দিয়ে শের খানের মাথায় মারতে লাগল, আর বাঘটা প্রচণ্ড ভয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁউ কেঁউ আর আর্ত চিৎকার করতে থাকল।

বাহ্! আগুনে ঝলসানো বনের বেড়াল, এবার যাও এখান থেকে ! কিন্তু মনে রেখো, আমি যখন পরের বার টিলা-মঞ্চের সভায় আসব তখন একজন মানুষের যেভাবে আসা উচিত সেইভাবে শের খানের চামড়া মাথায় দিয়ে আসব। আর— আকেলা মুক্ত স্বাধীনভাবে তার যেখানে খুশি সেখানে বাস করবে। তোমরা তাকে হত্যা করবে না, কারণ সেটা আমার ইচ্ছা। আর, আমার মনে হয়, তোমরা তোমাদের জিভ বার করে, যেন তোমরা কুকুর নও বরং কেউকেটা, এখানে বেশিক্ষণ বসে থাকবে না, তোমরা কুকুরই, আর আমি তোমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছি— এইভাবে ! যাও !

ডালের মাথায় আগুন তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। মৌগলি বৃত্তের চারপাশে, ডানে বাঁয়ে, আঘাত করল আর নেকড়েরা আগুনের ফুলকিতে তাদের ঝলসানো চামড়া নিয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটে পালাল। অবশেষে সেখানে রইল শুধু আকেলা, বাঘিরা, আর মৌগলির পক্ষাবলম্বনকারী গোটা দশেক নেকড়ে। তখন মৌগলি তার ভেতরে একটা প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করল। এরকম যন্ত্রণা সে তার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো বোধ করে নি। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আর তার গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কী এটা ? কী এটা ? সে বলে উঠল। আমি জঙ্গল ছেড়ে যেতে চাই না। আমি জানি না কী এটা। আমি কি মরে যাচ্ছি, বাঘিরা ?

না, ছোট ভাইটি। এ শুধু চোখের জল, মানুষ ব্যবহার করে। আমার কাছে এটা এখন স্পষ্ট যে, তুমি আর মানবশিশু নও, তুমি একজন পূর্ণ মানুষ। এখন থেকে জঙ্গল যথার্থই তোমার জন্য রুদ্ধ। পড়তে দাও, মৌগলি, ওগুলি শুধু অশ্রুজল।

অতএব মৌগলি বসে বসে কাঁদল, মনে হলো যেন তার বুক ফেটে যাচ্ছে। এর আগে সারা জীবনে সে কখনো এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করে নি।

তারপর মৌগলি বলল, এবার আমি মানুষের কাছে যাব। তার আগে আমাকে আমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। মা-নেকড়ে যে গুহায় বাবা-নেকড়ের সঙ্গে থাকে মৌগলি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো, তারপর মা-নেকড়ের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল, আর বাচ্চা চারটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল।

তোমরা আমাকে ভুলে যাবে না ? মৌগলি বলল। বাচ্চাগুলি বলল, যতদিন পর্যন্ত আমরা চিহ্নরেখা অনুসরণ করতে পারব ততদিন কিছুতেই ভুলব না। তুমি যখন মানুষ হবে তখন পাহাড়ের পায়ের কাছে এসো, আমরা তোমার সঙ্গে গল্প করব, তারপর রাতের বেলায় তোমার সঙ্গে খেলা করার জন্য আমরা চাষীদের ক্ষেত এলাকায় যাব।

বাবা-নেকড়ে বলল, শিগগির এসো। ওহ্, প্রাজ্ঞ ক্ষুদে ব্যাঙ, আবার শিগগির এসো। তোমার মার আর আমার দুজনেরই বয়েস হয়েছে।

মা-নেকড়ে বলল, শিগগির এসো, আমার ছোট্ট ন্যাংটা ছেলে। শোনো, মানবশিশু, আমি আমার বাচ্চাদের যত ভালোবেসেছি তার চাইতে বেশি ভালোবেসেছি তোমাকে।

আমি নিশ্চয়ই আসব, মৌগলি বলল। আর এবার যখন আসব তখন আসব দলীয় সভার টিলায় শের খানের চামড়া বিছিয়ে দেবার জন্য। আমাকে ভুলে যেও না। জঙ্গলের সবাইকে বলো, ওরা যেন আমাকে ভুলে না যায়!

মৌগলি যখন একাকী মানুষ নামের ওই রহস্যময় জিনিসগুলির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচে নেমে গেল তখন ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

কা'র শিকার

চিতার ফুটকি হলো তার গৌরব,
মোষের শিং তার অহঙ্কার।
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে সর্বদা,

কারণ শিকারির শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়
তার ত্বকের উজ্জ্বল মসৃণতায়।
যদি দেখো যে ষাঁড় তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে
দিতে পারে
কিংবা জবরদস্ত শিংওয়ালা সম্বর হরিণ
ফুটো করে দিতে পারে তোমার শরীর
তাহলে আমাদের সতর্ক করে দেবার জন্য
তোমাদের কাজ থামাবার কোনো প্রয়োজন নেই।
এসব আমরা জানি বহু যুগ আগে থেকেই।
অচেনা প্রাণীর শিশুদের নির্যাতন করো না,
বরং নিজের ভাই বোন হিসেবে তাদের
স্বাগত জানাও।
কারণ তারা তো ছোট ও অসহায়,
কিন্তু ভালুক তাদের মা।
বাচ্চা শিশু তার প্রথম শিকারের
আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে,
আমার মতো আর কেউ নেই,
কিন্তু অরণ্য হলো বিশাল,
আর শিশুটি হলো ছোট্ট।
ভাবতে শিখুক সে,
আর শিখুক নিশ্চুপ নিশ্চল থাকতে।

বালুর প্রবচন

এখন যে গল্প বলছি এটা বেশ আগের ঘটনা। মৌগলিকে তখনো সিওনির নেকড়ে দল থেকে বহিষ্কৃত করা হয় নি, ব্যাঘ্রপ্রবর শের খানের উপর তার প্রতিশোধও সে তখন পর্যন্ত চরিতার্থ করে নি। এ সময় বালু তাকে অরণ্যের আইনসমূহ শেখাচ্ছিল। বিশালাকার, গম্ভীর স্বভাবের, প্রবীণ ধূসর ভালুকটি মৌগলির মতো এত চটপটে ও বুদ্ধিমান একজন ছাত্র পেয়ে খুবই আনন্দ বোধ

করছিল। বাচ্চা নেকড়েগুলি তাদের গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত অরণ্যের আইনগুলির বাইরে আর কিছুই শিখতে চাইত না। শিকারের কবিতাটি পুনরাবৃত্তি করতে পারলেই তারা তাদের শিক্ষাজীবনের ইতি টানত। ওই কবিতাটি ছিল এই রকম সেই পা যা কোনো শব্দ করে না। সেই চোখ যা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়। সেই কান যা তাদের গুহার মধ্যেও হাওয়ার শব্দ শোনে, আর তীক্ষ্ণ সাদা দন্তপাঁতি। এই সবই হলো আমাদের ভাইদের চিহ্ন। ব্যতিক্রম হলো শুধু শেয়াল তাবাকি আর হায়েনা, যাদের আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু মৌগলি ছিল মানব শিশু। এর বাইরেও অনেক কিছু শেখা ছিল তার জন্য অত্যাবশ্যক। মাঝে মাঝে কালো চিতা বাঘিরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটে তার কাছে চলে আসত। তার প্রিয় পোষ্যের শিক্ষাদীক্ষা কেমন চলছে সেটা দেখতে উৎসুক ছিল বাঘিরা। মৌগলি তার দিনের পড়া শেষ করে তার পুনরাবৃত্তি করতে আর বাঘিরা একটা গাছের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে সন্তোষের সঙ্গে গরগর করতে করতে তার কথা শুনত। ওই বালক এখন যেমন তরতর করে গাছে উঠতে পারে তেমনি স্বচ্ছন্দে জলে সাঁতার কাটতে পারে, যেমন সাঁতার কাটতে পারে তেমনি সজোরে ডাঙায় ছুটতে পারে। অরণ্যের আইনজ্ঞ শিক্ষক বালু তাকে জঙ্গলের আইনকানুন যেমন শেখাল তেমনি শেখাল জলের বিধিবিধান। কোন শাখাটা পচা ও জীর্ণ, কোন শাখাটা শক্ত ও মজবুত; মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে গুঞ্জনরত বুনো মৌমাছির চাক দেখলে তাদের সঙ্গে কেমন করে সৌজন্যভরে কথা বলতে হবে; মধ্যদিনে বিশ্রাম নেবার সময় মাঙ্গ বাদুড়কে হঠাৎ বিরক্ত করে ফেললে কী বলতে হবে; সাঁতার কাটার জন্য পানিতে ঝাঁপ দেবার আগে পানির সাপদের কীভাবে সাবধান করে দিতে হবে— এই সবই মৌগলিকে শিখতে হবে ভালোভাবে। অরণ্যের কোনো প্রাণীই চায় না যে কেউ তাদের বিরক্ত করুক। বাইরের কোনো অনুপ্রবেশকারীকে তারা সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া মৌগলিকে অপরিচিতের শিকারের ডাকও শিখতে হয়েছে। নিজেদের এলাকার বাইরে শিকার করতে হলে তাদেরকে এই ডাক বারবার উচ্চারণ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা এর প্রত্যুত্তর পায়। অনুবাদ করতে হলে এই ডাক-এর অর্থ দাঁড়ায় এই রকম আমাকে অনুমতি দাও এখানে শিকার করার, কারণ আমি ক্ষুধার্ত। তারপর উত্তর ভেসে আসে তাহলে শিকার করো খাদ্যের জন্য কিন্তু কদাচ আনন্দের জন্য নয়।

এসব থেকেই বুঝতে পারছ মৌগলিকে কত কিছু শিখতে হচ্ছিল, মনের একেবারে ভেতরে তাকে কত বিষয় একেবারে গেঁথে নিতে হচ্ছিল। একই

জিনিস একশোবার বলতে বলতে সে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বালু এজন্য মৌগলিকে একদিন বেশ চড়চাপড়ও মেরেছিল। মৌগলি তখন চটেমটে বালুর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। বাঘিরাকে সে কথা বলতে গিয়ে বালু বলেছিল, বুঝলে, মানব শিশু মানব শিশুই। অরণ্যের আইন, সব আইন, ওকে শিখতেই হবে।

কালো চিতা বলল, কিন্তু ওযে কত ছোট সেটা তো খেয়াল রাখবে। পারলে বাঘিরা আদর দিয়ে ওর মাথা খেত। ওর ওই অতটুকু ছোট্ট মাথায় ও এত জিনিস কেমন করে ধরে রাখবে ?

জঙ্গলে কি এমন কোনো জিনিস আছে যাকে অতি ক্ষুদ্র বলে কেউ তাকে হত্যা করবে না ? নেই। তাই আমাকে ওকে এই সব অবশ্যই শেখাতে হবে এবং সেজন্যই ও যখন ভুল করে তখন ওকে আমি দু'চারটা চড়চাপড় মারি, অবশ্য খুবই কোমলভাবে।

কোমলভাবে ? তোমার হাত-পা তো লোহার মতো শক্ত, কোমলতার তুমি কী জানো ? বাঘিরা ঘোঁ ঘোঁ করে বলল, তোমার এই কোমলতায় আজ ওর সারা মুখে কালসিটা পড়ে গেছে!

বালু গম্ভীর গলায় বলল, না-জানার জন্য কঠিন কোনো বিপদে পড়ার চাইতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালসিটা পড়াও অনেক ভালো। আমি ওকে এখন অরণ্যের প্রধান কথাগুলি শেখাচ্ছি। বিহঙ্গকুল, সাপ আর চতুষ্পদী যেসব প্রাণী আছে, তার নিজের গোষ্ঠীর বাইরে, ওই কথাগুলি তাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবে। ওই কথাগুলি যদি ও শুধু মনে রাখে তাহলে অরণ্যের কোনো কিছু থেকেই তার কোনো বিপদ ঘটবে না। এজন্য একটু চড়চাপড় খাওয়া কি খুব বেশি হলো ?

যাই হোক, চড়চাপড় দিতে গিয়ে মানুষের বাচ্চাটাকে তুমি যেন মেরে ফেলো না সেদিকে খেয়াল রেখো। গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে তুমি যেভাবে তোমার নখ শানাও ও কিন্তু সে রকম কোনো গাছের গুঁড়ি নয়। তো, তোমার ওই প্রধান কথাগুলি কী ? বাঘিরা তার একটা পা সামনে প্রসারিত করে নীল ইস্পাতের মতো তার তীক্ষ্ণ নখগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে বলল, আমি হয়তো সাহায্য চাইবার পরিবর্তে সাহায্য করতেই বেশি সক্ষম, তবু তোমার ওই প্রধান কথাগুলি কী তা আমিও একটু জেনে নিতে চাই।

দাঁড়াও, আমি মৌগলিকে ডাকছি, ও রাজি হলে ওর কাছ থেকেই শুনে নাও। এই যে ছোট ভাইটি, আসো এখানে।

তাদের মাথার উপরের দিক থেকে একটা অসন্তোষভরা গলা শোনা গেল। আমার মাথা এখন একটা মৌ-গাছের মতো গুনগুন করে ঘুরছে। একটা গাছের গুঁড়ি বেয়ে মৌগলি সরসর করে নিচে নেমে এলো। তাকে বেশ ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত দেখাচ্ছিল। গজগজ করতে করতে মৌগলি বলল, আমি এলাম বাঘিরার জন্য, ওই মোট্টু বুড্ডা বালুর জন্য নয়।

বালু মনে কষ্ট পেলেও প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। এখন আমি আজ তোমাকে অরণ্যের যে প্রধান বাণীগুলি শিখিয়েছি তা বাঘিরাকে শুনিয়ে দাও।

পাণ্ডিত্য জাহির করবার একটু সুযোগ পেয়ে মৌগলি জানতে চাইল, কোন প্রাণীদের প্রধান কথা বলব ? অরণ্যের তো নানা ভাষা আছে, সবই আমি জানি।

না, তুমি কিছু জানো, কিন্তু খুব বেশি না। দেখলে বাঘিরা, ওরা কেউ তাদের শিক্ষককে ধন্যবাদ দেয় না। আমি যে এতজনকে শিখিয়েছি তার মধ্য থেকে একটা ক্ষুদে নেকড়েও আমার কাছে এসে আমাকে কোনো ধন্যবাদ জানায় নি। ঠিক আছে, এবার মহাপণ্ডিত, তুমি শিকারি-মানুষদের বাণীটা শোনাও।

মৌগলি তখন ভালুকের গলার ঢং অনুকরণ করে বলল, তোমাদের ও আমার— আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

গুড। এবার পাখিদের কথা বলো।

মৌগলি যথাযথভাবে তা উচ্চারণ করল এবং প্রতিটি বাক্যের শেষে চিলের তীক্ষ্ণ শিস দেবার ধ্বনি তুলল।

বাঘিরা বলল, এবার সর্পকুলের বাণী।

উত্তরে শোনা গেল অবর্ণনীয় নিখুঁত একটা হিস হিস শব্দ। মৌগলি তার দু'পা উঁচু করে পেছন দিকে একটা লাফ দিয়ে বাঘিরার পিঠে চড়ে হাততালি দিল। বাঘিরার পিঠে বসে তার মসৃণ চকচকে চামড়ায় নিজের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করতে করতে সে বালুর দিকে তাকিয়ে নানা রকম বিচিত্র মুখভঙ্গি করতে থাকল।

বালু সস্নেহে বলল, চমৎকার। এর জন্য শরীরে একটু আধটু মারের দাগ পড়া কিছুই নয়। একদিন তুমি আমাকে এর জন্য স্মরণ করবে। তারপর বালু

বাঘিরার দিকে তাকিয়ে তাকে জানাল যে ওই প্রধান শব্দগুলি সে শিখে নিয়েছে হাতির কাছ থেকে, অনেক অনুনয় বিনয় করে, কারণ প্রাজ্ঞ প্রবীণ একমাত্র হাতিই সে সব জানে, অরণ্যের আর কোনো প্রাণী নয়। হাতিই মৌগলিকে নদীর কাছে নিয়ে গিয়ে জলের সাপের শব্দ তাকে চিনিয়েছে, কারণ নিজের মুখ দিয়ে ওই রকম শব্দ বার করা বালুর পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত। অরণ্যের যাবতীয় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কী করে সাবধান থাকতে হবে মৌগলি এখন তা মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেছে। এখন সাপ কিংবা পাখি কিংবা অন্য কোনো প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবে না। বালু সগর্বে নিজের মোটামোটা রোমশ পেটে চাপড় মারতে মারতে বলল, এখন মৌগলির আর কাউকে ভয় করবার কোনো দরকার নেই।

বাঘিরা চাপা গলায় বলল, শুধু তার নিজের দলের লোকদের ছাড়া। তারপর মৌগলিকে উদ্দেশ করে বাঘিরা বলল, ছোট ভাইটি আমার, আমার পাঁজরের কথাটা একটু মনে রাখো! এই রকম নাচানাচি করছ কেন তুমি ?

বাঘিরার ঘাড়ের চামড়া টেনে ধরে আর তার পাঁজরে লাথির পর লাথি মেরে মৌগলি এতক্ষণ তার নিজের প্রতি ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। এবার তাতে সমর্থ হবার পর সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, তা হলে আমারও একটা গোষ্ঠী হলো এতদিনে। এবার আমি দিনভর তাদের নেতৃত্ব দেব, তাদের চালিয়ে নেব এক গাছের শাখা থেকে অন্য এক গাছের মাথায়।

বাঘিরা বলল, এ কী বাজে স্বপ্ন দেখা শুরু করলে তুমি ? ওসব বোকামি ছাড়ো!

কিন্তু মৌগলি বলে চলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করব আমি। বুড্ডা বালুর গায়ে লতাপাতা আর ময়লা ছুঁড়ে মারব আমরা।

ফুহ্! বালু তার প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে মৌগলিকে বাঘিরার পিঠ থেকে এক টানে নামিয়ে নিজের সামনের দু'পায়ের মধ্যে চেপে ধরল। মৌগলি দেখল যে বালু সত্যিই খুব রেগে গেছে।

মৌগলি আড়চোখে বাঘিরার দিকে তাকাল। সে-ও কি বালুর মতো চটে গেছে ? মৌগলি দেখল যে চিতার চোখ দুটি কঠিন হলুদ পাথরের মতো জ্বলজ্বল করছে।

তুমি বানরকুলের সঙ্গে মিশেছ! ওদের কোনো আইনকানুন নেই। ওরা খায় না এমন কোনো জিনিস নেই। ছি, ছি, ছি!

মৌগলি তখনো বালুর পায়ের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, বালু যখন আমার মাথায় জোরে চাপড় মারে তখন আমার খুব ব্যথা লাগে। আমি ভীষণ রেগেও যাই। তখন ওই বানররা গাছ থেকে নিচে নেমে এসে আমার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখায়। ওরা ছাড়া আর কেউ আমার দিকে কোনো মনোযোগই দেয় নি। তার গলায় কান্নার রেশ ধরা পড়ল।

বালু নাক সিঁটকে বলল, বানরকুলের সহানুভূতি! পাহাড়ি ঝরনার নিস্তব্ধতা! গ্রীষ্মের সূর্যের স্নিগ্ধ শীতলতা। ফুহ্! তারপর, মানবশিশু ?

তারপর ওরা আমাকে বাদাম আর আরো মজার মজার জিনিস খেতে দিল। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওরা এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে গেল, বলল যে আমি ওদের ভাই, রক্তের সূত্রে বাঁধা, শুধু আমার লেজ নেই, আর একদিন আমিই হবো ওদের দলপতি।

বাঘিরা বলল, শোনো, ওদের কোনো দলপতি নেই। ওরা সব মিথ্যুক। চিরকাল ওরা মিথ্যা কথা বলে এসেছে।

আমার সঙ্গে ওরা খুব সদয় ব্যবহার করেছে। আমাকে ওরা আবার ওদের কাছে যেতে বলেছে। আমাকে কেন কখনো বান্দরলোকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় নি ? আমার মতো ওরাও তো তাদের দুপায়ের উপর দাঁড়ায়। লোহার মতো থাবা দিয়ে ওরা আমাকে পিটায় না। সারা দিন ওরা শুধু খেলে আর খেলে। বালু, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আবার ওদের সঙ্গে খেলতে যাব।

তখন বালু বলল, আর ওর গলা শোনাল গ্রীষ্মের রাতে বজ্রগর্জনের মতো, শোনো, মানবশিশু। আমি বানরকুল ছাড়া অরণ্যের সব আইনকানুন তোমাকে শিখিয়েছি, অরণ্যের সব প্রাণীর প্রধান শব্দগুলি তোমাকে চিনিয়ে দিয়েছি, কিন্তু ওই বান্দরলোক, যারা গাছে গাছে থাকে, তাদের সম্পর্কে কিছু বলি নি। কারণ তাদের কোনো আইনকানুনই নেই। তারা সমাজপতিত। ওদের নিজেদের কোনো ভাষা নেই। গাছের শাখা প্রশাখায় লুকিয়ে থেকে ওরা যখন অন্যদের চুপিচুপি দেখে, তাদের কথা শোনে, তখন তারা সেই কথাগুলি চুরি করে শিখে নেয়। ওদের পথ আমাদের পথের থেকে ভিন্ন। তাদের কোনো নেতা নেই। তাদের স্মৃতি বলে কিছু নেই। তারা সব সময় অহঙ্কার করে, নিজেদের মধ্যে অনবরত কিচিরমিচির করে, বলে যে জঙ্গলের মধ্যে তারা একদিন বিরাট এক কীর্তি সম্পন্ন করবে, তারা যথার্থই মহান একটা জাতি, কিন্তু কোনো গাছ থেকে টুপ করে একটা বাদাম খসে পড়লেই তারা হেসে লুটোপুটি খায়, মুহূর্তের মধ্যে

তারা আর সব কিছু ভুলে যায়। আমরা অরণ্যের প্রাণীরা ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখি না। বানরকুল যেখানে জল পান করে আমরা সেখানে জল পান করি না; বানরকুল যেসব স্থানে যায় আমরা সেখানে যাই না; ওরা যেখানে শিকার করে আমরা সেখানে শিকার করি না; ওরা যেখানে মৃত্যুবরণ করে আমরা সেখানে মৃত্যুবরণ করি না। আজ পর্যন্ত তুমি কি কখনো আমাকে বান্দরলোকদের কথা বলতে শুনেছ ?

ফিসফিস করে মৌগলি বলল, না। বালু তার কথা শেষ করেছে আর অরণ্য এখন নিশ্চুপ নিস্তব্ধ।

জঙ্গলের প্রাণীরা বানরকুলের কথা আর বলে না। বানরকুলকে তারা তাদের মন থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। বানরকুল সংখ্যায় অনেক, তারা নোংরা ও লজ্জাহীন, তাদের একমাত্র ইচ্ছা জঙ্গলের প্রাণীরা যেন তাদের লক্ষ করে, তাদের প্রতি নজর দেয়। যদি তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা বলে কিছু থাকে তবে সেটা তাই। কিন্তু আমরা তাদের প্রতি কোনো নজর দিই না, ওরা যখন আমাদের মাথার উপর বাদাম আর নোংরা জিনিসপত্র ছুঁড়ে মারে তখনো না।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ওপরের গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে লতাপাতা আর এক গাদা বাদাম তাদের মাথার উপর ঝরে পড়ল। বানরকুলের ক্রুদ্ধ লম্ফঝম্ফ আর চেঁচামেচিও শোনা গেল।

বালু বলল, শুনে রেখো, বানরকুল হলো নিষিদ্ধ প্রাণী। আমাদের জন্য, অরণ্যের প্রাণীদের জন্য, ওরা হলো নিষিদ্ধ।

বাঘিরা বলল, হ্যাঁ, নিষিদ্ধ। তবু আমার মনে হয় ওদের সম্পর্কে মৌগলিকে বালুর সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল।

আমার সেটা করা উচিত ছিল ? আমার ? ও যে ওই নোংরা প্রাণীদের সঙ্গে খেলতে যাবে আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি। বান্দরলোক ? ছি!

ওদের মাথার উপর আরেক ঝাঁক বাদাম আর ডালপালা ঝরে পড়ল। ওরা মৌগলিকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেল। বানরকুল সম্পর্কে বালু যা বলেছিল তা ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ওরা বাস করত গাছের মাথায় আর যেহেতু অরণ্যের প্রাণীরা খুব সময়ই ওপরের দিকে তাকাত তাই ওরা প্রায় কখনোই পরস্পরের মুখোমুখি হতো না। কিন্তু বানররা যখনই কোনো রোগাক্রান্ত নেকড়ে বা আহত বাঘ কিংবা ভালুককে দেখত তখনই তারা ওদের নানাভাবে কষ্ট দিত। মজা করার জন্য কিংবা ওরা তাদের দিকে একটু নজর

দেবে, তাদের লক্ষ করবে, ওই আশায় ওরা তাদের উপর গাছের ডালপালা আর বিভিন্ন আবর্জনা ছুঁড়ে মারত। তারপর তারা অদ্ভুত চিৎকার ও হৈচৈ-এ মেতে উঠত, অর্থহীন নানা গান গাইত তীক্ষ্ণ বেসুরো গলায়, ওদের আমন্ত্রণ জানাত গাছের উপর উঠে এসে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। নয়তো তারা নিজেদের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝগড়া আর মারামারি বাঁধিয়ে দিত, তারপর নিহত বানরগুলিকে জঙ্গলের প্রাণীর মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেত। তারা সব সময়ই বলত, এই শিগগিরই তারা একজন নিজেদের নেতা নির্বাচিত করবে, শিগগিরই তারা নিজেদের জন্য আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করবে, কিন্তু বাস্তবে তারা কিছুই করতো না, কিছু করে নি, কারণ তাদের স্মৃতি ছিল অতি ক্ষণস্থায়ী, এক মুহূর্ত আগের কথা পরের মুহূর্তেই তারা ভুলে যেত। তাই তারা নিজেরাই একটা প্রবচন বানিয়ে নিয়েছিল বান্দরলোক এখন যা ভাবছে অরণ্যের প্রাণী সেটা ভাববে পরবর্তী সময়ে। এই প্রবচন তাদের প্রচুর স্বস্তি ও সান্ত্বনা দিত। অরণ্যের কোনো প্রাণী তাদের নাগাল পেত না, অন্যদিকে অরণ্যের প্রাণী তাদের দিকে কখনো ফিরেও তাকাত না। এই কারণেই মৌগলি যখন তাদের সঙ্গে খেলতে আসে আর এজন্য বালু যখন ভীষণ রেগে যায় তখন তাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না।

বানরকুল খুব বেশি কিছু করতে চায় নি। তারা কখনোই কোনো কিছুই করতে চাইত না। কিন্তু ওদের একজনের মাথায় একটা চমৎকার পরিকল্পনা জেগে উঠেছিল। সে অন্য সবাইকে বলল যে মৌগলিকে যদি তাদের দলে রাখা যায় তাহলে খুব প্রয়োজনীয় একটা কাজ হবে। বাতাসের ঝাপটা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ও লাঠি-বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে একটা আড়ালের মতো কিছু তৈরি করতে পারবে। ওরা যদি মৌগলিকে ধরতে পারে তাহলে ওর কাছ থেকে তারা ওই কৌশলটা শিখে নিতে পারবে। মৌগলি তো আদিতে ছিল কাঠুরের সন্তান, স্বাভাবিকভাবে তার সহজাত প্রবণতায় সে মাটিতে পড়ে থাকা গাছের শাখা ও লতাপাতা দিয়ে ছোট ছোট কুটির বানাত। কেমন করে বানাত তা সে নিজেও বলতে পারবে না। বানরকুল গাছের উপর থেকে তার এই মজার খেলা দেখে খুবই বিস্মিত হতো। এবার তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে এতদিনে তারা একজন সত্যিকার নেতা পাবে এবং জঙ্গলের সব প্রাণীদের মধ্যে এখন তারাই হবে সব চাইতে প্রাজ্ঞ। এখন থেকে সবাই তাদের ঈর্ষান্বিত চোখে লক্ষ করতে বাধ্য হবে। তাই তারা বালু, বাঘিরা আর মৌগলিকে

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করে চলল। অবশেষে মধ্যদুপুরের ঘুমের সময় হয়ে এল। মৌগলি ইতোমধ্যে তার আচরণের জন্য ভীষণ লজ্জিত হয়েছিল। সে স্থির করল যে বানরকুলের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। চিতা আর ভালুকের মাঝখানে গুটিশুটি হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এরপর মৌগলির যে কথা মনে পড়ল তা এই রকম। কঠিন, শক্তিশালী, ছোট ছোট বাহু, আর পা তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, তার মুখের উপর গাছের লতাপাতার ঝাপটা লাগছে, তারপর সে দুলতে থাকা শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে দেখল যে বালু তার গর্জন দিয়ে সমগ্র অরণ্যকে কাঁপিয়ে তুলছে আর বাঘিরা তার তীক্ষ্ণ দন্তরাজি বার করে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বানরকুল আনন্দে উল্লসিত হয়ে ক্রমান্বয়ে গাছের উপরের দিকে উঠতে লাগল। বাঘিরার পক্ষে অত উঁচুতে ওঠা সম্ভব ছিল না। বান্দরলোক খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, বাঘিরা আমাদের দিকে নজর দিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি আর চালাকি দেখে জঙ্গলের প্রাণীরা মুগ্ধ হয়ে গেছে। হা হা। তারপর তারা গাছের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাতে শুরু করল আর তাদের এই পালানো এমন একটা জিনিস যা বর্ণনাতীত। জমির উপর থেকে পঞ্চাশ, ষাট, এমনকি একশো ফুট উঁচুতে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, মাঠঘাটের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য তাদের এমন সব পথ আছে যার কথা বলে শেষ করা যাবে না। আর প্রয়োজনবোধে রাতের আঁধারেও তারা সহজেই ওই পথ ধরে চলতে পারে। দুটি বিশেষ বলবান বানর মৌগলিকে বগলদাবা করে এক এক বার বিশ ফুট লম্বা লাফ দিয়ে গাছের মাথার উপর দিয়ে ছুটে চলল। একা থাকলে ওরা এর চাইতে দ্বিগুণ দ্রুত বেগে ছুটতে পারত কিন্তু বালকটির ওজনের জন্য তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব হচ্ছিল না। মৌগলির মাথা ঘুরছিল, বমি বমিও লাগছিল, শূন্যের মধ্য দিয়ে এইভাবে ছুটে চলতে তার কিছুটা ভয়ও লাগছিল, তবু এই পাগলের মতো ছুটে চলা, নিচে দ্রুত অপসৃয়মান নানা দৃশ্য দেখতে পাওয়া, এসব কিছু থেকে সে একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনাও উপভোগ করছিল। তবে বহু নিচে জমি দেখে, শূন্য হাওয়ার মধ্য দিয়ে এক গাছ থেকে অন্য এক গাছে নিয়ে যাওয়ার সময় হ্যাঁচকা টান সহ্য করার সময় তার প্রাণ ভয়ে প্রায় খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। তারপর তার বাহক দুজন যখন গাছের সর্বোচ্চ ক্ষীণ দুর্বল শাখার উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আর শাখাগুলি মড়মড় করে ভেঙে পড়বার উপক্রম করছিল তখন ভয়ে তার প্রাণ

পালাও, পালাও! কা! কা এসেছে! চেঁচাতে চেঁচাতে বানরগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাল

উড়ে যাচ্ছিল। সমুদ্রের বুকে একজন নাবিক যেমন মাস্তুলের মাথায় বসে মাইলের পর মাইল জলরাশির বিশাল বিস্তার দেখতে পায় মৌগলিও তেমনি মাঝে মাঝে বনের সর্বোচ্চ গাছের মাথার উপর থেকে মাইলের পর মাইল সবুজ বনানীর বিস্তার দেখতে পাচ্ছিল, এরপরই হঠাৎ কোনো গাছের ডাল আচমকা তার মুখের উপর আঘাত করতো, আর তার দুই বাহক এবং তার তখন ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় মাটিতে পড়ে যাবার অবস্থা হতো। তবে ওরা ঠিক সময়ে সব সামলে নিত এবং এইভাবে লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে গাছের শাখা-প্রশাখা ভাঙতে ভাঙতে মৌগলিকে বন্দি করে বানরকুল বৃক্ষ-পথ দিয়ে চলতে লাগল।

মৌগলির প্রথমে বেশ ভয় হচ্ছিল, ওরা কি তাকে ফেলে দেবে ? তারপর তার প্রচণ্ড রাগ হলো। কিন্তু এখন ওদের সঙ্গে লড়াই করে যে কোনো লাভ হবে না সেটা সে বুঝল। এবার সে ভাবতে বসল। প্রথম কথা হচ্ছে, যে কোনো উপায়ে হোক বালু ও বাঘিরাকে খবর দিতে হবে। বানররা যে গতিতে যাচ্ছে

তাতে তার পক্ষে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেয়া সম্ভব হবে না। নিচের দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না, কারণ গাছের ঘন শাখা-প্রশাখার জন্য শুধু পত্রপল্লবের উপরের দিকই চোখে পড়ছে, আর কিছু নয়। কাজেই মৌগলি এবার উপরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। বহু উঁচুতে সুদূর নীল আকাশে চিল তার দুপাখা ছড়িয়ে দিয়ে উড়ছে, নিচে জঙ্গলে খাবার যোগ্য কোনো প্রাণী মরতে বসেছে কিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা লক্ষ করছে। হঠাৎ চিল দেখল যে বানরকুল যেন কিছুটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে ধাঁই করে কয়েকশ' গজ নেমে এলো, জিনিসটা খাবার যোগ্য কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে তো। সে যখন দেখল যে বানরগুলি মৌগলিকে এক গাছের মাথা থেকে আরেক গাছের মাথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে অবাক হয়ে শিস দিয়ে উঠল, আর সে তখুনি মৌগলিকে চিলের ডাকটা উচ্চারণ করতে শুনল— আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে একই রক্ত, তোমার আর আমার ধমনীতে। এর পরই গাছের শাখা-প্রশাখা আবার বালকটির মুখ ঢেকে দিল কিন্তু চিল যথাসময়ে পরের গাছের মাথার উপরে উড়ে গেল; আর আবার সে দেখতে পেল ওই বাদামি ছোট্ট মুখটা। মৌগলি এবার চিৎকার করে বলল, আমাকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে সেটা খেয়াল করো। সিওনি গোষ্ঠীর বালু আর পাহাড়ি দলের বাঘিরাকে আমার কথা জানিয়ে দিও। ভুলো না যেন।

কী নাম বলব, ভাইটি ? চিল মৌগলির কথা শুনেছিল কিন্তু এর আগে তাকে কখনো দেখে নি।

আমি মানবশিশু, ওরা আমাকে ব্যাঙ মৌগলি নামে ডাকে। কোন পথে ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা ভালো করে লক্ষ করো !

মৌগলিকে তখন ওরা হাওয়ার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তবু সে চিৎকার করে কথাগুলি বলল, আর চিল তখুনি তার দু ডানা প্রসারিত করে মুহূর্তের মধ্যে আকাশে অনেক উপরে উঠে গেল। তাকে তখন মনে হচ্ছিল আকাশের বুকে যেন একটা ছোট্ট ফুটকি। সে তার দূরবীক্ষণের মতো চোখ দিয়ে বানরগুলি মৌগলিকে গাছের মাথার উপর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা দেখতে থাকল।

চাপা হাসি হাসতে হাসতে চিল বলল, ওরা কখনোই খুব বেশি দূর যায় না। যা বলে তার প্রায় কিছুই ওরা কখনোই করে না। ওই বান্দরলোকদের বড় বড় কথাই শুধু সার। এবার মজা বুঝবে বাছাধনরা। বালু কোনো বাচ্চাশিশু নয়, আর বাঘিরা শুধু মেষ-ছাগলই মারে না!

চিল উড়তে থাকল আর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার পায়ের নিচে নিজের নখ শানাতে শানাতে সে শুধু অপেক্ষা করে থাকল।

ইতোমধ্যে বালু আর বাঘিরা রাগে দুঃখে ক্ষেপে দিশাহারা হয়ে যায়। বাঘিরা তরতর করে গাছের বহু উঁচুতে উঠে যায়। অত উঁচুতে সে কখনো ওঠে নি। কিন্তু তার দেহের ওজনের ভারে গাছের সরু শাখাগুলি ভেঙে গেলে সে নিচে পড়ে যায় আর তার নখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে গাছের বাকল।

বানরগুলিকে ধরবার জন্য বেচারা বালু তার হোঁৎকা শরীর নিয়ে থপথপ করে ছুটছিল। বালুর দিকে তাকিয়ে বাঘিরা গর্জে উঠল, কেন তুমি মানবশিশুটিকে ওদের সম্পর্কে সাবধান করে দাও নি, বালু ? ওদের সম্পর্কে ঠিকমতো সাবধান না করে দিয়ে বেচারাকে চড়চাপড় মেরে আধমরা করে কী লাভটা হলো বলো ?

বালু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি করো! আমরা এখনো ওদের ধরে ফেলতে পারব।

এই গতিতে! একটা আহত গরুও এতে ক্লান্ত হবে না। ওহে আইনবিদ শিক্ষকমশাই, এরকম আর এক মাইল গড়াতে গড়াতে চললে তোমার নিজের প্রাণবায়ুই বেরিয়ে যাবে। এখন একটু স্থির হয়ে বসে কী করা যায় ভালো করে ভেবে দেখো। একটা প্ল্যান ঠিক কর। এভাবে ওদের পেছনে ছোটার কোনো মানে হয় না। খুব বেশি কাছে গেলে ওরা হয়তো ওকে মাটিতে ফেলে দিতে পারে।

আরে! হো হো! ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে হয়তো ওরা ওকে ইতোমধ্যে ফেলেই দিয়েছে। বান্দরলোকদের কোনো বিশ্বাস নেই। ও হো হো, আমার মাথায় মরা বাদুড় চাপিয়ে দাও! বাসি পচা কালো হাড় খেতে দাও আমাকে। বন্য মৌমাছির ঝাঁকের মধ্যে ফেলে দাও আমাকে, ওদের বিষাক্ত হুলের কামড়ে যেন আমার মৃত্যু ঘটে। হায়েনাদের সঙ্গে আমার কবর দিও। আমার চাইতে হতভাগ্য কোনো ভালুক আর এ জগতে নেই। আরে! ও হো হো। মৌগলি, মৌগলি, তোমার মাথায় চাঁটি না মেরে কেন আমি তোমাকে বানরকুল সম্পর্কে সাবধান করে দিই নি ?

বালু তার থাবা দিয়ে নিজের দুকান ঢেকে শোকে দুঃখে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বাঘিরা অসহিষ্ণু গলায় বলল, তুমি অন্তত অরণ্যের প্রধান বাণীগুলি তাকে সঠিকভাবে শিখিয়েছ। শোনো বালু, তোমার কোনো স্মৃতিও নেই, সম্ভ্রমবোধও নেই। আমি, কালো চিতা, আমি যদি ইক্কি সজারুর মতো এই রকম গুটিশুটি মেরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতাম তাহলে জঙ্গল আমার সম্পর্কে কী ভাবত বলো তো?

জঙ্গল কী ভাবত কিংবা না ভাবত তা নিয়ে আমি কী করব? কে জানে, মৌগলি হয়তো ইতোমধ্যে মরেই গেছে।

শোনো, ওরা যদি মজা করতে গিয়ে ওকে গাছের উপর থেকে না ফেলে দিয়ে থাকে কিংবা নিছক আলস্যবশত ওকে না ফেলে দেয় তা হলে মানবশিশুটির জন্য আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই। ওর বুদ্ধি আছে, ও ভালো প্রশিক্ষণ পেয়েছে, সর্বোপরি ওর এমন এক জোড়া চোখ আছে অরণ্যের প্রাণীকুল যাকে ভয় পায়। কিন্তু ও এখন বান্দরলোকের পাল্লায় পড়েছে, এটা একটা খুবই অশুভ ব্যাপার। ওরা বাস করে গাছে-গাছে আর তাই আমাদের কাউকে ওরা ভয় করে না। বাঘিরা চিন্তিত মুখে তার সামনের পাটা মুখে পুরে চুষতে লাগল।

বালু এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সত্যি আমি একটা বোকার হদ্দ। হাতি কী বলে সেটা মনে করা উচিত আমার। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের আতঙ্কের জিনিস আছে। আর বান্দরলোক ভয় করে পাহাড়ি সাপ কা'-কে। বানরকুলের মতোই কা সরসর করে গাছে উঠতে পারে। রাতের আঁধারে ও বাচ্চা বানরদের চুরি করে নিয়ে আসে। ওর ফিসফিস শব্দে ওদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। চল, কা-র কাছে যাওয়া যাক।

বাঘিরা বলল, ও আমাদের জন্য কী করবে? ওতো আমাদের গোষ্ঠীর কেউ নেই। ওর পা নেই, ওর চোখ তো সাংঘাতিক!

বালু আশান্বিত গলায় বলল, ও খুব প্রবীণ আর অসম্ভব ধূর্ত। সর্বোপরি, সব সময়ই ওর পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলতে থাকে। আমরা ওকে একাধিক ছাগল দেবার প্রতিশ্রুতি দেব।

একটা ছাগল পেট পুরে খাবার পর ও তো প্রায় পুরো এক মাস ঘুমিয়ে কাটায়। এখন হয়তো ঘুমিয়েই আছে। আর জেগে থাকলেও ও যদি নিজেই তার ছাগল শিকার করার কথা বলে? বাঘিরা কা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না, তাই স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে সন্দেহের ভাবটা ছিল বেশ প্রবল।

সেক্ষেত্রে, ওহে অভিজ্ঞ শিকারি, তুমি আর আমি দুজনে মিলে ওকে বোঝাব। বালু তার বাদামি কাঁধ চিতার গায়ে সাদরে ঘষল, তারপর তারা দুজনে মিলে পাহাড়ি অজগর কা'র খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকাল পড়ে এসেছে। একটা কোমল উষ্ণ শিলাখণ্ডের ওপর কা লম্বা হয়ে শুয়ে খোশমেজাজে তার গায়ের নতুন মসৃণ ত্বক লক্ষ করছে। গত দশ দিন ধরে সে বিশ্রাম নিয়েছে, পুরনো চামড়া বদলে নতুন চামড়া গায়ে দিয়েছে, আর কী সুন্দর যে তাকে এখন দেখাচ্ছে! সে তার ভোঁতা নাকওয়ালা মাথা মাটিতে এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাচ্ছে, তার ত্রিশ ফুট লম্বা শরীরটাকে নানাভাবে পেঁচাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, নাচাচ্ছে, একটু পরে কী খাবে সেই চিন্তায় মহানন্দে ঠোঁট চাটছে।

বালু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ও এখনো কিছু খায় নি। কা'র সুন্দর ছোপ ছোপ রং-এর বাদামি-হলুদ গাত্রাবরণ দেখে বালু খুশি হলো। তারপর বাঘিরাকে লক্ষ করে বলল, বাঘিরা, সতর্ক থেকো কিন্তু। চামড়া ফেলবার পর সব সময়ই কিছু সময়ের জন্য ও চোখে কম দেখতে পায় আর তখন ও ছোবলও মারে বিদ্যুৎগতিতে।

কা কিন্তু কোনো বিষাক্ত সাপ ছিল না। বস্তুতপক্ষে বিষাক্ত সাপদের সে মনে করতো কাপুরুষ এবং ওদের সে ঘৃণা করতো। কা'র শক্তি ছিল তার আলিঙ্গনে। তার দীর্ঘ প্রচণ্ড শক্তিশালী শরীর যদি সে কারো দেহের চারপাশে একবার পেঁচিয়ে ধরতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই। বালু উবু হয়ে বসে সম্ভাষণ জানাল, গুড হান্টিং! স্বজাতির অন্য সাপদের মতো কা-ও কানে কিছু কম শুনত, তাই প্রথমে সে বালুর কথা ভালো করে শুনতে পায় নি। তাই সে মাথা নিচু করে শরীর পেঁচিয়ে যে কোনো দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিল।

তারপর সব বুঝতে পেরে সে বলল, ওহো বালু! হ্যাঁ, আমাদের সবার জন্য শুভ শিকার হোক। তা এখানে কী উদ্দেশ্যে? কী খবর তোমাদের? গুড হান্টিং, বাঘিরা। আমাদের অন্তত একজনের খুব খাদ্য দরকার। কাছেধারে কোনো শিকার আছে নাকি? কোনো বাচ্চা হরিণ বা ওই জাতীয় কিছু? আমার পেট একটা শুকনো কুয়ার মতো খটখট করছে।

বালু নিরাসক্তভাবে জানাল, আমরা এখন শিকারে বেরিয়েছি। বালু জানত যে কা'-কে কখনো তাড়া দিতে নেই। বিশাল তার দেহ।

কা বলল, আমাকে তোমাদের সঙ্গে আসার অনুমতি দাও। বাঘিরা বা তোমার পক্ষে একটা চাঁটি মেরে কোনো একটা শিকার ধরা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু আমাকে বন-পথে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়, একটা ছোট্ট বানর ধরার জন্য অনেক সময় মাঝ-রাত পর্যন্ত গাছের উপরে কাটাতে হয়। তাছাড়া আমার অল্প বয়সে যেসব গাছাপালাগুলি ছিল এখন আর তেমন নেই। সব জীর্ণ শুকনো দুর্বল হয়ে গেছে।

বালু বলল, তোমার ওজন যে রকম বেড়েছে সেটাও এর একটা কারণ হতে পারে।

কা গর্বভরে বলল, তা আমি বেশ লম্বাচওড়া তো বটেই। তবে আসল দোষটা হলো এই নতুন গজানো গাছপালার। শেষবার শিকার করার সময় আমি প্রায় গাছের উপর থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। লেজটা ভালোভাবে ডালের চারপারশে পেঁচিয়ে নিই নি আর পিছলে গিয়ে পড়ে যাবার সময় যে শব্দ হলো তাতে বানরগুলি জেগে যায়, আর তখন ওরা আমাকে যে কী বিশ্রী গালাগাল দেয়!

বাঘিরা তার গোঁফের ফাঁক দিয়ে বলল, পা-হীন, হলুদ, মাটির পোকা! মনে হলো বানরগুলি কী বলেছিল বাঘিরা যেন তা মনে করার চেষ্টা করছে।

শ্ স্ স্! ওরা এই সব বলেছে আমার সম্পর্কে ? কা জানতে চাইল।

গত পূর্ণিমার সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে ওই রকম কীসব যেন বলেছিল, তবে আমরা ওতে কোনো কান দিই নি। ওরা কী বলে আর না বলে তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তুমি নাকি তোমার সব দাঁত খুইয়েছ, ছোট্ট ছাগলছানার চাইতে বড় কিছু শিকার করার সাধ্য আর তোমার নেই, আর বড় পাঁঠার শিং দেখে তুমি এখন ভয় পাও! কিন্তু ওই বান্দরলোকের কথা ধরো না, ওদের মতো নির্লজ্জ জীব আর কেউ নেই!

এখন সাপ, বিশেষভাবে কা'র মতো চতুর বৃদ্ধ অজগর, কখনো তাদের রাগ দেখায় না। কিন্তু বালু আর বাঘিরা লক্ষ করল যে তার গলার কাছটা থিরথির করে কাঁপছে। সেখানকার মাংসপেশি ফুলে ফুলে উঠছে।

কা শান্ত কণ্ঠে বলল, বানরকুল তাদের আস্তানা পাল্টেছে। আজকে আমি যখন এখানে রোদ পোহাতে আসি তখন গাছের মাথায় ওদের হৈচৈ আর চেঁচামেচি শুনেছি।

এবার বালু বলল, আমরা— আমরা এখন ওই বানরকুলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এর বেশি কিছু আর সে বলতে পারল না, কারণ জঙ্গলের প্রাণী হয়ে বান্দরলোক সম্পর্কে কোনো উৎসাহ কেউ এর আগে দেখিয়েছে তেমন কথা তার মনে পড়ল না।

কা সৌজন্য ভরে বলল, তোমাদের দুজনের মতো নিজেদের অরণ্যের দুজন প্রধান নেতা যখন বান্দরলোকের খোঁজ করছো তখন ব্যাপারটা যে সামান্য নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কা ভেতরে ভেতরে বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

সত্যিই, বালু বলল। আমি সিওনির নেকড়েশাবকদের অরণ্যের বিধিবিধান শেখাই, বয়স হয়ে গেছে আমার, আর বাঘিরা— নিজের চিবুক সশব্দে চাপ দিয়ে বন্ধ করে বাঘিরা বলল, আর বাঘিরা হলো বাঘিরা। অতি বিনয়ী হবার কোনো প্রবণতা ছিল না তার মধ্যে। সমস্যাটা হলো এইখানে, কা। তুমি বোধহয় আমাদের মানবশিশুর কথা শুনেছ। ওই বাদাম-চোর আর পাতা কুড়ানো শয়তানগুলি ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

কা বলল, আমি ইক্কি সজারুর কাছে শুনেছিলাম যে তোমাদের নেকড়ে দলে একটা মানুষের বাচ্চা এসে ঢুকেছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। ও গল্প বানাতে ওস্তাদ।

কিন্তু কথাটা সত্য, কা। আর ওর মতো জ্ঞানী, সাহসী, চমৎকার মানবশিশু কেউ কোথাও দেখে নি। সমস্ত অরণ্যভূমিতে ও বালুর নামকে বিখ্যাত করে তুলবে। তাছাড়া, কা, আমি— আমরা ওকে ভালোবাসি।

কা দু'পাশে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালোবাসার ব্যাপারটা আমারও জানা আছে। আমি তোমাদের এমন সব গল্প শোনাতে পারি—

বাঘিরা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তার জন্য এমন একটা স্বচ্ছ সুন্দর রাত চাই যখন ভালো খেয়ে দেয়ে আমরা পরিতৃপ্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের মানবশিশু বান্দরলোকের হাতে বন্দি, আর আমরা জানি যে অরণ্যের সব প্রাণীদের মধ্যে ওরা ভয় করে একমাত্র কা'-কে।

হ্যাঁ, একমাত্র আমাকেই ওরা ভয় করে এবং যথার্থ কারণ আছে তার। নির্বোধ, অহঙ্কারী, আত্মম্ভরী, সারাক্ষণ কিচিরমিচির করে ওই বানরকুল। ওদের পাল্লায় কোনো মাবনশিশুর পড়াটা ভালো কথা নয়। যে বাদাম ওরা সংগ্রহ করে

একসময় ক্লান্ত হয়ে সেগুলি তারা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একটা গাছের শাখা ওরা দিনভর সযত্নে বয়ে বেড়ায়, ওটা দিয়ে বড় কিছু একটা করার পরিকল্পনা করে, তারপর হঠাৎ মড়াৎ করে ওটাকে দুখণ্ড করে নিচে ফেলে দেয়। না, না, ওই মানবশিশুকে তার বর্তমান অবস্থায় ঈর্ষা করার কিছু নেই। আর ওরা আমাকে কী বলেছে ? হলুদ মাছ, তাই না ?

পোকা, পোকা, মাটির পোকা। বাঘিরা বলল, আরো অনেক কিছু বলেছে যা আমি লজ্জায় এখন তোমার সামনে উচ্চারণ করতে পারব না।

ওদের প্রভুদের সম্পর্কে কী রকম শ্রদ্ধাভরে কথা বলতে হয় সেটা আমরা ওদের মনে করিয়ে দেব। তাদের ভুলোমনে আমরা ওদের স্মৃতি নতুন করে জাগিয়ে তুলব। এখন ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে ওরা কোনদিকে গেছে সেটা বলো।

সেকথা শুধু জঙ্গলই জানে। বোধহয় সূর্যাস্তের দিকে গেছে, বালু বলল। আমরা ভেবেছিলাম, কা, তুমি হয়তো জানবে।

আমি! আমি কেমন করে জানব ? সামনে পড়লে আমি ওদের ধরে ফেলি, নইলে আমি সাধারণত বান্দরলোক কিংবা ব্যাঙ এসব জীব কখনো খাই না। উপরে, উপরে! উপর দিকে তাকাও! হিল্লো! ইল্লো! ইল্লো! সিওনি নেকড়েগোষ্ঠীর বালু, চোখ তুলে ঊর্ধ্বে তাকাও!

কোথা থেকে এই শব্দ আসছে দেখবার জন্য উপর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে চিলকে দেখতে পেল। তার ডানার উপর অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে ঝকমক করছে। এখন চিলের নিদ্রা যাবার সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু তবু সে ভালুকের খোঁজে এতক্ষণ সারা জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়িয়েছে কিন্তু ঘন গাছগাছালির জন্য এতক্ষণ তার দেখা পায় নি সে।

কী বলছ ? বালু জানতে চাইল।

শোনো, আমি বানরকুলের সঙ্গে মৌগলিকে দেখেছি। সে আমাকে বলেছে তোমাদের যেন একটা খবর দিই। আমি নজর রেখেছি ওদের উপর। বানরকুল নদী পেরিয়ে ওকে বানরনগরীতে নিয়ে গেছে— শীতল গুহায়। ওরা সেখানে দশ রাত থাকতে পারে কিংবা এক রাত, কিংবা এক ঘণ্টা। তবে আমি বাদুড়দের বলে দিয়েছি রাতের অন্ধকারে ওদের উপর যেন তারা চোখ রাখে। তোমাদের জন্য এই হলো আমার বার্তা। তোমরা যারা নিচে আছ তাদের সকলের জন্য শুভেচ্ছা। শুভ শিকার!

বাঘিরা চেঁচিয়ে বলল, তোমার জন্য দীর্ঘ সুনিদ্রা কামনা করছি, চিল। আমি এর পরেরবার যখন শিকার ধরব তখন তোমার কথা মনে রাখব আর মাথাটা একেবারে তোমার জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখব, হে বন্ধু চিল!

ও কিছু না, ও কিছু না। বালকটি অরণ্যের প্রবাদ বাণী জানত, তার জন্য এটুকু তো আমার করতেই হতো। চিল চক্রাকারে ঘুরে তার আস্তানার দিকে চলে গেল।

বালু হাসিমুখে গর্বের সঙ্গে বলল, ও আমার শিক্ষা ভুলে যায় নি। এতটুকুন একটা বাচ্চা, কিন্তু পাখির ভাষা ওর মনে আছে, আর যখন বান্দরলোক ওকে গাছের মাথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখনও সে তা ভুলে যায় নি, খুব আশ্চর্য না ?

বাঘিরা বলল, তুমি যেভাবে এসব ওর মগজে ঠুসে দিয়েছ! কিন্তু, সত্যি, আমারও ওর জন্য খুব গর্ব হচ্ছে, তবে আর দেরি নয়, আমাদের এক্ষুণি শীতল গুহায় যেতে হবে।

জায়গাটা কোথায় সেটা ওদের সবারই জানা ছিল কিন্তু অরণ্যের প্রাণীরা প্রায় কেউই ওখানে কখনো যেত না। সেটা ছিল একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন নগর, বনের মধ্যে নিমজ্জিত, বিস্মৃত, আর মানুষ কোনো এক সময়ে ব্যবহার করেছে ওরকম কোনো জায়গা অরণ্যের প্রাণীরা কখনো ব্যবহার করতে চাইত না। বুনো শুয়োর করে, কিন্তু শিকারি জন্তুরা করে না। তাছাড়া বানরকুল ওখানে বাস করত, যদিও কোনো জায়গাকেই তাদের যথার্থ বাসস্থান বলা যেত না, আর ভীষণ খরার সময় ছাড়া কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অরণ্যের প্রাণী বানরকুলের কাছেপিঠে আসতে চাইত না। তবে ভীষণ খরার সময় যখন ওখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত পুকুর আর চৌবাচ্চায় সামান্য কিছু জল পাওয়া যেত তখন তারা সেখানে যেত।

বাঘিরা বলল, খুব দ্রুত বেগে গেলেও সেখানে পৌঁছতে অর্ধেক রাত লেগে যাবে। চিন্তিত মুখে বালু বলল, আমি যত জোরে সম্ভব ছুটব!

তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারব না, বালু। তুমি আমাদের অনুসরণ করো। কা আর আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

কা গম্ভীর গলায় বলল, পা থাকুক বা না থাকুক, তোমাদের চার পায়ের সঙ্গে সমান তাল রেখে আমি যেতে পারব। বালু জোরে ছোটার একটা চেষ্টা

করল কিন্তু একটু পরেই তাকে হাঁপাতে হাঁপাতে মাটিতে বসে পড়তে হলো। বাঘিরা আর কা তখন ওকে পেছনে রেখেই এগিয়ে গেল। বাঘিরা তার চিতার গতিতে ছুটে চলল। কা মুখে কিছু বলল না, কিন্তু বাঘিরার প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও ওই বিশালদেহী পাহাড়ি অজগর ঠিক তার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে চলতে থাকল। ওরা একটা পাহাড়ি স্রোতস্বিনীর সামনে এলে বাঘিরা এক লাফে সেটা পেরিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। কা তার মাথা আর ঘাড়ের দু'ফুট জলের উপর রেখে স্রোতস্বিনীটা সাঁতরে পেরুবার সময় একটু পিছিয়ে পড়েছিল কিন্তু সমতল ভূমিতে পৌঁছবার পর আবার সে দ্রুতগতিতে বাঘিরাকে ধরে ফেলল।

তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। বাঘিরা বলল, যে ভাঙা তালা আমাকে মুক্তি দিয়েছে তার নামে শপথ করে বলছি তুমি দারুণ জোরে ছুটতে পার।

কা বলল, আমি ক্ষুধার্ত, তার উপর ওরা আমাকে যা তা বলে গাল দিয়েছে!

পোকা! মাটির কীট! কী না বলেছে তোমাকে!

ঠিক আছে, ঠিক আছে। চলো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যাক। তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে কা কোন পথে দূরত্ব কম হবে সেটা বুঝতে পারত। সেই পথ ধরে সে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল।

এদিকে শীতল গুহায় বানরকুল মৌগলির বন্ধুদের কথা নিয়ে কিছুই ভাবছিল না। ছেলেটাকে ওরা হারিয়ে যাওয়া নগরে নিয়ে আসতে পেরেছে, সেই আনন্দেই ওরা তখন মত্ত। মৌগলি এর আগে কোনো ভারতীয় শহর দেখে নি। যদিও বিরান ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা জায়গা ছিল এই বিস্মৃত নগর তবু মৌগলির কাছে মনে হলো এটা একটা আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। বহুকাল আগে জনৈক রাজা একটা ছোট পাহাড়ের উপর এই শহর বানিয়েছিলেন। এখনও পাথরের সিঁড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ওই সিঁড়ি দিয়ে নগর-তোরণে পৌঁছান যায়। এখন সব জীর্ণ, ভাঙাচোরা। জীর্ণ কাঠের টুকরা মরচে পড়া লোহার খিলানে এখনো মাঝে মাঝে আটকে ঝুলে আছে। দেয়ালের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে গাছের চারা গজিয়েছে, পরিখাগুলি ভেঙে পড়েছে, মিনারের জানালা দিয়ে বুনো লতাপাতার ঝাড় বাইরে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে।

পাহাড়ের উপর বড় একটা প্রাসাদ। তার উপরে কোনো ছাদ নেই। প্রাঙ্গণ চত্বর আর ঝরনার চারপাশের মার্বেল পাথর ফাটলে ফাটলে আকীর্ণ, মলিন লাল আর সবুজ রঙে ছাওয়া, যে চত্বরের উপর দিয়ে রাজার হস্তীবাহিনী যেত সেখানেও খোয়া উঠে গেছে, তার ফাটল দিয়ে ঘাস আর ছোট ছোট গাছ

বেরিয়ে এসেছে। প্রাসাদের উপর থেকে সারি সারি পরিত্যক্ত বাসগৃহ দেখা যায়, একটার মাথার উপরও ছাদ নেই, গোটা শহর এখান থেকে চোখে পড়ে। এ যেন কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যক্ত একটা শূন্য মৌমাছির চাক। চত্বরের এক জায়গায় একটা বেঢপ পাথরের চাঙড় চোখে পড়ে। হয়তো কোনো দেবতার মূর্তি ছিল কোনো এক সময়। চত্বরের ওই জায়গায় চারটে রাস্তা এসে মিশেছিল। রাস্তার কোণে কোণে কুয়া ছিল এক সময় সেটা বোঝা যায়। মন্দিরের চূড়াগুলি ভেঙে পড়েছে। সেখানে এখন ডুমুর ধরেছে। বান্দরলোক এটাকেই বলত তাদের নিজেদের শহর। অরণ্যের প্রাণীরা জঙ্গলে বাস করে সেজন্য ওদের তারা অবজ্ঞা করতো। কিন্তু শহরের এই ভবনগুলি কেন নির্মাণ করা হয়েছিল, এদের কী কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্পর্কে বানরকুলের কিছুমাত্র ধারণা ছিল না। রাজার সভাকক্ষে তারা গোল হয়ে বসে নিজেদের গায়ের উকুন বাছত, ভাব দেখাত যে তারা মানুষ, ছাদহীন ঘরবাড়ির মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছোটাছুটি করত, দেয়াল থেকে খসে পড়া পলেস্তারা আর ভাঙা ইট নিয়ে এক কোনায় জড়ো করে রাখত, তারপর কোথায় যে সেগুলি লুকিয়ে রাখত সেকথা নিজেরাই এক সময় ভুলে যেত, আর তুচ্ছ কারণে নিজেদের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি আর মারামারিতে মেতে উঠত। তারপর আবার এক সময় সব ভুলে গিয়ে তারা রাজার বাগানে গিয়ে খেলত, গোলাপ গাছ আর কমলা গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সব ফুল আর ফল নিচে ফেলে দিত। এই সবই তাদের কাছে ছিল অর্থহীন মজার উপকরণ। প্রাসাদের সব গলি ও পথ, সব ছোট বড় ঘর, শত শত কুঠুরি সব তারা ঘুরে ঘুরে গেছে কিন্তু কী দেখেছে আর কী দেখে নি তার কিছুই ওরা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারত না। একে অন্যকে ওরা শুধু বলে বেড়াত মানবকুল যা করে ওরা তাই করছে। পুকুরে গিয়ে তারা জল পান করত, সব জায়গাটাকে নোংরা আর ঘোলা করে ফেলত, তারপর নিজেদের মধ্যেই কারণে অকারণে ঝগড়াবিবাদ বাঁধিয়ে দিত। তারপর এক সময় সবাই দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করতো, গোটা জঙ্গলে আমাদের এই বান্দরলোকের মতো এত প্রাজ্ঞ, এত ভালো, এত চতুর, এত শক্তিশালী ও এত শান্ত আর কোনো প্রাণী নেই। তারপর আবার তারা তাদের হৈচৈ শুরু করত এবং শহরের পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে আবার তারা ফিরে যেত তাদের গাছের মাথায়, মনে মনে আশা করত কখন অরণ্যের প্রাণীরা তাদের লক্ষ করবে, তাদের দিকে একটু নজর দেবে।

মৌগলি প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল অরণ্যের আইনের আওতায়। বানরকুলের এই জীবন সে বুঝলও না, এ ধরনের জীবন তার পছন্দও হলো না। বান্দরলোক তাকে শেষ বিকালে শীতল গুহায় টেনে এনেছে, দীর্ঘ পথ তারা অতিক্রম করেছে, এখন সে ঘুমাতে চায়, অথচ ওরা হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করেছে আর তাদের অর্বাচীন গান গাইছে। একটা বানর বক্তৃতা দিল, বলল যে মৌগলিকে বন্দি করে ধরে এনে তারা বান্দরলোকের ইতিহাসে এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এখন কাঠ-বেত-লতাপাতা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য কীভাবে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল বানানো যায় মৌগলি তাদেরকে সে কৌশল শিখিয়ে দেবে। মৌগলি কয়েকটা লতাগুচ্ছ নিয়ে ওদের কৌশলটা শেখাবার চেষ্টা করল, কয়েকটা বানর তারে অনুকরণ করারও প্রয়াস পেল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা ওদের সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে আবার তাদের তুচ্ছ অর্থহীন খেলাধুলায় মেতে উঠল। একজন আরেকজনের লেজ ধরে টান লাগাল, এই সবই চলতে লাগল সারাক্ষণ।

মৌগলি তখন বলল, আমার ক্ষুধা পেয়েছে। জঙ্গলের এ জায়গা আমার অচেনা। আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসো, নয়তো আমাকে এখানে শিকার করার অনুমতি দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশটা বানর হুপহুপ করে ওর জন্য বাদাম যোগাড় করার জন্য ছুটে গেল। বাদাম আর অন্যান্য বুনো ফল-ফলাদি নিয়ে আসবে তার জন্য। কিন্তু পথের মধ্যেই তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি বাঁধিয়ে যা সংগ্রহ করেছিল তার প্রায় সবই নষ্ট করে ফেলল। মৌগলি ভীষণ রেগে গেল। এদিকে ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে যাচ্ছে। সে শূন্য নির্জন নগরীতে ঘুরতে ঘুরতে 'অচেনার শিকারের ডাক' দিল বারবার কিন্তু কোনোখান থেকে কোনো সাড়া মিলল না। মৌগলি বুঝল যে সে খুবই খারাপ একটা জায়গায় এসে পড়েছে। মনে মনে সে বলল, বান্দরলোক সম্পর্কে বালু যা বলেছে সবই সত্য, ওদের কোনো আইন নেই, শিকারের কোনো ডাক নেই। ওদের আছে শুধু অর্থহীন কিছু আবোল তাবোল বুলি আর চোরের হাত। আমাকে যদি এখানে মেরে ফেলা হয় কিংবা উপোস থেকে থেকে যদি এখানে আমার মৃত্যু ঘটে তার জন্য আমিই দায়ী হবো। কিন্তু আমার নিজের অরণ্যে ফিরে যাবার জন্য আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। বালু ঠিকই আমায় মার লাগাবে কিন্তু এই বান্দরলোকের সঙ্গে ছুটে ছুটে গোলাপ-পাতা কুড়াবার চাইতে সেটা অনেক বেশি ভালো হবে।

আমাদের বুদ্ধি আর চালাকি দেখে জঙ্গলের প্রাণীরা মুগ্ধ হয়ে গেছে। হা হা।

মৌগলি নগরের দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে যেতেই বানরগুলি তাকে পেছনে টেনে এনে বলল, তুমি যে কত ভাগ্যবান সেটা তুমি বুঝতে পারছ না। তার কৃতজ্ঞতাবোধ জানাবার উদ্দেশ্যে ওরা তাকে চিমটি কাটতে লাগল। মৌগলি দাঁত টিপে চুপ করে থাকল, কিচিরমিচির করা বানরগুলির সঙ্গে লাল চৌবাচ্চাগুলির উপরে গিয়ে দাঁড়াল। তার মধ্যে এখনো বৃষ্টির জল অর্ধেক ধরা আছে। সামনের চত্বরের মাঝখানে সাদা মার্বেলের একটা গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামাগার ছিল, এখন ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে গেছে, কয়েক শো বছর আগে রানীদের জন্য এটা নির্মিত হয়েছিল। উপরের গম্বুজাকৃতি ছাদ অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছে। ভূগর্ভস্থ যে পথ দিয়ে রানীরা এখানে উপরে উঠে আসতেন ছাদ ধ্বসে পড়ায় সে পথটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু তার পাশের কিছু কিছু দেয়াল এখনো

অক্ষত আছে, আর তার গায়ে নানা রকম মনোমুগ্ধকর শিল্পকর্ম, মূল্যবান উজ্জ্বল মণিমুক্তা ও পাথর বসানো সেখানে। পাহাড়ের পেছনে চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোলা জায়গা দিয়ে চাঁদের আলো এখানে প্রবেশ করতেই চারপাশের নানা কারুকাজের ছায়া পড়ে একটা মোহজালের সৃষ্টি হলো। মৌগলির ততক্ষণে খুব ঘুম পেয়েছে, সে ক্ষুধার্তও, তবু বানরকুল যখন বিশ-পঁচিশ জন সমন্বয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল যে তারা কী রকম বুদ্ধিমান, শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ আর ওদের কাছ থেকে চলে যেতে চাওয়া মৌগলি যে একটা চূড়ান্ত নির্বোধ প্রাণী তখন সে হেসে না উঠে পারল না। বানরগুলি চিৎকার করে বলতে থাকল, আমরাই শ্রেষ্ঠ। আমরা স্বাধীন। আমরা অত্যাশ্চর্য। সমস্ত জঙ্গলে আমরাই সব চাইতে বিস্ময়কর প্রাণী, আমরা সবাই একথা বলছি কাজেই এটা সত্য হতে বাধ্য। একটু থেমে তারা বলল, তুমি নতুন এসব কথা শুনছ, তাই আমরা তোমার কাছে আমাদের সব বিস্ময়কর কীর্তির কথা বলব। তুমি ফিরে গিয়ে অরণ্যের সবাইকে এসব কথা বলবে যেন ভবিষ্যতে ওরা আমাদের প্রতি যথাযথ নজর দেয়। মৌগলি কোনো আপত্তি করল না। খোলা চত্বরের উপর শত শত বানর এসে জড়ো হয়ে উচ্চকণ্ঠে নিজেদের গুণকীর্তন করতে থাকল। কোনো একজন বক্তা নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু থামতেই আর সবাই সমন্বয়ে চিৎকার করে উঠল, এটা সত্য, এটা সত্য। আমরা সবাই একথা বলছি। মৌগলি মাথা দুলিয়ে চোখ পিটপিট করে বলল, হ্যাঁ। তারপর ওরা যখন তাকে কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল তখনই তার মাথা চারপাশের অসহ্য গোলমাল আর হৈচৈ-এ বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। আপন মনে সে বলল, শেয়াল তাবাকি নিশ্চয়ই এদেরকে কামড়ে দিয়েছে, আর এখন এরা সবাই পাগল হয়ে গেছে। অবশ্যই এটা দিওয়ানি, নিছক উন্মত্ততা। এরা কি কখনোই ঘুমায় না? ওই যে একটা মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিতে এগিয়ে আসছে। যদি মেঘটা যথেষ্ট বড় হয় তাহলে ওই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করব। কিন্তু আমি যে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নগর প্রাচীরের নিচে জীর্ণ ধ্বসে যাওয়া গর্তের মধ্যে বসে মৌগলির দুই প্রিয় বন্ধুও তখন ওই কালো মেঘ লক্ষ করছিল সতর্কতার সঙ্গে, বাঘিরা আর কা। বানরকুল যে কতখানি বিপজ্জনক তা ওদের জানা ছিল, তাই কোনো ঝুঁকি নিতেই তারা প্রস্তুত ছিল না। বান্দরলোকরা সংখ্যায় অন্তত একশো গুণ বেশি না হলে কোনো রকম সংঘর্ষে লিপ্ত হতো না, আর জঙ্গলের কোনো প্রাণীই ওই রকম অসম যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইত না।

কা ফিসফিস করে বলল, আমি পশ্চিম দেয়ালের দিক দিয়ে ওদিকের জমির ঢালু বেয়ে দ্রুত গতিতে নেমে আসব, ওতে আমার সুবিধা হবে। ওরা শতাধিক হলেও আমার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না, কিন্তু—

জানি, বাঘিরা বলল। আহ্, বালু যদি এখন এখানে থাকত! যাই হোক, আমরা যতটুকু পারি ততটুকু তো করতে হবে। ওই মেঘ চাঁদটা ঢেকে ফেললেই আমি ছাদের চত্বরে উঠে যাব। ছেলেটা সম্পর্কে ওরা ওখানে কী একটা সভা করছে।

কা গম্ভীর গলায় বলল, শুভ শিকার, তারপর পশ্চিম দেয়ালের দিকে পিছলে সরে গেল। ওদিকটায় ভাঙাচোরা ছিল সব চাইতে কম। পাথরের মধ্য দিয়ে সুবিধামতো পথ করে উঠে যেতে বিশালাকার সাপটির বেশ দেরি হলো। ততক্ষণে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। মৌগলি ভাবছিল, এবার কী হবে, আর ঠিক তখুনি সে ছাদের সামনের চত্বরে বাঘিরার লঘু পদশব্দ শুনতে পেল। কালো চিতা প্রায় নিঃশব্দে ভাঙা প্রাসাদের ঢালু বেয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসেই তার হিংস্র থাবা দিয়ে ডানে-বাঁয়ে আঘাত করে চলল। কামড়ে সময় নষ্ট করতে চায় নি সে। মৌগলির চারপাশে তখন পঞ্চাশ-ষাটটা করে বানর বৃত্তাকারে তাকে ঘিরে রেখেছে। বাঘিরা যখন উলটে-পালটে ছিটকে পড়া বানরগুলিকে আঘাত করে চলেছে তখন তারা ক্রোধে আর আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে যায়। তারপরই একটা বানর চেঁচিয়ে ওঠে, ও শুধু একটা প্রাণী। ওকে হত্যা করো! হত্যা করো ওকে! সঙ্গে সঙ্গে এক দল বানর আঁচড়ে কামড়ে টানাটানি করে বাঘিরাকে ঘিরে ধরল, আর চার-পাঁচটা বানর মৌগলিকে গ্রীষ্ম-বিশ্রামাগারের দেয়ালের উপর দিয়ে ভাঙা গম্বুজের গর্তের মধ্যে তাকে সজোরে ঠেলে দিল। বালকটি যদি মানুষের শিক্ষায় শিক্ষা পেত তাহলে পনেরো ফুট নিচে ওভাবে পড়ে যাওয়ায় হয়তো তার হাড়গোড় ভেঙে যেত কিন্তু কীভাবে মাটিতে পায়ের উপর পড়তে হবে বালুর কাছ থেকে মৌগলি সে শিক্ষা পেয়েছিল, ফলে সে কোনো ব্যথা পায় নি। বানরগুলি তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, তোমার বন্ধুদের খতম না করা পর্যন্ত ওইখানে চুপ করে বসে থাক, তারপর আবার আমরা তোমার সঙ্গে খেলব— যদি না অবশ্য বিষধর প্রাণীরা ইতোমধ্যে তোমাকে মেরে না ফেলে।

মৌগলি দ্রুত সর্পকুলের ডাক দিল, শোনো, তোমাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা ভাই ভাই। সে তার

চারপাশের ময়লা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে হিসহিস সরসর ধ্বনি শুনতে পেল। নিশ্চিত হবার জন্য মৌগলি দ্বিতীয়বার সর্পকুলের ডাক দিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক ডজন সাপ নিচু গলায় আওয়াজ তুলল, ঠিক! ঠিক! সবাই ফণা গুটাও। (ভারতের সকল পরিত্যক্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গা অনিবার্যভাবে সাপের বাসস্থান হয়ে ওঠে। এই গ্রীষ্মকালীন বিশ্রাম ভবনেও অসংখ্য কেউটে সাপ এসে বাসা বেঁধেছিল।) মৌগলির ডাকের উত্তরে সর্পকুলের আশ্বাসবাণী শোনা গেল, ছোট্ট ভাইটি, যেখানে আছে সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, কারণ তোমার পায়ের চাপে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি।

মৌগলি যেখানে ছিল সেখানে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। উপরে চিতাকে ঘিরে তখন বানরকুলের তীব্র লড়াই চলছে। চিৎকার, লাফালাফি, দাপাদাপি, কামড়াকামড়ি, আর বাঘিরা একবার পিছিয়ে যাচ্ছে, একবার ঘিরে থাকা শত্রুদের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসছে, শরীর আঁকাবাঁকা করে গা মুচড়ে সুযোগ পেলেই বানরকুলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জন্মাবার পর এই প্রথমবারের মতো বাঘিরাকে নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য এইভাবে লড়তে হচ্ছে।

মৌগলি মনে মনে ভাবল, বালু নিশ্চয়ই কাছে পিঠে কোথাও আছে। বাঘিরা নিশ্চয়ই একা এখানে আসে নি। তারপরই সে বলে উঠল, বাঘিরা, জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাও। গড়িয়ে গড়িয়ে ওখানে গিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো!

বাঘিরা মৌগলির নির্দেশ ঠিক শুনতে পেল। এখনো বেঁচে আছে এই তথ্য তার মনে নতুন সাহস এনে দিল। সে মরিয়া হয়ে, একটু একটু করে, সোজা জলাধারগুলির দিকে অগ্রসর হতে থাকল। নিঃশব্দে সে তার থাবা দিয়ে চারপাশের বানরগুলিকে আঘাত করতে থাকল এবং ঠিক এই সময়ে জঙ্গলের সব চাইতে কাছের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেয়ালের পাশ থেকে বালুর গমগম কণ্ঠের যুদ্ধ-নিনাদ ভেসে এলো। বুড়ো ভালুক তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কিন্তু এর আগে তার পক্ষে এখানে এসে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। বালু চিৎকার করে বলল, বাঘিরা, আমি এসে গেছি। আমি এক্ষুণি উপরে উঠে আসছি। উহ্! আমার পায়ের নিচে পাথর হড়কে যাচ্ছে! ওরে বদমাশ বানরের পাল, একটু অপেক্ষা কর, আমি এলাম বলে। বালু হাঁপাতে হাঁপাতে ছাদের চত্বরে ওঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে এক গাদা বানর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বালু তার ভারি পাছার উপর বসে তার সামনের দুই দুর্দান্ত থাবা দিয়ে যতগুলি সম্ভব বানরকে তার বাহুর মধ্যে টেনে পিষে ফেলতে শুরু করল, আর তারপর ভ্যাট-ভ্যাট-ভ্যাট

করে ডানে বাঁয়ে প্রচণ্ড চড় চাপড় লাগাতে থাকল। এমন সময় ঝপাৎ করে একটা শব্দ হতেই মৌগলি বুঝল যে বাঘিরা বানরকুলের আক্রমণ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জলাধারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছে। সেখানে তাকে অনুসরণ করার সাধ্য নেই বানরবাহিনীর। চিতা জলের মধ্যে শুয়ে শুধু তার নাকটা সামান্য উঁচুতে তুলে বড় বড় শ্বাস নিয়ে হাঁপাতে লাগল আর বানরের দল লাল সিঁড়ির উপর তিন তিন সারিতে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, বালুকে সাহায্য করার জন্য উঠে এলেই ওরা তার উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই সময় বাঘিরা তার জলসিক্ত চিবুক একটু উঁচু করে প্রায় হতাশকণ্ঠে, তাকে রক্ষা করার জন্য, সর্পকুলের উদ্দেশে ডাক দিল, শোনো, তোমাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আমরা ভাই ভাই। বাঘিরার মনে হয়েছিল কা বোধহয় শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেছে। বালু তখন ছাদের চত্বরের কিনারে এসে পৌঁছেছে। বানরের দল তখনো তাকে পিষে শেষ করে দেবার চেষ্টায় মত্ত। ওই অবস্থাতেও বাঘিরার সাহায্যের আবেদন শুনে সে তার মৃদু হাসি চাপতে পারল না।

কা ততক্ষণে সবেমাত্র পশ্চিম দেয়ালের উপর দিয়ে ওঠে এসেছে। তার শরীরের ধাক্কায় একটা পাথর গর্তের মধ্যে ঝুপ করে পড়ে গেল। কা তার লম্বা দেহ কয়েকবার পেঁচাল, খুলল, আবার পেঁচাল, দেখে নিল সব কিছু ঠিকমতো কাজ করছে কিনা। সামান্যতম সুবিধাটুকু সে হারাতে চাইল না। ওদিকে বালুর সঙ্গে বানরদের লড়াই চলছে, জলাধারের চারপাশে বাঘিরাকে ঘিরে বান্দরলোক প্রচণ্ড চিৎকার করছে, মং বাদুড় চারিদিকে ওড়াউড়ি করে অরণ্যের এই যুদ্ধের কথা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে, এমনকি বুনোহাতি পর্যন্ত প্রচণ্ড জোরে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে, আর চারদিকের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বান্দরলোক জেগে উঠে গাছগাছালির পথ ধরে শীতল গুহায় তাদের বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে। যুদ্ধের হৈচৈ আর ডামাডোলে দিবসের পক্ষীকুলও মাইলের পর মাইল জুড়ে নিদ্রা ভঙ্গ করে জেগে উঠেছে।

এদিকে কা, হত্যা করার জন্য উদগ্রীব, দ্রুত সোজা ছুটে এল। অজগরের লড়াই করার সব শক্তি থাকে মাথা তুলে ছোবল হানার মধ্যে, আর তার সেই শক্তি যোগায় তার গোটা দেহের ওজন ও জোর। অনুমান করো, একটা প্রশান্ত মন একটা বর্শা কিংবা মুগুর কিংবা একটা হাতুড়ির মধ্যে সক্রিয় হয়ে আছে। আর ওই বস্তুটির ওজন হচ্ছে আধ টনের মতো, তখন যে ব্যাপারটি ঘটতে

পারে কা যুদ্ধে নামলে ঠিক তাই ঘটে। একটা চার-পাঁচ ফুট লম্বা অজগর কোনো মানুষের বুকে ঠিক মতো আঘাত হানতে পারলে ওই এক আঘাতেই সে লোকটিকে ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয়। আর কা ছিল লম্বায় ত্রিশ ফুট। সে তার প্রথম আঘাত হানল বালুর চারপাশে জমায়েত হওয়া বানরগুলির ঠিক কেন্দ্রস্থলে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে তারা নিঃশব্দে পড়ি কী মরি করে ছুটে পালাল। কা'কে আর দ্বিতীয় আঘাত হানতে হলো না। পালাও, পালাও! কা! কা এসেছে! চেঁচাতে চেঁচাতে বানরগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে পালাল।

বানরকুল বড়দের কাছ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কা'র গল্প শুনে এসেছে। তাদের ভদ্র আচরণ শেখাবার জন্য ওদের বাবা-মা প্রায়ই তাদেরকে কা'র গল্প শোনাত। রাতের অন্ধকারে কা নিঃশব্দে গাছের ডাল বেয়ে উপরে উঠে সব চাইতে শক্তিশালী বানরকেও অবলীলাক্রমে ধরে নিয়ে পালিয়ে যেত। প্রবীণ কা এমন নিশ্চুপ নিশ্চল রূপ ধারণ করতে পারতো যে তাকে দেখে মনে হতো কোনো গাছের মরা ডাল, কোনো ক্ষয়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ি, সব চাইতে বুদ্ধিমান বানরও এটা ধরতে পারতো না। জঙ্গলে কা-ই ছিল তাদের কাছে সব চাইতে ভীতিপ্রদ প্রাণী, কারণ তার ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না, কেউই তার চোখের দিকে সোজা তাকাতে পারতো না, তার আলিঙ্গনের বন্ধন থেকে কেউ কখনো মুক্ত হয়ে ফিরে আসে নি। তাই এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ভয়ে কিচিরমিচির করতে করতে তারা এই ভাঙা বাড়ির দেয়াল, ছাদ বেয়ে, যে পথে সম্ভব ছুটে পালিয়ে গেল। আর এতক্ষণে বালু একটা দীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। বাঘিরার চাইতে তার দেহের রোমশ ত্বক ছিল অনেক পুরু কিন্তু বানরকুলের সঙ্গে মারামারির সময় সে খুবই আঘাত পেয়েছিল। এবার কা প্রথমবারের মতো মুখ খুলে একটা দীর্ঘ হিসহিস শব্দ উচ্চারণ করল, আর শীতল গুহাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছুটে আসা দূরবর্তী বানরগুলি যেখানে ছিল সেখানেই থেমে পড়ল, কাঁপতে লাগল ভয়ে, তাদের দেহের ভারে গাছের ডালপালা বেঁকে গেল, মড়মড় করে উঠল। দেয়ালের উপর আর শূন্য নির্জন বাড়িগুলিতে যে বানরগুলি ছিল তারাও এবার সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। পরিত্যক্ত নগরীতে এক অতল স্তব্ধতা নেমে এল। বাঘিরা ততক্ষণে জলাধার থেকে উঠে এসেছে। গা ঝাড়া দিয়ে সে তার শরীর থেকে জলের কণা ঝেড়ে ফেলছে। তারপরই আবার চিৎকার চেঁচামেচি হৈচৈ শুরু হলো। বানরগুলি দেয়ালের খুব উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠে গেল, পাথরের দেবমূর্তির গলা

জড়িয়ে ধরে প্রাচীরের বিভিন্ন জায়গায় বসে তার-স্বরে চিৎকার করতে লাগল। আর মৌগলি গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামভবনের ভেতরে বসে আনন্দিত চিত্তে নাচতে লাগল, ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে বানরগুলিকে নানারকম মুখভঙ্গি করে বিদ্রূপ করতে আর ভেংচি কাটতে থাকল। সে মাঝে মাঝে তার সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে প্যাঁচার মতো একটা আওয়াজ বার করতে থাকল বানরদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

ক্লান্ত বাঘিরা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মানবশিশুকে এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার করে এখান থেকে নিয়ে চল। আমার পক্ষে আর কিছু করা এখন সম্ভব নয়। ওরা হয়তো আবার আক্রমণ করবে।

কা হিসহিস করে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আদেশ না দেয়া পর্যন্ত এরা এক চুলও নড়বে না। সঙ্গে সঙ্গে নগরী আবার স্তব্ধ নিশ্চুপ হয়ে গেল। তারপর বাঘিরার দিকে তাকিয়ে কা বলল, ভাই, আমার মনে হয় আমি তোমার ডাক শুনেছিলাম, কিন্তু সত্যি এর চাইতে দ্রুত বেগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাঘিরা বলল, লড়াই চলার সময় আমি হয়তো সাহায্যের জন্য ডাক দিয়েছিলাম...। তো, বালু, তোমার খুব লাগে নি তো?

বালু গম্ভীর মুখে বলল, আমাকে টেনে হিঁচড়ে ওরা একশো ভালুকছানায় পরিণত করেছে কিনা বলতে পারব না। সে এক এক করে তার দুপা নাড়তে নাড়তে বলল, ওহ্! খুবই ব্যথা করছে আমার। তারপর বলল, কা, আমাদের প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা, বাঘিরা আর আমি, তোমার কাছে দায়বদ্ধ থাকলাম।

আহ্, যেতে দাও ওকথা। তো মানবশিশুটা কোথায় এখন?

মৌগলি উচ্চকণ্ঠে জানাল, আমি এইখানে, এই ফাঁদে আটকা পড়ে আছি। ভাঙা গম্বুজের চারপাশ তার মাথা ঘিরে রেখেছে।

গর্তের ভেতরের কেউটেগুলি বলল, ওকে তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরিয়ে নাও। ময়ূরের মতো যেভাবে নাচানাচি করছে তাতে আমাদের বাচ্চা সাপের ছানাগুলিকেও পিষে মেরে ফেলবে।

কা সহাস্যে বলল, বাহ্। দেখতে পাচ্ছি এই মানবশিশুর বন্ধু আছে সর্বত্র। শোনো, মানবশিশু, দূরে সরে দাঁড়াও। আর বিষাক্ত সর্পকুল, তোমরাও কোথাও লুকিয়ে পড়ো। আমি এই দেয়াল সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেব।

কা খুব মনোযোগসহকারে পাথরের দেয়ালে রং জ্বলে যাওয়া দুর্বল একটা জায়গা খুঁজে বার করল। তারপর তার মাথা দিয়ে দু তিনবার ছোট ছোট ধাক্কা দিয়ে কতটা দূরত্ব প্রয়োজন হবে তা ঠিক করে নিল। এরপর তার শরীরের ছয় ফুট অংশ মাটি থেকে সোজা উপরে তুলে তার নাক সামনে ধরে পর পর ছয় সাতবার প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। ঘুলঘুলি বসানো দেয়াল ধুলো আর আবর্জনার ঝড় তুলে ঝুরঝুর করে ধ্বসে পড়ল আর সদ্য সৃষ্ট ফোঁকর দিয়ে মৌগলি এক লাফে বেরিয়ে এসে তার দুহাত দিয়ে বালু আর বাঘিরার গলা জড়িয়ে ধরল।

বালু সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার কি কোথাও খুব লেগেছে?

আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত, আঘাতও পেয়েছি বেশ খানিকটা। কিন্তু, আমার ভাই দুটি, ওরা তোমাদের উপর খুবই অত্যাচার করেছে। তোমাদের শরীর থেকে এখনও রক্ত ঝরছে।

বাঘিরা নিজের ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, ওদের অবস্থাও কম খারাপ হয় নি। ছাদের সামনের চত্বরে আর জলাধারের চারপাশে মৃত বানরগুলির দিকে তাকাল বাঘিরা।

বালু ধরা গলায় বলল, তুমি, আমার ক্ষুদে ব্যাং সোনামণি, তুমি নিরাপদে আছ সেইটেই আসল কথা। বাকি আর সব কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

বাঘিরা শুকনো গলায় বলল, এ বিষয় আমরা পরে বিবেচনা করব। বাঘিরার গলার সুর মৌগলির মোটেই ভালো লাগল না। কিন্তু এই যে, কা'কে দেখো, আমরা যে যুদ্ধে জিতেছি, তোমার প্রাণ যে রক্ষা পেয়েছে, তা সব এই কা'র জন্য। মৌগলি, আমাদের অরণ্যের প্রাণীর প্রথা অনুযায়ী তাকে তোমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাও।

মৌগলি ঘুরে দাঁড়াতেই বিশাল অজগরের মাথাটা দেখতে পেল, তার নিজের মাথার ফুটখানেক উঁচুতে একটু একটু করে দুলছে।

তা হলে এই হলো মানবশিশু, কা বলল। ওর গায়ের ত্বক কী মসৃণ, আর দেখতেও বান্দরলোকের সঙ্গে পার্থক্য খুব বেশি নেই। সতর্ক থেকো, মানবশিশু, আমি নতুন খোলস নেবার সময় যেন তোমাকে বানর বলে ভুল না করে বসি।

মৌগলি জবাব দিল, আমাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তোমার ধমনীতে আর আমার ধমনীতে। আজ রাতে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

কা, তুমি যদি কখনো ক্ষুধার্ত হও, তখন মনে রেখো, আমি যেটা শিকার করব সেটা হবে তোমারও শিকার।

অনেক ধন্যবাদ, ক্ষুদে ভাইটি আমার। কা'র চোখ চকচক করতে লাগল। কিন্তু তোমার মতো এত সাহসী শিকারি কী হত্যা করবে? পরের বার তুমি যখন শিকারে বেরুবে তখন আমাকে তোমার সঙ্গে যাবার অনুমতি দেবে কি?

আমি কিছুই শিকার করি না। আমি এখনো খুবই ছোট। তবে যাদের প্রয়োজন হয় তাদের জন্য আমি ছাগলের পাল তাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাই। তোমার যখন খিদে পাবে তখন আমার কাছে এস, নিজেই দেখবে আমি সত্য কথা বলছি কিনা। এসব ব্যাপারে আমার কিছু দক্ষতা আছে (সে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখাল), যদি তুমি কখনো কোনো ফাঁদে আটকা পড়ো, তাহলে তোমার কাছে, বাঘিরার কাছে, বালুর কাছে আমার যে ঋণ হলো তা আমি হয়তো শোধ করে দিতে পারব। হে আমার প্রভুরা, তোমাদের সবার জন্য শুভ শিকার!

বালু গমগম করে বলল, সুন্দর বলেছ, মৌগলি। কারণ সত্যিই মৌগলি ওদের সবাইকে খুব চমৎকারভাবে ধন্যবাদ দিয়েছে। অজগরটি এক মুহূর্তের জন্য মৌগলির কাঁধের উপর তার মাথা হালকাভাবে স্থাপন করল, তারপর বলল, খুব সাহসী এর অন্তর, আর কথা বলে অতিশয় সৌজন্যের সঙ্গে। এই গুণাবলি অরণ্যের জগতে ওকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন, মানবশিশু, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাও। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, চাঁদ এখনই অস্ত যাবে, এবং তারপর যা ঘটবে তোমার তা না দেখাই ভালো।

চাঁদ ততক্ষণে পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যেতে শুরু করেছে। বানরের দল কাঁপতে কাঁপতে সারি বেঁধে দেয়ালের উপর বসে আছে। বালু একটা জলাশয়ের কাছে গিয়ে জল পান করল। বাঘিরা তার গায়ের রোম ঝাড়া দিয়ে ঠিকঠাক করে নিল। কা সরসর করে চত্বরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে সশব্দে তার চোয়াল দুটি বন্ধ করল, আর সেই শব্দে সবগুলি বানরের চোখ স্থির হয়ে নিবদ্ধ হলো তার উপর।

কা বলল, চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। এখনও কি দেখার মতো আলো আছে? দেয়ালের উপর থেকে গাছের ডালের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা বাতাসের ফিসফিস ধ্বনির মতো উত্তর এল, ও কা, আমরা দেখতে পাচ্ছি।

চমৎকার। এবার তা হলে নাচ শুরু হবে— কা-র ক্ষুধা-নৃত্য। চুপ করে বসে দেখো সবাই।

কা একটা বড় বৃত্তের মধ্যে দুতিনবার ঘুরল, মাথাটাকে একবার ডান দিকে আরেকবার বাঁ দিকে টেনে আনল। তারপর নিজের শরীরকে নানাভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে, গোল করে, ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজের মতো করে, কখনো পাঁচকোনা করে, কখনো পেঁচানো চূড়ার মতো করে, একটুও না থেমে, একটুও তাড়াহুড়া না করে, আশ্চর্য ছন্দময় ভঙ্গিতে নেচে চলল কা, ক্লান্তিহীন, অপূর্ব সুষমাময়, আর এই নাচের সঙ্গে সারাক্ষণ চলছে তার মৃদুকণ্ঠের গুনগুন গান। এদিকে অন্ধকার গাঢ়তর হলো এবং এক সময় কা'র লম্বা পেঁচানো চুড়ো করা শরীর আর দেখা গেল না, যদিও তার নড়াচড়ার শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল।

বালু আর বাঘিরা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসেছিল, যদিও তাদের গলা থেকে নিঃসৃত হচ্ছিল একটা গরগর ধ্বনি, আর তাঁদের ঘাড়ের কাছে রোম কাঁটার মতো খাড়া হয়ে গিয়েছিল। আর মৌগলি অবাক বিস্ময়ে চুপ করে সব দেখছিল।

অবশেষে কা বলল, বান্দরলোক, আমার আদেশ ছাড়া তোমরা কি তোমাদের একটা পা কিংবা একটা হাত নাড়তে পার ? জবাব দাও!

ও কা, তোমার আদেশ ছাড়া আমরা আমাদের একটা পাও নাড়তে পারি না, একটা হাতও নাড়তে পারি না।

খুব ভালো। এবার তোমরা সবাই আমার কাছে এক পা এগিয়ে আসো।

অসহায়ভাবে বানরের সারি দুলতে দুলতে কা-র কাছে এগিয়ে গেল। বালু আর বাঘিরাও তাদের সঙ্গে নিজেদের অজান্তেই একটু অগ্রসর হলো।

আরো কাছে! তীব্র হিসহিস কণ্ঠে আদেশ করল কা। আবার সবাই একটু এগিয়ে গেল।

মৌগলি এই সময় বালু আর বাঘিরাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনার জন্য তাদের পিঠের উপর নিজের হাত রাখল। বালু আর বাঘিরা চমকে উঠল, যেন এইমাত্র তারা কোনো একটা স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠল।

বাঘিরা নিচু গলায় বলল, আমার কাঁধের উপর তোমার হাতটা রাখো, মৌগলি, নয়তো আমাকে কা-র কাছে— কা'র কাছে— ফিরে যেতে হবে। আ-হ্-!

মৌগলি বলল, বুড়ো কা তো শুধু ধুলার বুকে বৃত্ত রচনা করে চলেছে। ঠিক আছে, চলো, আমরা এখান থেকে বিদায় হই। ওরা তিনজন ভাঙা দেয়ালের ফোকর গলে জঙ্গলের পথে যাত্রা করল।

নিশ্চল বৃক্ষপুঞ্জের নিচে দাঁড়িয়ে বালু বলল, উহ্! কা'র সঙ্গে আমি আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতাব না। সে আবার সজোরে তার সর্বাঙ্গ ঝাড়া দিল।

বাঘিরার শরীর তখনো একটু একটু করে কাঁপছিল। সে বলল, আমাদের চাইতে অনেক কিছু বেশি ও জানে। আমি যদি ওখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতাম তা হলে নিশ্চিতভাবে ওর গলার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতাম।

বালু বলল, চাঁদ উঠবার আগেই অনেক কিছু আজ এই পথ দিয়ে যাবে। আজ কা তার নিজের পদ্ধতিতে অনেক শিকার পাবে।

মৌগলি প্রশ্ন করল, কিন্তু এসবের মানে কী ? অজগরের সম্মোহনী শক্তি সম্পর্কে তার কিছুই জানা ছিল না। আমি তো দেখলাম একটি মস্তবড় সাপ তার শরীর ভেঙেচুরে নানারকম আকৃতি বানাচ্ছে, আর তার নাক রীতিমত ক্ষতবিক্ষত।

বাঘিরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মৌগলি, তার নাকের ওই অবস্থা হয়েছে তোমারই জন্য। আর এই যে আমার কান, থাবা, পার্শ্বদেশ দেখছো, বালুর ঘাড় আর কাঁধ দেখছো, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এর সব কিছু ঘটেছে তোমার জন্য। বালু কিংবা আমি, আমাদের দুজনের কেউই অনেক দিন ভালোভাবে শিকার করতে পারব না।

বালু বলল, যেতে দাও এসব কথা। মানবশিশুটিকে তো আমরা আবার ফিরে পেয়েছি।

সে কথা সত্য, কিন্তু এর জন্য আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা এই সময়ে ভালো ভালো অনেক কিছু শিকার করতে পারতাম, তার পরিবর্তে বেদম আঘাত পেয়েছি, শরীরের নানা জায়গায়, সবচেয়ে বেশি পেয়েছি আমার অহঙ্কারে। একবার শুধু মনে করে দেখো, মৌগলি, আমি কালো চিতা, আমাকে সাহায্যের আবেদন জানাতে হয়েছে কা'র কাছে। আর বালু আর আমি, আমাদের মতো দুজনকেও, ওই ক্ষুধানৃত্য দেখে হাবা গঙ্গারাম বনে যেতে হয়েছিল। শোনো, মানবশিশু, তুমি বান্দরলোকের সঙ্গে খেলতে যাওয়াতেই এসব ঘটেছে।

মৌগলি দুঃখভরা গলায় বলল, সত্যি, এটা একাকারে খাঁটি সত্য। আমি একটা খারাপ মানবশিশু, আর এই মুহূর্তে আমার পেট হাহাকার করে চলেছে।

উঁ ! কিন্তু, বালু, জঙ্গলের আইন কী বলে ?

মৌগলিকে আর কোনো অসুবিধায় ফেলতে চায় নি বালু, কিন্তু অরণ্যের আইনের ব্যত্যয় করা সম্ভব নয়, তাই সে বিড়বিড় করে বলল, দুঃখ প্রকাশ দ্বারা শাস্তি এড়ানো যায় না। কিন্তু, বাঘিরা, মনে রেখো ও খুবই ছোট একটা বাচ্চা।

সে কথা আমি মনে রাখব, বালু, কিন্তু সে একটা খারাপ কাজ করেছে এবং সেজন্য তাকে মার খেতে হবে। মৌগলি, তোমার কি এ ব্যাপারে কিছু বলবার আছে ?

না। আমি অন্যায় করেছি। তুমি আর বালু আহত হয়েছ। আমার শাস্তি পাওয়াই উচিত।

বাঘিরা তাকে ছ'-সাতটা কোমল চড়-চাপড় লাগাল। চিতার দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা ছিল খুবই সামান্য ব্যাপার। তার নিজের শিশুসন্তানকে এরকম আঘাত করলে তাতে তাদের ঘুমও ভাঙত না, কিন্তু সাত বছরের এক মানবসন্তানের কাছে তা ছিল প্রচণ্ড প্রহারের সামিল। প্রহারের পালা শেষ হবার পর মৌগলি কয়েকবার হাঁচি ছিল, তারপর কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

তখন বাঘিরা বলল, ছোট্ট ভাইটু, এখন লাফ দিয়ে আমার পিঠে চড়ে বসো, এবার আমরা বাড়ি যাব।

অরণ্যের আইনের নানা সুন্দর জিনিসের মধ্যে একটা হলো এই যে, শাস্তি প্রদানের পর সব কিছুর সন্তোষজনক বোঝাপড়া হয়ে যায়। এ নিয়ে পরে আর কোনো কথা হয় না।

মৌগলি বাঘিরার পিঠে মাথা রেখে এমন গভীর ঘুমে ডুবে যায় যে তার গৃহগুহায় মা-নেকড়ের পাশে শুইয়ে দেবার আগ পর্যন্ত সে এক মুহূর্তের জন্যও জাগে নি।

ভয় কীভাবে এলো

পৃথিবীর সব চাইতে প্রাচীন আইন হলো অরণ্যের আইন। অরণ্যের প্রাণিকুল যে ধরনের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে তার প্রায় সব কিছুর বিধিবিধান দেয়া রয়েছে

অরণ্যের আইনে। কাল এবং অভ্যাসের পক্ষে যতটুকু নিখুঁত করা সম্ভব, এই আইনকে এখন পর্যন্ত ততটুকু নিখুঁত ও ত্রুটিহীন করা হয়েছে। তোমাদের হয়তো মনে আছে সিওনির নেকড়ে-দলের সঙ্গে থাকার সময় মৌগলি অরণ্যের এই আইন ও বিধিবিধান শিখতে তার জীবনের একটা বড় অংশ কাটিয়েছে। মাঝে মাঝে নির্দেশের পর নির্দেশ শুনতে শুনতে বালকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে বালু তাকে বলত যে অরণ্যের আইন হলো দৈত্যের মতো একটা বিশাল লতানো গাছ, সকলের পিঠের উপর তা পড়ে এবং তার হাত থেকে কারো নিস্তার নাই। তুমি যদি আমার মতো দীর্ঘদিন বেঁচে থাক, ছোট্ট ভাইটি আমার, তাহলে দেখবে অরণ্যের প্রাণিকুল কীভাবে অরণ্যের আইন মেনে চলে, বিশেষ করে একটি আইন। আর সে দৃশ্য খুব আরামদায়ক হবে না।

বালুর এইসব কথা মৌগলির এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। যে বালকের সারাটা সময় কেটে যায় ঘুমিয়ে আর খেয়ে তার পক্ষে সমস্যার একেবারে মুখোমুখি হবার আগ পর্যন্ত এসব কথার তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হয় না। কিন্তু বালুর কথা একদিন সত্য হয়ে দেখা দিল এবং মৌগলি তখন গোটা অরণ্য একটি আইন কী রকম কঠোরভাবে মেনে চলে তা প্রত্যক্ষ করল।

ব্যাপারটা শুরু হলো, যখন সেবার শীতকালীন বৃষ্টি প্রায় এক ফোঁটাও পড়ল না। ইক্কি সজারু বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিছু একটা দেখে বলল যে চুবড়ি আলু একেবারে শুকিয়ে আছে। মৌগলি তার কথার উপর তেমন গুরুত্ব দিল না। সবাই জানত যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ইক্কি ছিল ভীষণ সৌখিন ও খুঁতখুঁতে। রসাল পরিপক্ব সুস্বাদু ফলমুল ছাড়া তার মুখে কিছু রুচত না। তাই ইক্কির কথা শুনে মৌগলি হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু তাতে আমার কী ?

ইক্কি তার গায়ের কাঁটাগুলি সরসর করে নাড়তে নাড়তে বলল, এখন বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু পরে আমরা সবাই টের পাব। শোনো, ছোট্ট ভাইটি, সুগভীর পাহাড়ি ঝরনার বুকে তুমি কি এখন আগের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ো ?

না। বোকা জলরাশি সব চলে যাচ্ছে। আমি আমার মাথাটা ভাঙতে চাই না। মৌগলি মনে করত যে অরণ্য সম্পর্কে অন্য যে কোনো প্রাণীর চাইতে তার জ্ঞানবুদ্ধি কম নয়।

ইক্কি শজারু বলল, তোমার মাথা একটুখানি ফেটে গেলে ভালোই হতো। সেই ফাঁক দিয়ে তোমার মগজে খানিকটা জ্ঞান ঢুকত। বলেই ইক্কি দ্রুত তার মাথা সরিয়ে নিল, যেন মৌগলি তার নাকের লোম ধরে টান দিতে না পারে।

মৌগলি যখন বালুকে ইঙ্গির কথা বলল তখন কিন্তু বালুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, আমি একা হলে এখনই আমার শিকারের স্থান পরিবর্তন করতাম। অন্যরা এ বিষয়ে ভাববার আগেই আমি অন্যত্র চলে যেতাম। কিন্তু অচেনা জায়গায় শিকার করার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং তখন ওরা হয়তো এই মানবশিশুর ক্ষতি করে বসবে। একটু অপেক্ষা করে দেখি মহুয়া কী রকম হয়।

বালুর কাছে মহুয়া ছিল অত্যন্ত প্রিয় একটি খাবার কিন্তু ওই বসন্তে কোনো মহুয়া ফুলই ফুটল না। সবুজ ঘিয়ে রঙের মোমের মতো কুসুমগুলি জন্মাবার আগেই খরায় মরে গেল। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বালু যখন মহুয়া গাছটাকে নাড়া দিল তখন তার উপর থেকে শুধু কয়েকটা দুর্গন্ধময় শুকনো পাপড়ি ঝরে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্রবল উষ্ণতা হামাগুড়ি দিয়ে অরণ্যের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে পড়ল। অরণ্যের রূপ বদলে গেল। প্রথমে হলুদ, তারপর ধূসর, তারপর কালো। পাহাড়ি খাদের পাশে গজানো সবুজ লতাপাতা ও শ্যাওলা পুড়ে ভাঙা তারের মতো হলো; চোখের আড়ালের ডোবাগুলি শুকনো খটখটে হয়ে গেল, তার কিনারের পায়ের দাগগুলি মনে হলো যেন পাথরের ছাপ মারা; রসাল লতাগুল্মগুলি শুকিয়ে গাছ থেকে ঝরে পড়ে মাটিতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো; বাঁশঝাড়গুলি মরে গেল; গরম হাওয়ার ঝাপ্টায় শুকনো মড়মড় ধ্বনি উঠল সেখান থেকে; গভীর অরণ্যের টিলার গা থেকে সব সবুজ শ্যাওলা অপসৃত হয়ে তাকে দেখাল স্রোতস্বিনীর নিচে কম্পমান বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়ের মতো।

বছরের গোড়ার দিকেই পাখির দল ও বানরকুল উত্তর দিকে চলে গিয়েছিল। সামনে কী দিন আসছে ওরা তা ঠিক বুঝেছিল। হরিণ আর বুনো শুয়োরের পাল জঙ্গল ছেড়ে খরাপীড়িত গাঁয়ের মাঠে গিয়ে দুর্বল ক্ষুধার্ত শক্তিহীন মানুষ কর্তৃক আক্রান্ত হবার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। কিন্তু চিল কোথাও গেল না। প্রচুর খাদ্য এখন তার, মরা পশুর ঘাটতি নেই। সে দিন দিন মোটা হতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় সে অরণ্যের প্রাণীদের কাছে খবর পৌঁছে দিতে লাগল, সেই সব প্রাণীর কাছে যারা দুর্বলতার জন্য শিকারের নতুন জায়গায় যেতে পারছিল না। সে সবাইকে জানাল তিন দিন ধরে ক্রমাগত উড়ে সে যতদূর পারে ততদূর পর্যন্ত দেখেছে চারধারেই সূর্য অরণ্যকে হত্যা করে চলেছে।

সত্যিকার ক্ষুধা কাকে বলে মৌগলি এতদিন পর্যন্ত তার কিছুই জানত না। এবার সে তিন বছরের পুরানো পরিত্যক্ত গাছের খোঁড়ল খুঁড়ে বাসি মধু পান করল। বুনো গুল্মের মতো কালো, শুকনো চিনির মতো রসহীন ও ধূলিময়। গাছের বাকলের নিচে খুঁড়ে খুঁড়ে যা কিছু মুখে দেয়া যায় তাই সে খেল, সদ্য জন্মানো বাচ্চা বোলতাগুলোকে পর্যন্ত সে রেহাই দিল না।

অরণ্যের সব প্রাণী এখন কঙ্কালের মতো, কারো গায়ে কোনো মাংস নেই, বাঘিরা এক রাতে তিনটা শিকার মেরেও পুরো পেটের খাবার যোগাড় করতে সক্ষম হলো না। তবে সব চাইতে খারাপ ব্যাপার হলো জলের অভাব। জঙ্গলের প্রাণীরা খুব ঘন ঘন জল পান করত না, কিন্তু তারা জল পান করত গভীরভাবে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে।

এদিকে গরম বেড়েই চলল, শুষে নিল সকল আর্দ্রতা এবং শেষ পর্যন্ত ওয়েনগুঙ্গার প্রধান স্রোতধারা ছাড়া কোথাও আর জলের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। ওয়েনগুঙ্গার স্রোতধারাও তার মৃত দুই তীরের মধ্যে দিয়ে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হতে থাকল। এরপর যে হাতি একশো বছরেরও বেশি বাঁচে সেই হাতি যখন ওই ক্ষীণ জলধারার ঠিক মাঝখানে একটা দীর্ঘ সরু নীল পাথরের পশ্চাৎপিঠ দেখতে পেল তখনই সে বুঝল যে সে এবার শান্তির শিলাকে দেখতে পাচ্ছে এবং পঞ্চাশ বছর আগে তার পিতা যেমন করেছিল সেও ঠিক সেইভাবে তার শুঁড় উঁচু করে তুলে সশব্দে জলের শান্তি চুক্তি ঘোষণা করল। হরিণ, বুনো শুয়োর আর মোষ ভাঙ্গা গলায় হাতির ঘোষণা তাদের মুখে তুলে নিল। আর চিল বহু দূর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে শিস দিতে দিতে সবার কাছে চিৎকার করে পৌঁছে দিল ওই সাবধান বাণী। অরণ্যের আইন অনুযায়ী জলের শান্তি চুক্তি একবার ঘোষিত হবার পর জলপানের জায়গায় শিকার করার অর্থ হলো সেই শিকারির অবধারিত মৃত্যু। কারণটা সোজা। আহারের চাইতেও বেশি প্রয়োজন জলপানের। শিকারের যখন ঘাটতি পড়ে তখন অরণ্যের সব প্রাণীই কোনো না কোনো উপায়ে জীবন ধারণের একটা উপায় বার করে নেয়। কিন্তু জল হলো জল, এবং যখন শুধু একটা জায়গাই হয়ে ওঠে সেই জলের উৎস তখন অরণ্যের যে কোনো প্রাণী সেখানে জল পান করতে গেলে সেখানে সব শিকারই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। জলের সরবরাহ যখন প্রচুর থাকে তখন ওয়েনগুঙ্গা কিংবা কোনো জলাশয়ে কোনো প্রাণী জল পান করতে গেলে তাকে যেতে হতো নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, আর অরণ্যের রাতের কর্মকাণ্ডের একটা বড়

সম্মোহনী আনন্দ বিরাজ করে এই ঝুঁকি নেয়ার মধ্যে। এমনভাবে জলের ধারে নেমে আসতে হবে যেন গাছের একটি পাতাও না নড়ে; সগর্জনে বয়ে যাওয়া জলস্রোতের হাঁটু ডুবানো গভীরে এমনভাবে এসে দাঁড়াতে হবে যেন পেছনে একটুও শব্দ না ওঠে; কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে জলপান করতে হবে, শরীরের সমস্ত পেশিকে এমনভাবে তৈরি রাখতে হবে যেন আতঙ্কের রেশমাত্র উপলব্ধি করলেই ছুটে পালানো যায়। তারপর তৃষ্ণা মিটিয়ে পাশের বালুতে গড়াগড়ি দিয়ে তৃপ্ত চিত্তে নিজের দলের কাছে ফিরে আসতে হবে। দীর্ঘ শিংওয়ালা তরুণ হরিণেরা এটা করতে পারলে দারুণ খুশি হতো। দলের অন্য সবাই তখন তাদের দিকে প্রশংসার চোখে তাকাতো, কারণ তারা জানত যে বাঘিরা কিংবা শের খান সুযোগ পেলেই তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের টেনে নিয়ে যাবে নিজেদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য। কিন্তু এর মধ্যে যে জীবন-মরণের আনন্দ লুকানো ছিল এখন তা নিঃশেষিত হয়েছে। এখন অরণ্যের ক্লান্ত উপোসী সব প্রাণী ওই একটি মাত্র শীর্ণ জলাশয়ে এসে জড়ো হচ্ছে— বাঘ, ভালুক, হরিণ, মহিষ, শুয়োর— সবাই পান করছে ওই একই নোংরা জল, তারপর ওখানেই এলিয়ে পড়ছে, সরে চলে যাবার শক্তিও আর তাদের নেই।

শুকনো গাছের বাকল আর জীর্ণ কোঁকড়ানো পাতার চাইতে ভালো কিছু আহার্যের খোঁজে হরিণ আর শুয়োরের পাল চারিদিকে অনেক খোঁজ করেছে কিন্তু কোথাও কিছু পায় নি। মহিষের দল গা ডুবিয়ে শরীর একটু ঠাণ্ডা করার জন্য একটু জলাশয় খুঁজেছে, কোথাও থেকে একটু সবুজ শস্যকণা চুরি করার জন্য অনেক ঘুরেছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যও সফল হয় নি। সর্পকুল অরণ্যের আস্তানা ছেড়ে নদীর ধারে চলে এসেছে যদি সেখানে দু'একটা দলছুট ব্যাঙ ধরতে পারে। সাপগুলি ভেজা গোলগোল পাথরের চারপাশে জড়িয়ে রেখেছে নিজেদের। কোনো শুয়োরের নাকের ধাক্কায় একটা পাথর ছিটকে তাদের গায়ে পড়লেও সেই শুয়োরের উদ্দেশ্যে তারা কখনো তাদের ফণা উঁচু করে তোলে নি। ধূর্ততম যে শিকারি সেই বাঘিরা অনেক আগেই নদীর কচ্ছপগুলি সাবাড় করেছে, আর মাছের দল আগেভাগেই শক্ত কাদায় অনেক নিচে নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছে। শুধু অগভীর জলের একেবারে তলায় একটা লম্বা সাপের মতো "শান্তি শিলা" শুয়ে আছে আর তার গায়ের উত্তপ্ত পাশে ক্লান্ত ছোট ছোট ঢেউগুলি ধাক্কা খেয়ে শুকিয়ে যাবার সময় সেখান থেকে একটা হিসহিস শব্দ উঠছে।

রোজ রাতে মৌগলি এখানেই আসত একটু ঠাণ্ডা আর কিছু সঙ্গী সাথীর সান্নিধ্যের লোভে। তার চরমতম শত্রুরও এই বালকটির প্রতি কোনো লোভ ছিল না। তার নগ্ন ত্বকের জন্য তাকে তার সঙ্গীদের চাইতেও অনেক শীর্ণ ও হতভাগার মতো দেখাতো। রোদে জ্বলে তার চুলের রঙ হয়েছিল সাদাটে দড়ির মতো। তার বুকের পাঁজর যেন একটা ঝুড়ির পাঁজরের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। সে তার কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে চার হাতে-পায়ে চলাফেরা করত, সেগুলি ফুলে চাকাচাকা হয়ে ঘাসের গুচ্ছের গুড়ির মতো দেখাচ্ছিল। কিন্তু জটপাকানো কপালের উপর ঝুলে পড়া তার চোখ দুটি ছিল শীতল এবং প্রশান্ত, কারণ এই দুঃসময়ে বাঘিরা ছিল তার উপদেষ্টা এবং বাঘিরা তাকে বলেছে ধীর শান্তভাবে চলতে, শিকার করতে আস্তে আস্তে এবং কখনোই, কখনোই, নিজের মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ না হারাতে।

একদিন আগুনের চুল্লির মতো উষ্ণ সন্ধ্যায় কালো চিতা মৌগলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারি তাহলে এটা চলে যাবে। তো, মানব শিশু, তোমার পেট ভর্তি আছে তো ?

পেটে বস্তু ঠিকই আছে কিন্তু তৃপ্তি নেই একটুও। আচ্ছা, বৃষ্টি কি আমাদের ভুলে গেছে, আর কি কখনো বৃষ্টি এখানে আসবে না ? তোমার কী মনে হয়, বাঘিরা ?

আমার কক্ষণো ওরকম মনে হয় না। আমরা আবার মহুয়া ফুটতে দেখব, মৃগশাবকগুলি আবার তাজা ঘাস খেয়ে মোটাতাজা হয়ে উঠবে। চল, এখন শান্তি শিলায় গিয়ে খবর শোনা যাক। এসো, ছোট্ট ভাইটি, আমার পিঠে চড়ে বসো।

না, না, এটা ভার বহনের সময় নয়। আমি এখনো একা একাই দাঁড়াতে পারি। অবশ্য আমরা দুজন যে মোটাসোটা দুটো বলদ নই সেটা ঠিক।

বাঘিরা তার নিজের খসখসে বিবর্ণ পার্শ্বদেশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, গত রাতে জোয়ালে বাঁধা একটা বলদ মেরেছি আমি। জানো, আমার অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে বলদটা যদি ছাড়া থাকত তাহলে আমি হয়তো ওর উপর লাফিয়ে পড়বার সাহস পেতাম না, উঃ!

মৌগলি হেসে উঠল।

এমন সময় বাঘিরা তার রোমশ থাবা দিয়ে এক টানে মৌগলিকে পেছন দিকে জলের মধ্যে ফেলে দিল।

হ্যাঁ, এখন আমরা মস্ত শিকারি হয়েছি। আমার এত সাহস বেড়েছে যে এখন আমি পোকামাকড় ধরে ধরে খাই। ওরা দুজন ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে নদীতীরে এসে পৌঁছুল। সেখান থেকে অতি শীর্ণ জলের ধারা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

এই সময় বালু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, এই জল আর বেশিদিন থাকবে না। ওদিকে তাকিয়ে দেখ। মানুষের তৈরি রাস্তার মতো পদরেখা দেখা যাচ্ছে।

দূরবর্তী ওই তীরের সমতল ভূমিতে শক্ত জংলি ঘাস সোজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে গেছে এবং মৃত্যুর পর মমির মতো অনড় কঠিন হয়ে রয়েছে। হরিণ, শুয়োর আর নানা প্রাণী একই পথ ধরে নদীর দিকে এগিয়ে গেছে, আর তাদের পায়ের চাপে দশ ফুট উঁচু ঘাসের মধ্যেও বিবর্ণ সমতল ভূমিতে জলপ্রণালীর মতো ধূলিধূসরিত রেখা ফুটে উঠেছে। এরই মধ্যে অনেক প্রাণী আগে পৌঁছুবার জন্য জলের দিকে ছুটে চলেছে। হরিণ আর তাদের ছোট ছোট বাচ্চারা নস্যির মতো মিহি ধুলায় খক্‌খক্‌ করে কাশতে শুরু করেছে।

নদীর আরো উপরে মাথার দিকে শান্তি শিলার মন্থর জলরাশির বাঁকে দাঁড়িয়েছিল জল চুক্তির প্রহরী হাতি, তার সঙ্গে রয়েছে তার পুত্ররা। চাঁদের আলোয় তাদের দেখাচ্ছে কৃশ এবং ধূসর, তারা দুলছে এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে। হাতির একটু নিচে দাঁড়িয়ে আছে হরিণদের অগ্রগামী দল। আর তাদের নিচে রয়েছে শুয়োর আর বুনো মহিষগুলি, আর অপর তীরে, যেখানে লম্বা লম্বা গাছগুলি জলের একেবারে কিনারা পর্যন্ত নেমে এসেছে, সেই বিশেষ সংরক্ষিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মাংসাশী প্রাণিকুল, বাঘ, নেকড়ে, চিতা, ভালুক আর অন্যান্যরা।

বাঘিরা নদীর জলে বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে ওপারে যেখানে হরিণের শিং, চকিত চোখ, আর শুয়োরের দলকে দেখা যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে বলল, আমরা সত্যিই এখন এক আইনের অধীনে। তোমরা সবাই, যাদের ধমনীতে আমার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি, শুভ শিকার। সে নিজের দীর্ঘ দেহটি জলের মধ্যে শুইয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত টিপে বলল, ওই আইনের বাধা না থাকলে এখন কী চমৎকার শিকারই না করা যেত!

হরিণের তীক্ষ্ণ কান শেষ বাক্যটি ঠিকই শুনতে পেল। তাদের মধ্যে ভীতসন্ত্রস্ত ফিসফিসানি শোনা গেল, চুক্তি! চুক্তির কথা ভুলে যেও না!

হাতি গমগমে গলায় বলে উঠল, শান্তি, শান্তি। বাঘিরা, শান্তিচুক্তি এখনো বলবৎ আছে। এখন এটা শিকারের কথা বলার সময় নয়।

তার হলুদ চোখ দুটি গোল গোল করে বাঘিরা বলল, আমার চাইতে এ সত্য আর কে বেশি ভালো জানে ? আমি এখন পরিণত হয়েছি কচ্ছপ আর

ব্যাঙ-এর খাদকে। ছি! ছি! গাছের শাখা চিবিয়েও যদি আমি কিছু সুখাদ্য পেতাম!

একটি বাচ্চা মৃগশিশু ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল, আমরাও তাই চাই, মনে প্রাণে তাই চাই। খুবই ছোট, মাত্র গত বসন্তে জন্মগ্রহণ করেছে এই মৃগশাবক। বর্তমান অবস্থা তার একটুও ভালো লাগছিল না। অরণ্যের প্রাণীদের অবস্থা এই সময়ে খুব করুণ হলেও ওর কথায় হাতি পর্যন্ত ঈষৎ হাস্যধ্বনি না করে পারল না, আর উষ্ণ জলে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকা মৌগলি হেসে উঠল উচ্চ কণ্ঠে আর তার দু'পা দিয়ে কাদার মধ্যে হুটোপুটি করল কিছুক্ষণ। বাঘিরা গরগর করে বলল ভালো বলেছ, বাচ্চা হরিণ। শান্তি চুক্তি শেষ হলে তোমার এই উক্তি তোমার স্বপক্ষে যাবে। আমি মনে রাখব তোমার কথা।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাঘিরা মৃগশিশুটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল যেন ভবিষ্যতে সে তাকে চিনতে পারে।

ক্রমে ক্রমে তাদের কথাবার্তা জলপানের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। হুটোপুটি আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করা শুয়োরগুলি নিজেদের জন্য আরো জায়গা দাবি করল, মহিষগুলিও বালুকাময় চড়ার উপর দিয়ে যেতে যেতে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে লাগল; আর হরিণের দল বলতে লাগল খাদ্যের সন্ধানে দূরদূরান্তে ঘুরতে ঘুরতে তাদের পায়ে ঘা হয়ে যাওয়ার করুণ কাহিনী।

মাঝে মাঝে এই সব প্রাণী নদীর অপর তীরের মাংসাশী প্রাণীদের কাছে কিছু প্রশ্ন করল কিন্তু উত্তরে যা শুনল তার সবই দুঃসংবাদ। সগর্জনে ছুটে এল অরণ্যের উত্তপ্ত হাওয়া, প্রবাহিত হলো তা পাথর আর মড়মড় ধ্বনি করা গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে, আর মাটিতে এবং জলের উপর ছড়িয়ে পড়ল ছিন্ন ডালপালা আর ধুলোর জঞ্জাল।

এক যুবক শম্বর হরিণ বলল, চাষীদের লাঙলের পাশে মানুষও মরছে। আমি গত রাতে ওই রকম তিন জনকে দেখেছি। তারা নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। তাদের পাশে তাদের বদলপুলিও ওইরকম নিশ্চল হয়ে শুয়েছিল। আমরাও অল্পকালের মধ্যে ওই রকম নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকব।

বালু বলল গত রাতের পর থেকে নদীর জল আরো নেমে গেছে। ও হাতি, এই রকম খরা কি তুমি তোমার জীবনে কখনো দেখেছ?

হাতি শুঁড় দিয়ে তার পিঠে এবং পার্শ্বদেশে জল ছিটাতে ছিটাতে বলল, এটা কেটে যাবে, কেটে যাবে।

বালু বলল, আমাদের মধ্যে এখানে বনে একজন আছে যে আর বেশিকাল টিকে থাকতে পারবে না। সে তার অতিপ্রিয় মানবশিশুটির দিকে তাকাল।

মৌগলি জলের মধ্যে উঠে বসে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আমার কথা বলছ ? আমার হাড় ঢেকে রাখার জন্য তোমার মতো মোটা বড় বড় লোম আমার নেই, কিন্তু বালু, তোমার গায়ের চামড়া যদি খুলে নেয়া যেত—

কথাটা চিন্তা করেই হাতির সারা অঙ্গ দুলে উঠল, আর বালু কঠোর কণ্ঠে বলল, মানবশিশু, অরণ্যের এক আইন-শিক্ষককে এরকম কথা বলা অত্যন্ত অসমীচীন ও অশোভন। আমার চামড়া ছাড়া আমাকে কখনোই দেখা যায় নি, কখনোই না।

না, না, বালু, আমি কথাটা খারাপভাবে বলি নি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে তুমি হলে অনেকটা খোসার ভেতরের নারকেলের মতো, আমিও সেই নারকেলই, শুধু উলঙ্গ, এই যা। এখন তোমার ওই বাদামি খোসাটা যদি ছাড়িয়ে নেয়া যায়— মৌগলি পায়ের উপর পা তুলে তার চিরাচরিত অভ্যাস মতো তর্জনী উঁচু করে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিল, এমন সময় বাঘিরা তার রোমশ থাবা দিয়ে এক টানে মৌগলিকে পেছন দিকে জলের মধ্যে ফেলে দিল। মৌগলি মুখ দিয়ে থু-থু করে জল ছিটাতে ছিটাতে উঠে দাঁড়াল। কালো চিতা বলল, ক্রমান্বয়ে খারাপ থেকে আরো বেশি খারাপের দিকে যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্রথমে বালুর চামড়া খসাতে হবে, তারপর এখন সে হবে একটা নারকেল। সাবধান, মৌগলি, পাকা ঝুনো নারকেল যে কাজটি করে সেও যেন ওই কাজটি না করে।

মুহূর্তের জন্য অসতর্ক থাকায় মৌগলি প্রশ্ন করল, সেটা আবার কী ? যদিও সেটা ছিল অরণ্যের একটি অতি পরিচিত পুরানো ধাঁধা।

বাঘিরা আবার মৌগলিকে তার নিচে চেপে ধরে ধীর কণ্ঠে বলল, তোমার মাথা ফাটিয়ে দেয়া।

মৌগলিকে তৃতীয়বারের মতো জলে ডুবিয়ে ধরার পর বালু বলল, তোমার শিক্ষকের সঙ্গে কৌতুক করা ঠিক নয়, বুঝলে ?

ঠিক নয় ? ওর কাছ থেকে আর কী আশা করা যেতে পারে ? যারা এক সময় দক্ষ শিকারি ছিল এই ন্যাংটো জিনিসটা এখন তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা

করে, কৌতুকবশে তাদের গোঁফ টেনে ধরে। এই কথাগুলি বলল ল্যাংড়া বাঘ শের খান। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে জলের কিনারায় নেমে এলো। তাকে দেখে অপর তীরের হরিণগুলির মধ্যে যে চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল সে দৃশ্য সে কিছুক্ষণ উপভোগ করল, তারপর সে তার মাথা জলে ডুবিয়ে খানিকটা জল খেয়ে গরগর করতে করতে বলল, অরণ্য এখন উলঙ্গ শিশুদের ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই মানবশিশু, আমার দিকে তাকাও!

মৌগলি সোজা তার দিকে তাকাল, যতখানি উদ্ধতভাবে সম্ভব ততখানি উদ্ধতভাবে এবং এক মিনিটের মধ্যে শের খান অস্বস্তিভরে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল। সে গলায় একটা শব্দ তুলে আবার জল খেতে খেতে বলল, মানবশিশু এটা, মানবশিশু ওটা, যত্তোসব আজেবাজে কথা। এই শিশু মানুষের বাচ্চা নয়, নেকড়েশাবকও নয়, হলে পরে ঠিকই ভয় পেত। সামনের ঋতুতে আমাকে হয়তো ওর অনুমতি নিয়ে জলপান করতে হবে! ওহ!!

বাঘিরা সরাসরি ওর চোখের উপর চোখ রেখে বলল, তেমনটা হতেই পারে, শের খান। তারপর, এখানে তোমার নতুন কী লজ্জাকর কীর্তির খবর নিয়ে এসেছ?

শের খান নিরুত্তাপ গলায় বলল, মানুষ! ঘণ্টাখানেক আগে আমি একটা মানুষ মেরেছি। আপন মনে গরগর করতে করতে সে সন্তোষের আওয়াজ তুলল।

সারি সারি পশু দুলে উঠল, তারপর প্রথমে মৃদু গুঞ্জন ও পরে উচ্চ চিৎকার ধ্বনিত হলো, মানুষ! মানুষ! ও মানুষ মেরেছে! এরপর ওরা সবাই হাতির দিকে তাকাল কিন্তু মনে হলো হাতি যেন কিছুই শোনে নি। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হবার আগে হাতি কখনো কিছু করত না, এবং তার দীর্ঘ জীবন লাভের পেছনে এটাও ছিল একটা প্রধান কারণ।

বাঘিরা কলুষিত জলের মধ্য থেকে নিজেকে টেনে তুলে আনল, বেড়ালের মতো নিজের থাবা থেকে জল ঝরাল, তারপর ঘৃণাভরে বলল, এই সময়ে তুমি মানুষ মারলে! আর কোনো শিকার কি তুমি খুঁজে পেলে না?

আমি ইচ্ছা করে মেরেছি, খাদ্যের জন্য নয়। আবার আতঙ্কিত গুনগুনধ্বনি উঠল। এবার হাতি তার সতর্ক সাদা চোখ তুলে ধরল শের খানের পানে। শের খান ঘেঙ্গিয়ে ঘেঙ্গিয়ে বলল, হ্যাঁ, ইচ্ছা করে, আর আমি এখন এখানে এসেছি জল খেতে আর নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে। বারণ করার মতো কেউ কি আছে এখানে?

বাঘিরার পৃষ্ঠদেশ ঝড়ো হাওয়ায় বাঁশ যেন বেঁকে যায় তেমনি বাঁকা হয়ে উঠল কিন্তু তখনই হাতি তার শুঁড় উঁচু করে শান্ত কণ্ঠে বলল, তা হলে তুমি ইচ্ছা করে মানুষ মেরেছ ? হাতি যখন কোনো প্রশ্ন করে তখন তার উত্তর দেয়াটাই ভালো। এবার শের খান প্রায় বিনীত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, তাই। এ অধিকার আমার আছে আর এই রাতও ছিল আমার। তুমি তো জানো সেকথা, ও হাতি!

হ্যাঁ, আমি জানি হাতি জবাব দিল। তারপর একটুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, তোমার জল খাওয়া শেষ হয়েছে ?

হ্যাঁ, আজকের রাতের মতো।

তাহলে যাও এখন। নদী হচ্ছে জল খাওয়ার জন্য, সে জলকে কলুষিত করার জন্য নয়। যখন আমরা সবাই অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছি, মানুষ এবং অরণ্যের প্রাণিকুল সবাই, তখন এই ল্যাংড়া বাঘ ছাড়া আর কেউ তার অধিকারের কথা এই সময় এরকম সগর্বে উচ্চারণ করত না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিংবা নোংরা, যাই হয়ে থাক, এক্ষুণি তোমার ডেরায় চলে যাও, শের খান!

হাতির শেষ কথাগুলি রূপালি ভেরীর মতো বেজে উঠল। তার তিনপুত্র আধ-পা সামনের দিকে এগিয়ে এল, যদিও তার প্রয়োজন ছিল না। শের খান নিঃশব্দে সরে গেল, একটু গরগর করতেও সাহস পেল না, কারণ আর সবার মতো তারও ভালো করেই জানা ছিল যে সব কিছুর উপর হাতিই হলো অরণ্যের কর্তা। মৌগলি বাঘিরার কানে কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, শের খান কী অধিকারের কথা বলল ? মানুষ মারা সর্বদাই লজ্জাকর কাজ। অরণ্যের আইন তাই বলে। তবু হাতি কেন বলল—

ওকেই জিজ্ঞাসা কর, আমি জানি না। তবে, ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, হাতি চুপ করে থাকলে আমি আজ ওই ল্যাংড়া কসাইটাকে উচিৎ শিক্ষা দিতাম। সদ্য একটা মানুষ মেরে এই 'শান্তি শিলা'য় আসা এবং তা নিয়ে গর্ব করা, এটা হলো শিয়ালের ধূর্তামি। তাছাড়া ও ভালো জলকে কলুষিত করে দিল।

হাতিকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না। তাই মৌগলি নিজের সাহস সঞ্চয় করার জন্য এক মিনিট সময় নিল, তারপর সে উচ্চকণ্ঠে হাতিকে প্রশ্ন করল, ও হাতি, শের খান কী অধিকারের কথা বলল ? কী সেই অধিকার ? নদীর উভয় তীরের প্রাণীরা মৌগলির প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করল। তারা ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, কারণ তারা এই মাত্র একটা জিনিস দেখেছে

যা ইতিপূর্বে তারা দেখে নি, বোঝে নি, একমাত্র বালু ছাড়া। আর বালুকে এই মুহূর্তে দেখাচ্ছিল গভীর চিন্তামগ্ন।

হাতি বলল, এটা অনেক কাল আগের এক পুরানো কাহিনী। অরণ্যের চাইতেও প্রাচীন। তোমরা, নদীর উভয় তীরের প্রাণীরা, তোমরা সবাই চুপ করে থাকো, আমি তোমাদের কাহিনীটা শোনাচ্ছি।

দু'এক মিনিট শুয়োর আর মহিষদের দলে একটু ঠেলাঠেলি হলো, তারপর সব দলের প্রধানরা একের পর এক বলল, আমরা অপেক্ষা করছি। তখন হাতি সামনের দিকে একটু এগিয়ে এল, শান্তি শিলা'র পাশের জলরাশিতে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। শীর্ণদেহ, চামড়া কুঁকড়ে গেছে, দাঁতের রঙ হলুদ, তবু এখনো স্পষ্ট বোঝা যায় সমস্ত অরণ্য তাকে যে পরিচয়ে জানে এখনো তার সেই পরিচয় অক্ষুণ্ন আছে, সেই তাদের কর্তা।

হাতি তার কাহিনী শুরু করল, বাচ্চারা, তোমরা জানো যে সব কিছুর মধ্যে তোমরা সব চাইতে বেশি ভয় করো মানুষকে।

সবাই সমস্বরে সম্মতি জানাল। বাঘিরা মৌগলিকে বলল, ছোট্ট ভাইটি, এ গল্পের সঙ্গে তোমারও সম্পর্ক আছে।

আমার ? আমি তো দলের একজন মুক্ত স্বাধীন প্রাণিকুলের এক শিকারি। মানুষের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?

হাতি বলে চলল, কিন্তু মানুষকে তোমরা কেন ভয় কর তা তোমরা জানো না। কারণটা হলো এই অরণ্যের একেবারে শুরুতে, কখন শুরু সেকথা কেউ জানে না, সেই প্রারম্ভিককালে আমরা সবাই এক সঙ্গে অরণ্যে চলাফেরা করতাম, কেউ কাউকে ভয় করতাম না। ওই সময় কোনো খরা ছিল না, একই গাছে ফুল, ফল, লতাপাতা ধরত। আর আমরা ফুল, ফল, লতাপাতা আর গাছের বাকল ছাড়া অন্য কিছু খেতাম না।

বাঘিরা বলল, ওই সময়ে আমার জন্ম না হয়ে খুব ভালো হয়েছে। গাছের বাকল শুধু ঘষে ঘষে নখ ধারাল করার কাজে লাগে।

হাতি বলে চলল, আর অরণ্যের প্রভু ছিলেন থা, হাতিদের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান। তিনি তাঁর শুঁড় দিয়ে গভীর জলরাশির ভেতর থেকে অরণ্যকে টেনে তুলে আনলেন, তারপর দাঁত দিয়ে মাটিতে রেখা কাটলেন, আর সেই রেখা দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে লাগল। যেখানেই তিনি সজোরে পায়ের চাপ দিলেন সেখানেই সুপেয় জলের পুকুর জেগে উঠল, আর যখন তাঁর শুঁড় এইভাবে উঁচু

করে সজোরে নিঃশ্বাস ছাড়তেন তখুনি গাছাপালা মড়মড় করে নিচে ভেঙে পড়ত। এইভাবেই থা অরণ্য নির্মাণ করেছিলেন। আমি এই গল্পই শুনেছি।

বাঘিরা নিচু গলায় মৌগলিকে বলল, পুনঃবর্ণনায় গল্পের কোনো কমতি পড়ে নি, আর মৌগলি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল। সে যুগে কোনো শস্য কিংবা তরমুজ কিংবা মরিচ কিংবা ইক্ষু ছিল না। এখন তোমরা সকলেই যেমন ছোট ছোট কুটির দেখেছ সেরকম কোনো কুটিরও তখন ছিল না। জঙ্গলের প্রাণীরা মানুষ সম্পর্কে তখন কিছুই জানত না। তারা নিজেরা জঙ্গলে এক সঙ্গে থাকত, সবাই ছিল এক প্রাণীগোষ্ঠীর মতো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে চারণক্ষেত্র নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হলো। চরে বেড়িয়ে ঘাস লতাপাতা-ফুলফল খাওয়ার মতো সকলের জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া গেল না। তারপর তাদের মধ্যে আলসেমি দেখা দিল। যে যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই খেতে চাইল। এখনো বসন্তকালীন প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময় আমরা মাঝে মাঝে যেমন করি। থা, হাতিকুলের প্রথম ও সর্বপ্রধান, তখন নতুন অরণ্য বানাতে, আর নদীকে নতুন নতুন খাতে প্রবাহিত করতে ব্যস্ত। তাঁর পক্ষে সব জায়গায় উপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ব্যাঘ্রকুলের প্রধানকে অরণ্যের প্রভু ও বিচারক নিয়োগ করলেন। অরণ্যের প্রাণীদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটলে তারা বাঘের কাছে আসবে নিষ্পত্তির জন্য। সে সময় ব্যাঘ্রপ্রধানও আর সবার সঙ্গে ফলমুল ও লতাপাতা খেত। সে ছিল প্রায় আমার মতোই বিশাল, অতিশয় সুশ্রী দেখতে, তার গায়ের রঙ ছিল প্রস্ফুটিত লতানো হলুদ ফুলের মতো। অরণ্যের সেই নবীন দিনগুলিতে তার গায়ের ত্বকে কোনো দাগ বা রেখা ছিল না। অরণ্যের সব প্রাণীই নির্ভয়ে তার সামনে আসত, আর তার বাক্যই ছিল অরণ্যের আইন। মনে রেখ, আমরা তখন সবাই ছিলাম একই প্রাণীগোষ্ঠী।

এক রাতে দুটি হরিণের মধ্যে চারণক্ষেত্র নিয়ে ঝগড়া বাধল। এখন তোমরা শিং আর সামনের দু'পা দিয়ে যার সমাধান কর সেই রকম একটা ঝগড়া। আমি শুনেছি দুটি হরিণই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। বাঘ তখন পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে শুয়েছিল। একটা হরিণ তার শিং দিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়, আর ব্যাঘ্রপ্রধান তখন ভুলে গেল যে সে হলো অরণ্যের প্রভু ও বিচারক। সেকথা ভুলে গিয়ে সে হরিণটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় মটকে দিল।

ওই রাতের আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কেউ কখনো মারা যায় নি। ব্যাঘ্রপ্রধান নিজের কাণ্ড দেখে আর রক্তের গন্ধ পেয়ে বোকা বনে গেল। সে

ধূসর বানরটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, এখন আমিই হবো অরণ্যের প্রভু

দ্রুত উত্তরের জলাভূমির দিকে পালিয়ে গেল আর আমরা, বিচারকহীন অরণ্যের প্রাণীরা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে মেতে উঠলাম। অবশেষে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে থা ফিরে এলেন। তখন আমাদের মধ্যে ঘটনাটা সম্পর্কে এক একজন এক এক রকম বর্ণনা দিল কিন্তু থা পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে মৃত হরিণকে দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন কে তাকে হত্যা করেছে, কিন্তু আমরা অরণ্যের প্রাণীরা চুপ করে রইলাম কারণ রক্তের গন্ধ আমাদেরও বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা শুধু ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করলাম, লাফঝাঁপ দিলাম, চেঁচালাম, আমাদের মাথা নাড়ালাম দুদিকে। তখন থা অরণ্যের নিচের দিকে ঝুলেপড়া গাছগাছালি ও লতাগুলিকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন এই

হরিণের হত্যাকারীর গায়ে রেখা এঁকে তাকে চিহ্নিত করে দেয় যেন তাকে আরেকবার দেখলেই থা চিনতে পারেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এখন অরণ্যের প্রাণীদের প্রভু কে হবে ? তখন গাছের শাখা-প্রশাখায় বাস করা ধূসর বানরটি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, এখন আমিই হবো অরণ্যের প্রভু।

তার কথা শুনে থা হেসে উঠলেন, বললেন, তবে তাই হোক, বলেই তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বাছারা, তোমরা সবাই ধূসর বানরকে চেনো। সে তখন যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। প্রথমে সে নিজের মুখটাকে খুব জ্ঞানী-জ্ঞানী করল, একটু পরে তার সারা গা চুলকাতে লাগল, তারপর সারাক্ষণ শুধু উপরে নিচে লাফালাফি করতে থাকল। থা যখন ফিরে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে ধূসর বানর একটা গাছের ডাল ধরে উপর থেকে নিচের দিকে মাথা দিয়ে ঝুলছে। নিচে যারা দাঁড়িয়ে আছে সে তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। ওরাও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে ঝুলন্ত ধূসর বানরকে। তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে অরণ্যে এখন আর কোনো আইন নেই, আছে শুধু নির্বোধ গালগল্প আর অর্থহীন কথাবার্তা।

তখন থা আবার আমাদের সবাইকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের প্রথম প্রভু অরণ্যে মৃত্যু নিয়ে আসে, আর দ্বিতীয় প্রভু নিয়ে আসে লজ্জা। এখন সময় হয়েছে অরণ্যের একটা আইন থাকার এবং সে আইন তোমরা কেউ কখনো ভাঙবে না। এবার তোমরা জানবে ভয়কে এবং যখন তাকে খুঁজে পাবে তখন তোমরা জানবে যে সে-ই তোমাদের প্রভু, আর তারপর বাকি সব যেমন ঘটবার তেমনিভাবে ঘটতে থাকবে।

তখন আমরা অরণ্যের প্রাণীরা জানতে চাইলাম, ভয় কী ? আর থা উত্তরে বললেন, খোঁজো, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেখা না পাও। আমরা তখন ভয়ের খোঁজে সারা অরণ্য চষে ফেললাম।

বালির চড়ার দিকে দাঁড়ানো মহিষের দলের প্রধান মিসা এই সময় বলে উঠল, হ্যাঁ, আমরা মহিষেরাই তাকে খুঁজে পাই। মহিষেরা একদিন খবর নিয়ে এলো যে অরণ্যের মধ্যে একটি গুহায় ভয় বসে আছে, তার গায়ে কোনো লোম নেই, সে চলাফেরা করে পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে। আমরা মহিষেরা তখন দল বেঁধে ওই গুহার কাছে গেলাম। আমরা ভয়কে দেখলাম গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা যেমন বলেছিল ঠিক সেই রকম, রোম-লোমবিহীন, পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সে হাঁটে। আমাদের দেখে সে একটা চিৎকার করে উঠল এবং

তার কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমাদের অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। এখনো সেই কণ্ঠস্বর শুনলে আমরা ভয়ে কাঁপতে থাকি, তারপর আমরা সবাই সেখান থেকে একে অন্যকে মাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। আমি শুনেছি যে সেই রাতে আমরা অরণ্যের প্রাণীরা আর আগের মতো সবাই এক সঙ্গে আমাদের চিরাচরিত প্রথামতো শয্যা গ্রহণ করি নি, বিভিন্ন দল আলাদা হয়ে নিজেরা এক সঙ্গে শুয়েছি, শুয়োর শুয়োরদের সঙ্গে, হরিণ হরিণদের সঙ্গে, শিং-এর গায়ে শিং আর ক্ষুরের গায়ে ক্ষুর লাগিয়ে, আর অরণ্যের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সবাই ভয়ে কেঁপেছে।

শুধু ব্যাঘ্রপ্রধান আমাদের সঙ্গে ছিল না। সে তখনই লুকিয়েছিল উত্তরের জলাভূমিতে। আমরা গুহার ভেতর কী দেখেছি সে খবর যখন তার কাছে পৌঁছুল তখন সে বলল, আমি যাব তার কাছে, গিয়ে তার ঘাড় মটকে দেব। তারপর সারারাত ধরে দৌড়ে সে ওই গুহার দিকে ছুটল। আর থার নির্দেশের কথা মনে হতেই ব্যাঘ্রপ্রধানের পথে পড়া সব গাছ আর লতা নিচু হয়ে ঝুঁকে তার পিঠে, পার্শ্বদেশে, কপালে, চিবুকে সব কিছুর উপরে তাদের আঙুল বুলিয়ে রেখা টেনে দিল। যেখানেই তাদের ছোঁয়া লাগল সেখানেই বাঘের হলুদ চামড়ার উপর রেখার পর রেখা আঁকা হয়ে গেল। আর আজও তার সন্তানসন্ততিরা তাদের শরীরে ওই রেখা বয়ে বেড়ায়। সে যখন গুহার মুখে এসে পৌঁছুল তখন রোম-লোমহীন বস্তুটি তার হাত বার করে তাকে ডাকল, এই যে রেখাওয়ালা প্রাণী, রাতের অন্ধকারে যে আসে! আর ব্যাঘ্রপ্রধান রোম-লোমহীন ওই জিনিসটার কণ্ঠস্বর শুনে এমন ভয় পেল যে সে হাউমাউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে এক ছুটে তার জলাভূমি অঞ্চলে ফিরে গেল। চিবুক পর্যন্ত জলে ডোবানো মৌগলি এইখানে খুক্‌খুক্ করে একটু হেসে উঠল।

তার চেঁচানি এত জোরে হয়েছিল যে থা-ও তা শুনতে পায়। থা জিজ্ঞাসা করল, তা তোমার কষ্টটা কী? তখন ব্যাঘ্রপ্রধান সদ্য তৈরি আকাশের দিকে তাকিয়ে, যে আকাশ এখন এত পুরানো, সেই দিকে তার মুখ উঁচু করে ধরে বলল, ও থা, আমাকে আমার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিন। সমস্ত অরণ্যের সামনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে। আমি রোম-লোমহীন ওই জিনিসটার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, আর ও আমাকে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করেছে। কিন্তু কেন? থা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাঘ্রপ্রধান বলল, কারণ জলাভূমিতে থাকার ফলে আমার সমস্ত শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। থা বললেন, তাহলে

জলে সাঁতার কাটো, ভেজা ঘাসে গড়াগড়ি দাও, কাদা হলে তা ধুয়ে মুছে যাবে। ব্যাঘ্রপ্রধান তখন সাঁতার কাটল, ঘাসের বুকে অনেক অনেকবার গড়াগড়ি দিল, তার মনে হলো সমস্ত অরণ্য যেন তার চোখের সামনে ঘুরছে, কিন্তু তার চামড়ার একটি রেখাও, একটি দাগও একটুও মুছল না, আর থা তার অবস্থা দেখে হেসে উঠলেন। তখন ব্যাঘ্রপ্রধান প্রশ্ন করল, কেন আমার এই অবস্থা হলো ? কী করেছি আমি ? থা বললেন, তুমি হরিণ মেরেছ, তুমি অরণ্যের ভেতর মৃত্যুকে মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছ, আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ভয়, আর তাই তুমি যেমন রোম-লোমহীন বস্তুটিকে ভয় পাও এখন অরণ্যের সব প্রাণীই পরস্পরকে তেমনি ভয় পাচ্ছে। ব্যাঘ্রপ্রধান বলল, ওরা আমাকে কখনো ভয় পাবে না, আমি তো ওদের শুরু থেকেই চিনি। থা বললেন, যাও, গিয়ে দ্যাখো। ব্যাঘ্রপ্রধান তখন চারিদিকে ছুটাছুটি করে উচ্চ কণ্ঠে হরিণকে, শুয়োরকে, শম্বরকে, সজারুকে, অরণ্যের সব প্রাণীকে ডাকল কিন্তু সবাই তার কাছ থেকে, যে এক সময় তাদের বিচারক ছিল, ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

তখন ব্যাঘ্রপ্রধান ফিরে এল, তার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। সে মাটিতে মাথা ঠুকল, নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে লুটোপুটি করল, তারপর বলল, মনে রাখবেন যে আমি এক সময় অরণ্যের প্রভু ছিলাম। ও থা, আমার কথা ভুলে যাবেন না। আমার সন্তান-সন্ততিরা যেন মনে রাখে যে এক সময় আমার কোনো ভয় ছিল না, কোনো লজ্জা ছিল না। থা বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্য এটুকু আমি করব, কারণ এক সময়, তুমি আর আমি, এক সঙ্গে অরণ্যকে নির্মিত হতে দেখেছি। তোমার আর তোমার সন্তান-সন্ততিদের জন্য প্রতি বছরে এক রাতের জন্য তুমি হরিণটিকে হত্যা করার আগে যেমন ছিল সব কিছু তেমনি সেই আগের মতো হবে। ওই একটি রাতে রোম-লোমহীন জিনিসটার সঙ্গে, তার নাম মানুষ, যদি তোমাদের দেখা হয় তা হলে তোমরা তাকে দেখে ভয় পাবে না, বরং সেই তোমাদের দেখে ভয় পাবে, যেন তোমরাই সমগ্র অরণ্যের বিচারক, সব কিছুর প্রভু। আর তার ওই ভয়ের রাতে তুমি তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, কারণ ভয় কী তা তুমি জেনেছ।

ব্যাঘ্রপ্রধান তখন বলল, ঠিক আছে, এতেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এর পরের বার জল পান করার সময় আবার সে যখন তার পিঠে ও পার্শ্বদেশে কালো ডোরাগুলি দেখল, রোম-লোমহীন জিনিসটা তাকে যে বিশ্রী গাল দিয়েছিল যখন সেটা তার মনে পড়ে গেল, তখন সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো। গোটা একটা বছর সে

জলাভূমিতে কাটাল, থা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন কিনা সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর এক রাতে যখন অরণ্য থেকে সন্ধ্যাতারা স্পষ্ট চোখে পড়ল তখন তার মনে হল আজই সেই রাত, আর সে রোম-লোমহীন বস্তুটার সঙ্গে দেখা করার জন্য তার গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং থা যেমন প্রতিশ্রুতি গিয়েছিলেন ঠিক তাই ঘটল। রোম-লোমহীন প্রাণীটি তার সামনে মাটিতে শুয়ে পড়ল আর ব্যাঘ্রপ্রধান তখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিঠ ভেঙে দিল। সে ভেবেছিল সমস্ত অরণ্যে বুঝি ওই রকম একটি বস্তুই আছে এবং ভয়কে সে এখন হত্যা করেছে। তারপর মৃতদেহটি যখন সে শুঁকে দেখছে তখন উত্তরাঞ্চলের বনানীর দিক থেকে থার এগিয়ে আসার শব্দ শুনল সে, আর তার একটু পরেই হাতিকুলের প্রথম ও সর্বপ্রধানের কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এলো, যে কণ্ঠস্বর এখনো আমরা শুনি।

বিশুষ্ক রেখাঙ্কিত পর্বতমালার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত বজ্রগর্জন ধ্বনিত হতে থাকল কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা বারিপাতও হলো না, শুধু পাহাড়ি খাদের ধারে ধারে দেখা গেল বিজলির তীব্র ঝলকানি— আর হাতি তার কাহিনীর সূত্র ধরে বলে চলল, ওই কণ্ঠস্বর সে শুনল, এই কি তোমার দয়া প্রদর্শন ? ব্যাঘ্রপ্রধান তার ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, তাতে কি হয়েছে ? ভয়কে আমি মেরে ফেলেছি। আর থা বললেন, হে অন্ধ ও নির্বোধ! তুমি খুলে দিয়েছ মৃত্যুর পা এবং তোমার মরণ না হওয়া পর্যন্ত তা তোমাকে অনুসরণ করবে। তুমি হত্যা করতে শেখালে মানুষকে! ব্যাঘ্রপ্রধান তার নিহত শিকারের উপর ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হরিণের যে অবস্থা হয়েছিল এটারও এখন সেই অবস্থা হয়েছে। ভয় আর নেই। এখন আমি আবার আগের মতো অরণ্যের প্রাণিকুলের বিচারক হিসাবে কাজ করব।

আর থা বললেন, অরণ্যের প্রাণিকুল আর কোনো দিন তোমার কাছে আসবে না। তারা কোনো দিন তোমার পথ মাড়াবে না, তোমার কাছেপিঠে ঘুমাবে না, কখনো তোমাকে অনুসরণ করবে না, তোমার আস্তানার আশেপাশেও ঘোরাফেরা করবে না। একমাত্র ভয় তোমার পিছু নেবে, আর তার যখন সময় ও খুশি হবে তখন সে তোমার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যুবাণ হানবে, যে-বাণ তুমি দেখতেও পাবে না। তোমার পায়ের নিচের মাটিকে সে দু'ফাঁক করে দেবে, গাছের লতা তোমার ঘাড়ে কঠিনভাবে জড়িয়ে দেবে, গাছের গুঁড়িগুলিকে এত উঁচু ও বিশাল করে তুলবে যে লাফ দিয়ে তুমি তা পার হতে পারবে না,

এবং অবশেষে সে তোমার চামড়া খুলে নিয়ে যাবে, যেন শীতের সময় সে তার শিশু সন্তানদের গায়ে ওই চামড়া জড়িয়ে দিতে পারে। তুমি তার প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন কর নি, সেও তোমার প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন করবে না।

ব্যাঘ্রপ্রধান ছিল সাহসী, কারণ তখনো প্রতিশ্রুত রাত্রিটি তার করায়ত্ত। সে বলল, থার প্রতিশ্রুতি হলো থা'র প্রতিশ্রুতি। আমার রাতটা তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না ? আর থা বললেন, আমি যেমন বলেছি তাই হবে। ওই একটি রাত তোমার, কিন্তু তার জন্য তোমাকে একটা মূল্য দিতে হবে। মানুষকে তুমি হত্যা করতে শিখিয়েছ, আর মানুষ খুব দ্রুত শিখতে পারে।

ব্যাঘ্রপ্রধান বলল, এই যে, সে এখন আমার পায়ের নিচে পড়ে আছে আর আমি তার পিঠ ভেঙে দিয়েছি। সমস্ত অরণ্য জেনে নিক, ভয়কে আমি মেরে ফেলেছি।

তখন থা হেসে উঠে বললেন, অনেকগুলির মধ্যে তুমি একটাকে মাত্র মেরেছ, কিন্তু আর নয়, অরণ্যকে তুমি নিজেই সব জানাবে, কারণ তোমার রাত ফুরিয়ে গেছে।

তখন দিনের আলো ফুটল। গুহার মধ্য থেকে এই সময় আরেকটি রোম-লোমহীন প্রাণী বেরিয়ে এলো। সে তার সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহটি দেখল, আর দেখল যে তার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাঘ্রপ্রধান। সে তখন একটা তীক্ষ্ণ সরু লাঠি হাতে তুলে নিল।

এই পর্যায়ে ইক্কি নদীতীরের ঢালু বেয়ে খরখর করে নামতে নামতে বলল, ওরা এমন একটা জিনিস ছুঁড়ে মারে যা শরীরকে কেটে ফেলে।

হাতি বলল, ওটা একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচালো লাঠি, গর্তের ফাঁদে যে রকম জিনিস পেতে রাখা হয় ওই রকম একটা জিনিস। ওই বর্শার ফলার মতো জিনিসটা ছুঁড়ে সে ব্যাঘ্রপ্রধানের পার্শ্বদেশে আঘাত হানল। আর এইভাবে থা যা বলেছিলেন তাই ঘটল। ব্যাঘ্রপ্রধান হাউমাউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে গোটা অরণ্য তোলপাড় করে ফেলল, তারপর কোনো রকমে নিজের চামড়া ছিঁড়ে লাঠিটা তার দেহ থেকে বার করে আনল। সমস্ত অরণ্য ততক্ষণে জেনে গেছে রোম-লোমহীন জিনিসটা দূর থেকেই মারাত্মক আঘাত হানতে পারে এবং তার সম্পর্কে ওদের ভয় আরো দশগুণ বেড়ে গেল। এইভাবেই ব্যাঘ্রপ্রধান রোম-লোমহীন প্রাণীটিকে হত্যা করতে শেখায় এবং সেটা যে আমাদের কী প্রচণ্ড

ক্ষতি করেছে তা তোমাদের সবারই জানা আছে। ওরা হত্যা করে ফাঁস দিয়ে, গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে আমাদের ফেলে দিয়ে, লুকানো ফাঁদ পেতে উড়ন্ত লাঠি ছুঁড়ে, আর সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে আসা একটা গুঞ্জনরত বস্তু দিয়ে (হাতি বলছিল রাইফেলের কথা) এবং লাল ফুল দ্বারা, যা আমাদেরকে উন্মুক্ত জায়গায় বার করে আনে। তবু বছরে একটি রাতে রোম-লোমহীন বস্তুটি বাঘকে ভয় করে, থা যেমন কথা দিয়েছিলেন এবং তখন বাঘও সেই ভয়কে পুরোপুরি কাজে লাগায়, ওই প্রাণীকে যেখানে পায় সেখানেই হত্যা করে, ব্যাঘ্রপ্রধানকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছিল তা স্মরণ করে তার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু ওই একটি রাত ছাড়া ভয় দিনরাত্রি সারাক্ষণ অরণ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

তাদের জন্য এর মানে কী সেটা উপলব্ধি করে হরিণকুল বলে উঠল, ও হো হো! ও হো হো!

এবং যখন একটা বড় ভয় অন্য সব ভয়কে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে, এখন যেমন হয়েছে, তখন কি আমরা অরণ্যের প্রাণিকুল আমাদের ছোটখাট ভয়গুলিকে এক পাশে সরিয়ে রেখে কোনো একটা জায়গায় এক সাথে মিলিত হতে পারি না? এই মুহূর্তে যেমন হয়েছি ?

মৌগলি বলল, মানুষ শুধু এক রাত্রের জন্য বাঘকে ভয় করে, তাই না ?

হ্যাঁ, শুধু এক রাতের জন্য, হাতি বলল।

কিন্তু আমি, আমরা, অরণ্যের সবাই জানি যে শের খান এক পক্ষকালের মধ্যে দু'তিনবার মানুষ মারে।

তবু। তখন সে মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছন দিক থেকে, আর যখন সে আঘাত হানে তখনো সে তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখে, কারণ তখনো তার সারা অন্তর ভয়ে পূর্ণ। মানুষ সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালে সে তৎক্ষণাৎ ছুটে পালাতো। কিন্তু ওই একটি রাতে বাঘ খোলাখুলিভাবে গ্রামে চলে যায়, ঘরবাড়ির মধ্য দিয়ে সে নির্ভয়ে হাঁটে, কোনো একটা দরজা দিয়ে তার মাথা ঢুকিয়ে দেয়। আর মানুষগুলি তখন মাটিতে মাথা রেখে তার সামনে লুটিয়ে পড়ে, আর বাঘ তার শিকার কর্মটি সম্পাদন করে। ওই রাতে সে একটিই শিকার করে।

মৌগলি জলের মধ্যে গড়াতে গড়াতে আপন মনে বলল, ওহ! এখন আমি বুঝতে পারছি শের খান কেন আমাকে তার দিকে তাকাতে বলেছিল। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নি। সে আমার চোখের উপর তার চোখ স্থিরভাবে ধরে

রাখতে পারে নি, আর আমি সুনিশ্চিতভাবেই তার পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি নি। কিন্তু আমি তো মানুষ নই। আমি তো মুক্ত স্বাধীন প্রাণিকুলের একজন।

বাঘিরার রোমশ গলা থেকে গভীর শব্দ উঠল, উস্‌স্‌! বাঘ কি তার নির্ধারিত রাতের কথা জানে?

সন্ধ্যার কুয়াশা ছাড়িয়ে সাঁঝের তারা সুস্পষ্ট না দেখতে পাওয়া পর্যন্ত সে-রাত আসে না। বাঘের সেই একটি রাত কখনো আসে খটখটে শুকনো গ্রীষ্মকালে, কখনো আসে সিক্ত বর্ষায়। ব্যাঘ্রকুলের ওই প্রধানের কারণেই আমাদের এই অবস্থা, তা না হলে ভয় কী জিনিস আমরা কেউ তার কিছুই জানতাম না।

হরিণের কণ্ঠে আর্ত একটা ধ্বনি ফুটে উঠল, আর বাঘিরার ঠোঁটে একটা কুটিল হাসির রেখা দেখা দিল। বাঘিরা বলল, মানুষ কি এই কাহিনী জানে?

ব্যাঘ্রকুল আর আমরা থা-র সন্তান-সন্ততি হাতিরা, আমরা ছাড়া আর কেউ এই কাহিনী জানে না। আর এখন এই জলাশয়ের চারপাশে যারা আছ তারা এই কাহিনী শুনলে। আমার কথা এইখানেই শেষ হলো।

হাতি তার শুঁড় জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট, সে আর কথা বলতে চায় না।

বালুর দিকে ঘুরে মৌগলি বলল, কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু ব্যাঘ্রপ্রধান ঘাস লতাপাতা আর গাছের শাখা-প্রশাখা খেতে থাকল না কেন? সে হরিণের ঘাড় মটকে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাকে তো খায় নি। সে ওই গরম মাংসের দিকে ঝুঁকল কেন?

ছোট ভাইটু, গাছ আর লতাপাতা তাকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল, আজ আমরা যে ডোরাকাটা জিনিসটা দেখি সেটা গাছ আর লতাপাতার কীর্তি। বাঘ আর কোনোদিন ফলমুল খাবে না। বরং সেইদিন থেকেই সে হরিণ আর অন্য যেসব প্রাণী ঘাস-লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে।

বালুর কথা শুনে মৌগলি বলল, তা হলে এই কাহিনী তুমি জানতে, তাই না? এই! এই কাহিনী কেন এতদিন আমি শুনি নি? কারণ অরণ্য এই রকম অজস্র কাহিনীতে পূর্ণ। যদি আমি একবার বলতে শুরু করি তা হলে তা আর কখনো শেষ হবে না। ছোট ভাইটু, আমার কান দুটো ছেড়ে দাও তো!

বাঘ! বাঘ!

এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে এই গল্পমালার প্রথম গল্পে। দলীয় সভার টিলামঞ্চে দলের সঙ্গে লড়াইর পর মৌগলি

তার নেকড়ে-গুহা থেকে বেরিয়ে গ্রামের মানুষ-চাষীরা যেখানে বাস করে সেই চষা ক্ষেতগুলির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে সে থামল না, কারণ এ জায়গাটাও ছিল অরণ্যের খুব কাছাকাছি, আর সে বুঝেছিল যে, আজ রাতের সভায় সে অন্তত একজন মারাত্মক শত্রু তৈরি করেছে। তাই সে দ্রুত ছুটে চলল। উপত্যকার নিচের দিকে যে অমসৃণ পথ চলে গেছে সে ওই পথ ধরে অগ্রসর হলো। বিশ মাইল পথ সে টানা দুলকি চালে অতিক্রম করে শেষে তার অচেনা-অজানা একটি অঞ্চলে এসে পৌছল। উপত্যকা এখানে একটা বিশাল প্রশস্ত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে, চারপাশে বহু পাথরের চাঙ্গড় ও টিলা, আর দুদিকে গভীর সঙ্কীর্ণ খাদ। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট গ্রাম, অন্যদিকে ঘন জঙ্গল গোল হয়ে নেমে এসেছে চাষীদের চারণভূমির একেবারে কিনারে। জঙ্গল হঠাৎ সেখানেই থেমে গেছে, যেন কেউ একটা নিড়ানি দিয়ে তাকে সেখানে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

প্রান্তরের সর্বত্র গরু-বাছুর আর মোষ চরছে। যেসব ছোট ছোট বালক ওই গরু-মোষদের দেখাশোনা করছিল তারা মৌগলিকে দেখেই চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল। আর ভারতের প্রায় সকল গ্রামে যেসব বেওয়ারিশ কুকুর ঘুরে বেড়ায় তারা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল। মৌগলি এগিয়ে গেল। খুব ক্ষুধার্ত সে। গ্রামের প্রবেশ দ্বারের কাছে পৌছে সে একটা বড় কাঁটাঝোপ দেখল। সন্ধ্যা নামতেই সেটা প্রবেশ দ্বারের সামনে টেনে এনে স্থাপন করা হয়। এখন তা একপাশে সরানো।

হুহ্! মৌগলি বলে উঠল। খাবারের খোঁজে তার নৈশকালীন অভিযানের সময় মৌগলি এ ধরনের অবরোধক অনেক দেখেছে। তা হলে মানুষ এখানেও অরণ্যের প্রাণীদের ভয় পায়। সে প্রবেশদ্বারের পাশে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর একজন লোক সেখানে আসতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ খুলে আঙুল দিয়ে নিচের দিকে দেখাল, অর্থাৎ সে খাবার চায়। লোকটি চোখ বড় বড় করে তাকে দেখেই গ্রামের একটিমাত্র সড়ক ধরে তাদের পুরোহিতের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলে গেল। পুরোহিত ছিলেন বড়সড়, মোটাসোটা, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত একজন মানুষ, কপালে লাল-হলুদ ফোঁটা কাটা। পুরোহিত প্রবেশদ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার পেছন পেছন অন্তত একশো জন লোক এসে উপস্থিত হলো। সবাই চিৎকার করছে, কথা বলছে, বড় বড় চোখ করে আঙুল দিয়ে মৌগলিকে দেখাচ্ছে।

মৌগলি আপন মনে বলল, এই মানুষ লোকগুলি একটুও আদব কায়দা জানে না। শুধু ধূসর বানরই এদের মতো আচরণ করত। সে তার দীর্ঘ কেশরাশি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছন দিকে ফেলে জনতার দিকে ভ্রুকুটি করে তাকাল।

পুরোহিত বললেন, ভয় পাবার কী আছে? ওর বাহু আর পায়ের দাগগুলির দিকে তাকাও। ওগুলি নেকড়ের কামড়ের দাগ। ও একটা নেকড়ে-শিশু,জঙ্গল থেকে পালিয়ে এসেছে।

অবশ্যই নেকড়ে শিশুদের সঙ্গে খেলা করার সময় তারা কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে তার গায়ে বেশ জোরেই দাঁত বসিয়ে দিত। মৌগলির সারা বাহু আর পা জুড়ে অসংখ্য সাদা দাগ ছিল। কিন্তু মৌগলি কখনোই এগুলিকে কামড় বলে অভিহিত করত না, কারণ কামড় কাকে বলে সেটা তার জানা ছিল।

আরে ! আরে ! দুতিনটি রমণী এক যোগে বলে উঠল। বেচারা বাচ্চা, নেকড়ের কামড় খেয়েছে। কী সুশ্রী ছেলে। চোখ দুটি লাল আগুনের মতো। মেসুয়া, তোমার যে ছেলেকে বাঘ নিয়ে গিয়েছিল এই বালক ঠিক তার মতো দেখতে।

এমন সময় একটি রমণী সামনে এগিয়ে এলো। তার হাতে আর পায়ে ভারি তামার গয়না। দেখি, বলে সে তার হাতের তালুর নিচ দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে মৌগলিকে লক্ষ করে বলল, না, এ বড় বেশি রোগা। তবে মুখ চোখের চেহারা সত্যিই আমার ছেলের মতো।

গ্রামের পুরোহিত ছিলেন খুব চতুর। তিনি জানতেন যে, মেসুয়া হলো গ্রামের সব চাইতে ধনী অধিবাসীর স্ত্রী। তাই তিনি এক মিনিট ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, অরণ্য একদা যা নিয়ে গিয়েছিল, এখন অরণ্য তাই ফিরিয়ে দিয়েছে। ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, বোন আমার, আর যে পুরোহিত মানুষের দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত দেখতে পারেন তাকে সম্মানিত করতে ভুলো না।

মৌগলি মনে মনে বলল, যে কড়ি দিয়ে আমাকে কিনে নেয়া হয়েছিল তার নামে শপথ করে বলছি, নেকড়ের দল আমাকে যেভাবে যাচাই ও পরীক্ষা করে নিয়েছিল এও তো দেখছি সেই একই রকম ব্যাপার। তো আমি যদি মানুষ হই, তবে মানুষই হতে হবে আমাকে।

রমণী মৌগলিকে হাত দিয়ে ডাকল। জনতা দুদিকে সরে তার জন্য পথ করে দিল। কুটিরে একটা লাল কাজ করা খাট, একটা বড় মাটির ফসল রাখার মটকা, তার গায়ে নানারকম অদ্ভুত নকশা আঁকা, পাঁচ ছ'টা রান্না করার তামার হাঁড়ি-পাতিল, একটা ছোট্ট কুলুঙ্গিতে এক হিন্দু দেবতার মূর্তি আর দেয়ালে গ্রামের মেলায় যে ধরনের আয়না পাওয়া যায় সেই রকম একটা সত্যিকার আয়না।

মেসুয়া মৌগলিকে বড় এক গ্লাস দুধ ও কিছু রুটি খেতে দিল। তারপর সে তার মাথায় নিজের হাত রেখে তার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। তার মনে হলো এ-ই হয়তো তার সত্যিকার ছেলে, বাঘ তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই জঙ্গল থেকে ও ফিরে এসেছে। সে ডাকল, নাথু, ও নাথু! কিন্তু মৌগলি যে ওই নামটা জানে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা গেল না। আমি তোমাকে যখন তোমার নতুন জুতাজোড়া দিয়েছিলাম সেদিনের কথা কি তোমার মনে নেই ? মেসুয়া মৌগলির পায়ে হাত দিল কিন্তু দেখল যে তার পা প্রায় শিং-এর মতো শক্ত। দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় সে বলল, না, এই পায়ে কখনো কোনো জুতা ওঠে নি, তবে তুমি সত্যিই আমার নাথুর মতো দেখতে এবং তোমাকে আমি আমার ছেলে বলেই মনে করব।

মৌগলির অস্বস্তি লাগছিল। সে এর আগে কোনোদিন ছাদের নিচে শোয় নি। কিন্তু উপরের খড়ের চালের দিকে তাকিয়ে সে বুঝল যে ইচ্ছা করলেই যে কোনো সময় সে ওই চাল ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া জানালায় আটকাবার কিছু নেই। এক সময় সে আপন মনে বলল, মানুষের কথাই যদি না বুঝতে পারি তবে মানুষ হয়ে লাভ কী ? জঙ্গলের মধ্যে একটা মানুষের যে অবস্থা হতো, হাবা আর বোবা, এখানে আমার সেই অবস্থা হয়েছে। ওদের কথা আমাকে শিখতেই হবে।

নেকড়েদের সঙ্গে বাস করার সময় মৌগলি জঙ্গলে হরিণকুলের হুমকি আর ক্ষুদে ক্ষুদে বুনো শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ হুবহু অনুকরণ করতে শিখেছিল। শুধু সখের বশে নয়। এখন মেসুয়া একটা শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মৌগলি তা প্রায় হুবহু অনুকরণ করতে শিখে গেল। ফলে রাত গভীর হবার আগেই সে ওই কুটিরের নানা জিনিসের নাম শিখে ফেলল।

শোবার সময় কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দিল। এই কুটিরটাকে তার মনে হচ্ছিল চিতাবাঘ ধরার ফাঁদের মতো। এখানে সে কিছুতেই ঘুমাতে পারবে না।

ওরা দরজা বন্ধ করে দিতেই সে জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল। মেসুয়ার স্বামী বলল, ও যা চায় করতে দাও। মনে রেখো, ও এ পর্যন্ত জীবনে কখনো কোনো খাটে শুতে পারে নি। ও যদি সত্যিই আমাদের ছেলের জায়গায় এসে থাকে তা হলে কখনো আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে না।

মাঠের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পরিষ্কার লম্বা ঘাসের চাতালে মৌগলি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখ বন্ধ করবার আগেই সে তার চিবুকের নিচে একটা কোমল ধূসর নাকের ধাক্কা অনুভব করল।

মা-নেকড়ের সন্তানদের মধ্যে সব চাইতে বড়, ধূসর ভাই, বলল, ফুহ্। বিশ মাইল পথ ভেঙে তোমার সাথে দেখা করতে আসার পুরস্কারটা খুবই সামান্য। ইতোমধ্যে তোমার গা থেকে কাঠের ধুয়ো আর গরু-বাছুরের গন্ধ বেরুচ্ছে, একেবারে মানুষের মতো। এই, ছোট ভাই, জেগে ওঠো, আমি খবর এনেছি।

মৌগলি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, জঙ্গলের সবাই ভালো তো?

লাল ফুল দিয়ে তুমি যেসব নেকড়ের গা জ্বালিয়ে দিয়েছিলে ওরা ছাড়া আর সবাই ভালো আছে। এখন শোনো, শের খান শিকারের জন্য অনেক দূর অঞ্চলে চলে গেছে। তার চামড়া বিশ্রীভাবে ঝলসে গিয়েছিল। সেটা ঠিক হয়ে গেলেই সে ফিরে আসবে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে ফেরার পর সে তোমার হাড় মাংস মজ্জা ওয়েনগুঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে।

এর দুটো দিক আছে, বুঝলে? আমিও একটা ছোট প্রতিজ্ঞা করেছি। যাই হোক, খবর পাওয়া খুব ভালো জিনিস। আজ রাতে আমি খুব ক্লান্ত, নতুন নতুন জিনিস শিখতে শিখতে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ধূসর ভাই। কিন্তু তুমি সব সময় আমার জন্য খবর নিয়ে আসবে। ভুলো না যেন।

তুমি ভুলে যাবে না তো যে তুমি নেকড়ে? উৎকণ্ঠিত গলায় ধূসর ভাই বলল, মানুষ তোমাকে তা ভুলিয়ে দেবে না তো?

কক্ষণো না। তোমাকে আর আমাদের গুহার সবাইকে আমি ভালোবাসি, একথা আমি সব সময় মনে রাখব। কিন্তু একথাও আমি সব সময় মনে রাখব যে আমাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

এবং আবার অন্য দল থেকেও তুমি বহিষ্কৃত হতে পার। মানুষ মানুষই, ছোট ভাই, আর তাদের কথা হচ্ছে ডোবার ব্যাঙ-এর কথার মতো। আমি

পরেরবার যখন এখানে আসব তখন চারণক্ষেতের ওই প্রান্তে বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ওই রাতের পর মৌগলি মানুষের রীতিনীতি ও আচরণ শেখায় এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তিন মাসের মধ্যে সে একবারও গ্রামের প্রবেশদ্বারের বাইরে যেতে পারে নি। প্রথমে তাকে তার কোমরে একটা কাপড় জড়াতে হলো। ভীষণ খারাপ লাগল তার ওটা করতে। তারপর তাকে টাকা-পয়সার ব্যাপারটা শিখতে হলো, যার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারত না। তারপর তাকে লাঙল চালাতে শিখতে হলো, এটা যে কী কাজে লাগবে তা সে বুঝতে পারল না। এরপর গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করে তুলত। সৌভাগ্যবশত অরণ্যের আইন তাকে নিজের মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিখিয়েছিল, কারণ অরণ্যে প্রাণ ও খাদ্য দুটোই নির্ভর করে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর। মৌগলি ছোটদের সঙ্গে খেলতে বা ঘুড়ি উড়াতে চাইত না, মাঝে মাঝে কোনো কোনো শব্দ ভুল উচ্চারণ করত, এজন্য বাচ্চাগুলি তাকে বেশ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তখন মৌগলির ইচ্ছা হতো ওদের তুলে ধরে আছাড় দিয়ে ওদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। কিন্তু সেটা খুবই অখেলোয়াড়ের মতো কাজ হবে ভেবে সে নিজেকে তা থেকে বিরত রাখে।

নিজের শক্তি সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। অরণ্যে সে জানত যে অন্যান্য পশুদের তুলনায় সে ছিল বেশ দুর্বল, কিন্তু এইখানে গ্রামের লোক বলত যে সে একটা ষাঁড়ের মতো বলশালী।

তাছাড়া মানুষে-মানুষে জাত-পাতের ভেদ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। একদিন কুমোরের গাধাটা যখন পা পিছলে এঁটেল মাটির গর্তে পড়ে যায় তখন সে তার লেজ ধরে টেনে তাকে তুলে আনে, তারপর মাটির পাত্রগুলি আবার ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে কুমোরকে সাহায্য করে। কুমোর যাচ্ছিল খানিওয়ারায়, তার জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য। তো অন্যদের কাছে মৌগলির ওই কাজটা ছিল ভীষণ বিশ্রী। কারণ কুমোর হলো নিচ জাতের মানুষ আর ওর গাধা তো আরও খারাপ। পুরোহিত যখন মৌগলিকে তার এই কাজের জন্য তিরস্কার করলেন তখন মৌগলি বলল, সে এবার পুরোহিতকে ওই গাধার পিঠে বসাবে। পুরোহিত মেসুয়ার স্বামীকে পরামর্শ দিলেন মৌগলিকে এবার আর দেরি না করে যত শীঘ্র সম্ভব কাজে লাগিয়ে দেয়া দরকার। গাঁয়ের মোড়ল বলল যে আগামী দিন থেকে তাকে মহিষের দল নিয়ে চারণ ক্ষেতে যেতে হবে। ওরা

সাদা দাড়িওয়ালা সব বুড়োরা এক সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, ঠিক, ঠিক, একেবারে সত্যি কথা।

যখন চরে বেড়াবে তখন ওদের উপর নজর রাখতে হবে। এ ব্যবস্থায় সবার চাইতে বেশি খুশি হলো মৌগলি নিজে। সে এখন, বলতে গেলে, গ্রামের একজন কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ওই রাতেই সে বিশাল ডুমুর গাছের নিচে যেখানে পাটাতনের মতো একটা জায়গায় বৃত্তাকারে বসে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের লোকজন গল্প ও আলাপ আলোচনা করত সেখানে গিয়ে হাজির হলো। ওটা ছিল গ্রামের ক্লাব। মোড়ল আর চৌকিদার আর গাঁয়ের নাপিত, যে গাঁয়ের সব গুজবের খবর রাখত, আর গাঁয়ের শিকারি বলদেব, তার একটা টাওয়ার গাদাবন্দুক ছিল, সবাই ওখানে গিয়ে মিলিত হতো, গালগল্প আর ধূমপান করত। বানরেরা গাছের উপরদিকের শাখায় বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলত, আর নিচে গাঁয়ের মানুষেরা গোল হয়ে বসে হুঁকা টানতে টানতে অনেক রাত

পর্যন্ত গল্প করত। পাটাতনের নিচে একটা গর্তে বাস করত একটা গোখরা সাপ। রোজ রাতে তাকে এক বাটি দুধ খেতে দেয়া হতো, কারণ তাকে বিবেচনা করা হতো পবিত্র ও পূজনীয় বলে। পাটাতনের উপরে বসে বুড়োরা দেবতা, মানুষ আর ভূতপ্রেতদের নিয়ে আশ্চর্য সব কাহিনী বলত। আর বলদেব অরণ্যের প্রাণীদের সম্পর্কে আরো আশ্চর্য সব গল্প বলত, যা শুনে বুড়োদের বৃত্তের বাইরে জটলা পাকিয়ে বসা ছোটদের মাথা থেকে চোখগুলি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইত। বেশির ভাগ গল্পই ছিল অরণ্যের প্রাণীদের নিয়ে, আর সেটা ছিল স্বাভাবিক, কারণ অরণ্য ছিল প্রায় তাদের দোরগোড়ায়। হরিণ আর বুনো শুয়োর তাদের শস্যক্ষেত তছনছ করত, শস্য খেয়ে ফেলত, আর মাঝে মাঝে গ্রামের প্রবেশ দ্বারের প্রায় চোখের সামনে থেকে গোধূলির অন্ধকারে বাঘ দু একজন মানুষ পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেত।

ওরা যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলত স্বাভাবিকভাবেই মৌগলি তার অনেক কিছুই ভালোভাবে জানত এবং হাসি চাপবার জন্য তাকে প্রায়ই তার মুখের উপর হাত চাপা দিতে হতো। আর ওদিকে বলদেব হাঁটুর উপর তার গাদাবন্দুক রেখে নানা রং চড়িয়ে এক আজব কাহিনীর পর আরো আজব এক কাহিনী শুরু করত, আর অবরুদ্ধ হাসির তাড়নায় মৌগলির কাঁধ ফুলে ফুলে উঠত।

বলদেব তখন ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল যেবাঘটা মেসুয়ার ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়, সেটা ছিল একটা ভুতুড়ে বাঘ। কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া এক দুষ্ট বুড়ো সুদখোর মহাজনের আত্মা ওর দেহে বাসা বেঁধেছে। বলদেব বলল, এটা যে সত্য সেটা আমি জানি। পুরণ দাসের হিসাবের খাতাপত্র পুড়ে যাবার সময় একটা মারামারি হয়, তখন এক আঘাতে তার পা খোঁড়া হয়ে যায়, আর আমি যে বাঘের কথা বলছি সেটাও খুঁড়িয়ে চলে, তার পায়ের অসমান ছাপ দেখে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

সাদা দাড়িওয়ালা সব বুড়োরা এক সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, ঠিক, ঠিক, একেবারে সত্যি কথা।

এমন সময় মৌগলি বলে উঠল, যতসব আজগুবি গল্প। সবাই জানে যে ওই বাঘটা জন্ম থেকেই খোঁড়া। যার মধ্যে একটা শিয়ালের সাহসও নেই তার সম্পর্কে এক সুদখোরের আত্মার কথা বলা নিতান্ত ছেলেমানুষী গল্প।

এ কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য সবাই হতবাক হয়ে গেল আর মোড়ল মৌগলির দিকে তাকিয়ে থাকল চোখ বড় বড় করে।

তারপর বলদেব বলল, ওহো, এ সেই জঙ্গলের বাচ্চাটা বুঝি ? তো তুমি যদি এতই জানো তাহলে ওর চামড়াটা নিয়ে চল খানিওয়ারায়। সরকার তার প্রাণের মূল্য ধার্য করেছে একশো টাকা। আর শোনো, বড়রা যখন কথা বলবে তখন তার মধ্যে কখনো কথা বলবে না।

মৌগলি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে সে বলল, সারা সন্ধ্যা ধরে আমি এখানে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা শুনেছি। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বলদেব অরণ্য সম্পর্কে যত কথা বলেছে তার মধ্যে এক বিন্দু সত্য নেই, যদিও অরণ্য বলতে গেলে তার দ্বারপ্রান্তে। এ অবস্থায় সে যেসব ভূতপ্রেত দৈত্যদানব দেবদেবী দেখেছে বলে বলল তা আমি কেমন করে বিশ্বাস করব ?

মোড়ল বলল, এই ছেলের চারণ ক্ষেত্রে কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে, আর মৌগলির ঔদ্ধত্য দেখে বলদেব ফুলতে লাগল, ফুঁসতে থাকল।

বেশির ভাগ ভারতীয় গ্রামে গোচারণ পদ্ধতি ছিল এই রকম। খুব ভোরে কয়েকটি বালক গরু-বাছুর আর মোষের দল নিয়ে চারণ ভূমিতে চলে যেত, তারপর তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসত রাতের বেলা। আর এই সব গরু-মোষ, যারা একজন পূর্ণবয়স্ক শ্বেতাঙ্গ মানুষকে অতি সহজে পায়ের নিচে মাড়িয়ে মেরে ফেলতে পারত, তারা বিনা দ্বিধায় বাচ্চাদের চড়-চাপড়, চিৎকার ও শাসন নির্দেশ মেনে নিত, যদিও ছেলেরা উচ্চতায় তাদের নাক পর্যন্তও আসত না। যতক্ষণ ছেলেরা দলকে একত্রিত রাখতে পারত ততক্ষণ সবাই থাকত নিরাপদ, কারণ কোনও বাঘ গরু-মোষের একটা যূথবদ্ধ দলকে আক্রমণ করার সাহস পেত না। কিন্তু যদি ছেলেদের কেউ ফুল পাড়ার জন্য কিংবা গিরগিটি শিকারের উদ্দেশ্যে দলছুট হয়ে এদিকে ওদিকে যেতো তখন কখনো কখনো বাঘ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'একটা গরু তুলে নিয়ে যেত। মৌগলি সকাল বেলায় বিশালদেহ মোষ-দলপতি রামের পিঠে চড়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়ত। আর তার পেছন পেছন, একে একে নিজেদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে, তাদের দীর্ঘ বাঁকানো শিং আর নির্মম চোখ নিয়ে ধূসর-নীল মোষেরা অনুসরণ করত। মৌগলি ছেলেদের কাছে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। সেই এখানে প্রভু। সে একটা লম্বা মসৃণ বাঁশের লাঠি দিয়ে মোষগুলিকে পেটাত, আর কামাইয়া নামের একটা ছেলেকে বলে দিত সে যেন গরু-বাছুরগুলিকে ইচ্ছামতো চরতে দেয়, কিন্তু কখনো যেন দলের কাছ-ছাড়া না

হয়, দূরে চলে না যায়। তারপর মৌগলি নিজের মোষের দল নিয়ে তার পথে চলে যেত।

ভারতীয় চারণক্ষেতগুলি ছিল পাথর-নুড়ি, জংলি ঘাস, আর শীর্ণ খাড়িতে পূর্ণ। গরু-বাছুরের দল এগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। মোষগুলি সাধারণত জলাশয় আর কর্দমাক্ত জায়গায় গিয়ে জড়ো হতো, তারপর সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাদাজলের মধ্যে গড়াগড়ি দিত কিংবা নরম কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাত। ওয়েনগুঙ্গা নদী যেখানে অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে মৌগলি তার মোষের দলকে তার কিনারা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যেত, তারপর মোষের পিঠ থেকে নেমে নিজস্ব দ্রুত দুলকি চালে বাঁশ ঝোপের কাছে চলে যেত, আর সেখানেই তার দেখা হতো ধূসর ভাই-এর সাথে। এবার তাকে দেখেই ধূসর ভাই বলল, তোমার জন্য আমি এখানে অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। আর এই গরু-মোষ চরাবার কাজ, এটার মানে কী ?

হুকুম, মৌগলি বলল। কিছুদিনের জন্য আমি এখন গরু-মোষ চরাবার দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। তো শের খানের খবর কী ?

ও ফিরে এসেছে এই অঞ্চলে। তোমার জন্য সে এখানে অনেকদিন অপেক্ষা করেছে কিন্তু এখন আবার অন্যত্র চলে গেছে। এখানে এখন শিকারের অভাব। কিন্তু সে নিঃসন্দেহে তোমাকে মেরে ফেলতে চায়।

খুব ভালো কথা। যতদিন সে অনুপস্থিত থাকে ততদিন তুমি অথবা তোমাদের চার ভাই-এর একজন এই টিলার উপর এসে বসে থাকবে যেন গ্রাম থেকে বেরুবার পরই আমি তোমাদের দেখতে পাই। শের খান ফিরে এলে প্রান্তরের মাঝখানে ঢাক-গাছটার পেছনে যে গভীর সরু উপত্যকা আছে সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। শের খানের মুখের মধ্যে গিয়ে পড়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপর মৌগলি একটা ছায়াঘেরা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ত, ঘুমাত, আর মোষগুলি তার চারপাশে চরে বেড়াত। ভারতে গবাদিপশু চরানোর মতো এত অলস কাজ আর কিছু নেই। গরুগুলি আপন মনে এদিক ওদিক যায়, ঘাস আর লতাপাতা চিবোয়, শুয়ে থাকে, তারপর আবার অন্যদিকে যায়, তারা নিচু গলায় ডাকও ছাড়ে না। মাঝে মাঝে শুধু একটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। আর মোষগুলি তো প্রায় কখনোই কোনো শব্দ করে না। তারা শুধু একের পর এক কাদাভরা জলাশয়ের মধ্যে নেমে যায়, তারপর সেখানে তাদের নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে চুপ

করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাদা-জলের উপর শুধু তাদের নাক আর গাঢ় নীল চোখ দেখা যায়, কাঠের গুঁড়ির মতো নিশ্চল হয়ে ওরা ওখানে পড়ে থাকে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে টিলাগুলি মনে হয় যেন থরথর করে নাচছে। রাখাল ছেলেগুলি একটা চিলের, কখনোই একটার বেশি নয়, শিসের ধ্বনি শুনতে পায়, এত উঁচুতে যে তাকে প্রায় দেখাই যায় না, কিন্তু তারা জানে যে তাদের কেউ যদি মরে যায় কিংবা কোনো একটা গরু যদি মরে, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে ওই চিল তীরের মতো নিচে নেমে আসবে, আর কয়েক মাইল দূরের আরেকটা চিল ওইভাবে দ্রুত বেগে তার নেমে আসার দৃশ্যটা দেখবে এবং তক্ষুণি সে তাকে অনুসরণ করবে, তারপর আরেকটা, তারপর আরো একটা এবং কোনো পশু বা মানুষ ভালোভাবে মরবার আগেই বিশ-পঁচিশটা ক্ষুধার্ত চিলকে দেখা যাবে ভোজবাজির মতো কোথা থেকে এসে মৃতদেহের চারপাশে জড়ো হয়েছে।

ছেলেরা ঘুমায়, জেগে ওঠে, তারপর আবার ঘুমায়। তারা শুকনা ঘাস দিয়ে ঝুড়ি বানায়, গঙ্গা ফড়িং ধরে সেই ঝুড়িতে রাখে, কিংবা দুটো লম্বা পায়ের পোকা ধরে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবার চেষ্টা করে, নয়তো লাল-কালো বুনো বাদাম কুড়িয়ে তা দিয়ে মালা বানায়, শিলাখণ্ডের উপর রোদ পোহানো কোনো টিকটিকিকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ করে, কিংবা জলকাদার মধ্যে ব্যাঙ শিকাররত কোনো সাপের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তারা গান ধরে, লম্বা লম্বা গান, শেষ চরণে সুরের স্থানীয় দেশজ কাঁপন লাগায়, আর বেশিরভাগ মানুষের সারাজীবন যত দীর্ঘ মনে হয় তাদের কাছে একটা দিন মনে হয় যেন তার চাইতেও দীর্ঘ। ছেলেরা হয়তো কাদার প্রাসাদ বানায়, কাদার তৈরি মানুষ, ঘোড়া, মহিষ তৈরি করে সেখানে সাজিয়ে রাখে, পুরুষদের হাতে নল খাগড়া গুঁজে দেয়, যেন তারা রাজা এবং অন্য মূর্তিগুলি রাজার সেনাবাহিনী, কিংবা তারা দেবতা, যাদের পূজা করতে হবে। তারপর সন্ধ্যা নামে, ছেলেরা ডাক দেয়, মোষগুলি কাদাজলের ভেতর থেকে ঠেলেঠুলে বন্দুকের গুলির মতো শব্দ করতে করতে একের পর এক উঠে আসে, আর তারপর সবাই একযোগে সারি বেঁধে ধূসর প্রান্তরের উপর দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মিটমিট করে প্রদীপ জ্বলতে শুরু করেছে।

দিনের পর দিন মৌগলি তার মোষবাহিনীকে ওদের জলকাদায় গড়াবার জায়গায় নিয়ে যায়, দিনের পর দিন সে দেড়-মাইল দূরে প্রান্তরের ওপারে ধূসর ভাই-র পিঠ দেখতে পায়, বুঝতে পারে যে শের খান তখনো ফিরে আসে নি।

দিনের পর দিন সে তার ঘাসের শয্যায় শুয়ে চারপাশের সব ধ্বনি কান পেতে শোনে আর তার অরণ্যের পুরনো দিনগুলির স্বপ্ন দেখে। ওয়েনগুঙ্গার পাশের জঙ্গলে শের খান যদি সে সময় তার খোঁড়া পায়ে একটা মাত্র ভুল পদক্ষেপ নিত মৌগলি তখন ওই দীর্ঘ নিঃশব্দ সকালগুলিতে তা নিশ্চিতভাবে শুনতে পেত।

অবশেষে একটা দিন এলো যখন ধূসর ভাইকে সংকেতস্থলে দেখা গেল না। মৌগলি হেসে উঠে তার মোষবাহিনীকে ঢাক গাছের পাশের শীর্ণ উপত্যকার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ওই ঢাকগাছ এখন সোনালি-লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। সে ধূসর ভাইকে সেখানে বসে থাকতে দেখল, তার পিঠের রোমগুলি সব খাড়া হয়ে আছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে নেকড়েটা বলল, তোমাকে অসতর্ক অবস্থায় ধরবার জন্য শের খান এক মাস লুকিয়ে ছিল। তারপর গতরাতে তাবাকিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার চিহ্ন রেখা অনুসরণ করে সে পর্বতমালা পার হয়ে এপাশে এসেছে।

মৌগলি ভ্রুকুটি করল। আমি শের খানকে ভয় করি না, কিন্তু তাবাকি অতিশয় ধূর্ত।

নিজের ঠোঁট চাটতে চাটতে ধূসর ভাই বলল, কোনো ভয় নেই তোমার। আজ খুব ভোরে তাবাকির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এখন সে চিলগুলিকে জ্ঞান দান করছে, কিন্তু আমি তার ঘাড় মটকে দেবার আগে আমার কাছে সে সব বলে গেছে। শের খানের পরিকল্পনা হলো আজ সন্ধ্যায় গ্রামের প্রবেশদ্বারে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে, শুধু তোমার জন্য, আর কারো বা আর কিছুর জন্য নয়। এখন সে ওয়েনগুঙ্গার বড় শুকনা খাড়ি-উপত্যকায় শুয়ে আছে।

মৌগলি জিজ্ঞাসা করল, ও কি খেয়েছে, নাকি আজ খালি পেটে শিকার করছে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করছিল তার জীবন অথবা মরণ।

আজ সকালে সে শিকার করেছে, একটা শুয়োর, তারপর সে জল পান করেছে। মনে আছে, শের খান কখনো উপোস করতে পারত না, প্রতিশোধ নেবার জন্যও না?

ওহ! বোকা, বোকা! কী রকম বাঘের বাচ্চা ওটা! পেট পুরে খেয়েছে, জল পান করেছে, আর ভাবছে যে তার নিদ্রা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অমি চুপ করে বসে থাকব? তো, এখন কোথায় শুয়ে আছে ও? আমরা যদি শুধু দশ জনও হতাম তাহলে ওকে তার শোয়া অবস্থাতেই এখানে টেনে নিয়ে আসতে

পারতাম। ওর গায়ের গন্ধ নাকে না পেলে মোষগুলি ওকে আক্রমণ করবে না। আমাদের পক্ষে কি ওর চিহ্নরেখার পেছনে ঘুরে যাওয়া সম্ভব? তাহলে ওরা ওর গায়ের গন্ধ পেত।

ধূসর ভাই বলল, সেটা এড়াবার জন্যই ও ওয়েনগুঙ্গার অনেক নিচ দিয়ে সাঁতরে ওপাশে গেছে।

আমি জানি তাবাকি ওকে এ পরামর্শ দিয়েছে। নিজে থেকে এরকম করার কথা ওর মাথায় আসত না। মৌগলি উঠে দাঁড়িয়ে মুখের মধ্যে তার আঙুল পুরে ভাবতে লাগল, তারপর বলল, ওয়েনগুঙ্গার বড় খাড়ি-উপত্যকা। ওটা এখান থেকে আধ মাইল দূর দিয়ে চওড়া সমতল প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে। আমি আমার এই পশুদলকে অরণ্যের মধ্য দিয়ে উপত্যকার মাথায় নিয়ে যেতে পারি, তারপর সেখান থেকে দ্রুতবেগে নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে শের খান উপত্যকার পাদদেশ দিয়ে পালিয়ে যাবে। আমাদেরকে ওই পথটা বন্ধ করতে হবে। ধূসর ভাই, তুমি কি আমার জন্য আমাদের এই পশুদলটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিতে পারবে?

উঁহুঁ, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবে আমি একজন জ্ঞানী সাহায্যকারী সঙ্গে এনেছি। ধূসর ভাই দুলকি চালে ছুটে গিয়ে একটা গর্তের মধ্য নেমে পড়ল, তারপর সেখান থেকে সে একটা বিরাট ধূসর মাথা উঁচু করে তুলে ধরল, মৌগলির খুব পরিচিত একটি মাথা। তারপর একটা হতশ্রী চিৎকারের শব্দে চারপাশের উষ্ণ হাওয়া পূর্ণ হয়ে গেল— মধ্যদিনে একটা নেকড়ের শিকারের ডাক, সমগ্র অরণ্যের সব চাইতে নিষাদিত চিৎকার।

হাততালি দিয়ে মৌগলি বলল, আকেলা! আকেলা! আমি জানতাম তুমি আমাকে ভুলবে না। শোনো, সামনে আমাদের একটা বড় কাজ আছে। আকেলা, এই পশুর দলকে দুভাগে ভাগ করে ফেল। গরু-বাছুরগুলিকে একসঙ্গে রাখবে, আর ষাঁড় এবং মোষগুলি থাকবে নিজেদের মতো করে।

নেকড়ে দুটি পশুগুলির ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল, একবার ভেতরে যাচ্ছে, তারপর বেরিয়ে আসছে। পশুগুলি মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করল, তারপর দুটি গুচ্ছে ভাগ হয়ে গেল।

একদিকে দাঁড়াল গরুর দল, মাঝখানে থাকল তাদের বাছুরগুলি। ওরা পা দিয়ে মাটি ঠুকল, তীব্র চোখে চারিদিকে তাকাল, ধূসর ভাই বা আকেলা এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকলেই ওরা ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে তাকে দলে

পিষে মাড়িয়ে মেরে ফেলত। অপর গুচ্ছটিতে পূর্ণ বয়স্ক ও তরুণ ষাঁড়গুলিও পা দিয়ে মাটি ঠুকছে, নাক দিয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। কিন্তু তাদেরকে বেশি জাঁদরেল দেখালেও আসলে বেশি বিপদজনক ছিল গরুর দল, কারণ তারা তাদের বাছুরগুলিকে রক্ষা করার জন্য সব সময় মরিয়া হয়ে থাকত। নেকড়ে দুটি যে রকম সুষ্ঠুভাবে পশুদলকে দুভাগ করল ছয় জন মানুষ মিলেও তা করতে পারত না।

আকেলা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এবার কী নির্দেশ? ওরা আবার একত্রিত হবার চেষ্টা করছে।

মৌগলি রামের পিঠে চড়ে বলল, ষাঁড়গুলিকে বাঁ দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও, আকেলা। আর ধূসর ভাই, আমরা চলে গেলে গরুগুলিকে একত্রিত রেখে ওদেরকে খাড়ি-উপত্যকার পাদদেশে তাড়িয়ে নিয়ে যেও। হাঁপাতে হাঁপাতে কর্কশ কণ্ঠে ধূসর ভাই বলল, কত দূর পর্যন্ত?

যেখানে চারপাশটা এত উঁচু যে, শের খানের পক্ষে লাফিয়ে তা পার হওয়া সম্ভব নয় ততদূর পর্যন্ত। চিৎকার করে এই নির্দেশ দিল মৌগলি, তারপর বলল, আমরা নিচে নেমে না আসা পর্যন্ত ওদেরকে ওইখানে আটকে রাখবে। আকেলা জোরে ডাক দিতে থাকল আর ষাঁড়গুলি ছুটে এগিয়ে গেল। এদিকে ধূসর ভাই গরুর পালের সামনে দাঁড়াল। গরুগুলি তাকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে গেল আর সে তাদের সামান্য সামনে থেকে খাড়ি-উপত্যকার পাদদেশের দিকে ছুটতে লাগল। আর অন্যদিকে আকেলা ষাঁড়ের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল দূরে বাঁ দিকে।

চমৎকার! আরেকবার, তারপরই ওরা আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। সাবধান, আকেলা, সাবধান। বেশি হুঙ্কার করলে ষাঁড়ের পাল এখনই তোমাকে আক্রমণ করে বসবে। হেই! কালো হরিণ তাড়িয়ে নেবার চাইতেও এটা বেশি কঠিন কাজ। আকেলা, তোমার কি মনে হয় জঙ্গলের মধ্যেও এই প্রাণীগুলি এরকম আচরণ করতে পারত?

ধুলোর মধ্যে কষ্টে শ্বাস নিয়ে আকেলা বলল, আমার সময়ে আমি এদেরও শিকার করেছি। তো এখন কি ওদের জঙ্গলের দিকে ঘুরিয়ে দেব? হ্যাঁ, ঘুরিয়ে দাও, তাড়াতাড়ি ওদের ঘুরিয়ে দাও ওদিকে। রাম ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। ওহ্, আমি আজ ওর কাছ থেকে কী চাই সেটা যদি ওকে শুধু বুঝিয়ে বলতে পারতাম!

শুধু দ্বিতীয়বার আমার শিকার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। ওকে যেতে দাও, আকেলা।

এবার ষাঁড়গুলি ডান দিকে ঘুরে পাশের ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। প্রায় আধ মাইল দূরে দাঁড়ানো অন্য রাখাল বালকরা এই দৃশ্য দেখে যত দ্রুত সম্ভব তত দ্রুত বেগে গ্রামের দিকে ছুটে চলল। তারা চিৎকার করে বলতে লাগল যে মোষের দল পাগল হয়ে পালিয়ে গেছে।

মৌগলির প্ল্যানটা ছিল খুব সোজা। সে শুধু টিলার উপর দিকে একটা বড় বৃত্ত তৈরি করে খাড়ি-উপত্যকার মাথায় উঠে যাবে। তারপর সেখান থেকে ষাঁড়ের পাল নিয়ে নিচের দিকে ধেয়ে আসবে আর শের খানকে আটকে ফেলবে ষাঁড় আর গরুর পালের মাঝখানে। মৌগলি জানত যে পেট পুরে খেয়ে তারপর ভালো করে জল পান করার পর শের খান লড়াই করার মতো অবস্থায় থাকবে না, খাড়ি উপত্যকার পাশ বেয়ে উঠেও যেতে পারবে না। মৌগলি এখন মোলায়েম কণ্ঠে মোষগুলিকে শান্ত করছে। আকেলা চলে গেছে অনেক পেছনে, সেখান থেকে দু'একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে সে পেছনের বাহিনীকে সামনের দিকে

পরিচালিত করছে। খুব বড় একটা বৃত্ত করে তারা এগিয়ে চলেছে। খাড়ি-উপত্যকার খুব কাছে তারা যেতে চায় নি, পাছে শের খান বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে যায়। অবশেষে মৌগলি তার বিভ্রান্ত পশুর পালকে খাড়ি-উপত্যকার মাথায় একটা ঘাসে ঢাকা জায়গায় ঠেলে নিয়ে এলো। ওই জায়গাটা ঢালু হতে হতে একদম সোজা উপত্যকার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এই উচ্চতা থেকে গাছপালাগুলির মাথার উপর দিয়ে নিচের সমতল প্রান্তর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মৌগলি যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছিল তা হলো উপত্যকার চারপাশের খাড়াইগুলি। সে সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ করল যে খাড়া-উপত্যকার চারপাশ সোজা উপরে উঠে গেছে, নিচে নেমে এসেছে, তার গায়ে যে লতাপাতা ঝুলে আছে সেখানে পা রেখে কখনোই কোনো বাঘ উপরে উঠে পালাতে সক্ষম হবে না। শত চেষ্টা করলেও।

মৌগলি তার হাত উঁচু করে তুলে ধরে বলল, ওদের নিঃশ্বাস নিতে দাও, আকেলা। এখনো ওরা তার গন্ধ পায় নি। পশুগুলিকে ভালো করে নাক ভরে নিঃশ্বাস নিতে দাও। কে তার জন্য আসছে এবার আমি শের খানকে সে খবরটা জানিয়ে দিতে চাই। ও এখন আমাদের ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়েছে।

মৌগলি তার মুখের দু'পাশে নিজের হাত রেখে খাড়ি-উপত্যকার নিম্নদেশ লক্ষ করে চিৎকার করে উঠল, মনে হলো যেন একটা সুড়ং-এর ভেতর সে চিৎকার করছে, আর তার সেই চিৎকার টিলা থেকে টিলায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

অনেকক্ষণ পর একটা নিদ্রাতুর শিথিল গলার শব্দ ভেসে এলো। ভরপেট খাওয়া সদ্য ঘুম ভাঙা একটা বাঘের আওয়াজ।

শের খান বলল, কে ডাকে ? চমৎকার একটা ময়ূর পাখা ঝটপট করতে করতে কর্কশ গলায় শব্দ তুলে উপত্যকার ভেতর থেকে উড়ে এসে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমি, মৌগলি। এই গরু চোরার এবার দলের টিলামঞ্চে যাবার সময় হয়েছে। আকেলা, তাড়াতাড়ি ওদের নিচে পাঠাও। রাম! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি! নিচে! নিচে!

ঢালুর একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশুর পাল এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল, কিন্তু আকেলা তার শিকারের তীক্ষ্ণ ভরাগলার ডাক দিতেই তারা একের

পর এক স্রোতের মতো নিচের দিকে ছুটল। একবার শুরু হবার পর কারো সাধ্য ছিল না তাদের থামাবার। আর ওরা উপত্যকার নিচের সমতল ভূমিতে পৌঁছবার আগেই রাম তার নাকে শের খানের গন্ধ পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড এক গর্জন করে উঠল।

রামের পিঠে বসা মৌগলি হা-হা করে হেসে উঠল, এইবার তুমি বুঝতে পেরেছ! তারপর শুরু হলো কালো শিং, ফেনাভর্তি মুখ, আর হিংস্র চোখের পশুগুলির প্রায় উন্মত্ত ছোটাছুটি, বন্যার তোড়ে বড় বড় পাথরের চাঙড় যেমন ছুটে চলে সেইভাবে ওরা ছুটছে। দুর্বল মোষগুলি শক্তিমানগুলির ধাক্কায় এক পাশে ছিটকে পড়ছে, তাদের নখের আঁচড়ে উপত্যকার পাশের দেয়ালে গজিয়ে ওঠা ঘাস লতাপাতা ছিঁড়ে উঠে আসছে। কী ঘটতে যাচ্ছে ওরা তা বুঝতে পেরেছে। মোষের পালের এই রকম প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দাঁড়াবার সাহস কোনো বাঘেরই নেই। শের খান তাদের ক্ষুরের বজ্রগর্জন ধ্বনি শুনতে পেল, উঠে দাঁড়িয়ে খাড়ি-উপত্যকার নিচের দিকে এগিয়ে গেল, দুপাশে তাকিয়ে দেখল, পালাবার একটা পথ খুঁজল। কিন্তু উপত্যকার পার্শ্বদেশ সোজা মসৃণ হয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। ভরপেট খাওয়া আর জল পানের পর তার আর লড়াই করার অবস্থা নাই। এইমাত্র সে যে ডোবা থেকে উঠে এসেছে তার মধ্যে দিয়ে ছপছপ শব্দ তুলে মোষের পাল ছুটে এলো। তাদের গর্জনে মনে হলো পাথর পর্যন্ত ফেটে যাবে। উপত্যকার পাদদেশ থেকে মৌগলি প্রত্যুত্তরে গর্জন ধ্বনি শুনল, শের খানকে সে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। শের খান বুঝেছিল যে, অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ হলে গরুর পালের চাইতে মোষ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়াই ভালো হবে, কারণ সন্তানদের বাঁচাবার জন্য তারা গরুর পালের মতো মরিয়া হয়ে উঠবে না। এই সময় রাম একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, তারপর আবার উঠে দাঁড়াল, তার পায়ের নিচে নরম কী একটা পিষ্ট হয়ে গেল। রামের পেছন পেছন ছুটে আসছিল ষাঁড়ের পাল। দুদিকের পশুর দল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। দুটো দলই ফোঁস ফোঁস করতে করতে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে খোলা প্রান্তরে এসে পড়ল। মৌগলি সুযোগ বুঝে রামের পিঠ থেকে নেমে তার লাঠি দিয়ে ওকে দমাদম পেটাতে লাগল।

জলদি কর, আকেলা। ওদের আলাদা কর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও, নইলে এক্ষুণি, নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি শুরু করবে। আকেলা, ওদের তাড়িয়ে

দাও। হেই, রাম, হেই, হেই। হেই, সোনামণিরা, এবার ঠাণ্ডা হও। সব শেষ হয়ে গেছে।

আকেলা আর ধূসর ভাই দৌড়াদৌড়ি করে মোষগুলোর পায়ে আস্তে করে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে, চিমটির মতো। আর পশুর পাল যদিও আরেকবার ঘুরে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে নতুন একটা আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করেছিল, মৌগলি কোনোরকমে রামকে নিজের পথে ঘোরাতে সক্ষম হলো, আর তারপর অন্য মোষগুলি তাকে অনুসরণ করে নিজেদের জলকাদায় গড়াগড়ি দেবার জায়গার দিকে চলতে শুরু করল।

শের খানকে পায়ের নিচে পিষে মারবার আর দরকার হবে না। সে মরে গেছে। চিলগুলি এরই মধ্যে তার জন্য নিচে নেমে আসতে শুরু করেছে।

আকেলা ও ধূসর ভাই-এর দিকে তাকিয়ে মৌগলি বলল, একটা কুত্তার মৃত্যু, ভাইরা! মানুষের সঙ্গে বাস করার পর থেকে মৌগলি সব সময় সঙ্গে একটা খাপে ঢাকা ছুরি রাখত নিজের গলায় ঝুলিয়ে। এখন হাত দিয়ে সেটা স্পর্শ করে মৌগলি বলল, তবে সত্যিকার লড়াই ও কখনোই করত না। সভার টিলামঞ্চে ওর চামড়াটা ভালোই দেখাবে। কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি কাজে লাগতে হবে।

মনুষ্য সমাজে বেড়ে ওঠা কোনো বালক একটা দশফুট লম্বা বাঘের চামড়া খসাবার কথা কল্পনাও করতে পারত না, কিন্তু একটা পশুর চামড়া কীভাবে তার গায়ে সেঁটে থাকে, কীভাবে তা ছাড়িয়ে নিতে হয়, মৌগলির তা খুব ভালো করে জানা ছিল। তবে কাজটা ছিল রীতিমতো কঠিন। এক ঘণ্টা ধরে মৌগলি তার ছুরি চালাল, নানা জায়গায় কাটাকুটি টানাটানি করল, মুখ দিয়ে নানা শব্দ করল, আর ওদিকে নেকড়ে দুটি জিভ বার করে সব দেখল, মৌগলির নির্দেশ অনুযায়ী সামনে এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করল।

একটু পরেই মৌগলি তার পিঠে একটা হাতের স্পর্শ পেল। গাদাবন্দুকের বলদেবকে দেখতে পেল সে। রাখাল বালকেরা গ্রামে গিয়ে মোষদের ক্ষ্যাপা আচরণের কথা প্রচার করে দিয়েছিল। বলদেব তা শুনে ভীষণ রেগে যায়। কেন মৌগলি তার পশুর পালের যথাযথ যত্ন নেয় নি? ও তাকে তিরস্কার করার জন্য দ্রুত চলে আসে। বলদেবকে আসতে দেখেই নেকড়ে দুটি চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।

বলদেব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এটা কী বোকামি হচ্ছে ? তুমি কি মনে কর যে তুমি একটা বাঘের চামড়া ছাড়াতে পারবে ? মোষগুলি ওকে কোথায় মারল ? আরে, এটা তো দেখছি সেই ল্যাংড়া বাঘটা! ওর জন্য তো একশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক আছে, মোষের পালকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছ আমরা সে কথা ভুলে যাব। তারপর এই বাঘের ছাল যখন আমি খানিওয়ারায় নিয়ে যাব তখন হয়তো পুরস্কারের একশো টাকা থেকে তোমাকে একটা টাকা দিতেও পারি। সে তার কোমরের কাছে গোঁজা চকমকি পাথর আর ইস্পাত হাতে নিয়ে বাঘের গোঁফ পুড়িয়ে দেবার জন্য নিচু হয়ে ঝুঁকল। স্থানীয় প্রায় সব শিকারিই তাদের মারা বাঘের গোঁফ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত, যেন সেই বাঘের প্রেতাত্মা তাদের পিছু না নেয়।

শের খানের একটা হাতের চামড়া তার ছুরি দিয়ে খসাতে খসাতে মৌগলি অস্ফুট গলায় বলল, তো পুরস্কার পাবার জন্য এই চামড়া নিয়ে তুমি খানিওয়ারায় যাবে আর আমাকে হয়তো তা থেকে একটা টাকা দেবে, তাই! আমার তো মনে হচ্ছে চামড়াটা আমার নিজেরই দরকার। এই বুড়ো, ওই আগুন এক্ষুণি সরিয়ে নাও।

গ্রামের প্রধান শিকারির সঙ্গে এটা কী ধরনের কথা ? মোষগুলির নির্বুদ্ধিতা আর তোমার কপালগুণ এই দুই মিশে বাঘটা মারা পড়েছে। ওটা সবে তার খাওয়া শেষ করেছে, ভরাপেট ছিল, নইলে এতক্ষণে এখান থেকে বিশ মাইল দূরে চলে যেত। এই ক্ষুদে ভিখিরীর বাচ্চা, তুমি চামড়াটা পর্যন্ত ঠিক মতো ছাড়াতে জানো না, আর আমাকে, বলদেবকে, তুমি বাঘের গোঁফ না পোড়াবার জন্য নির্দেশ দাও! পুরস্কারের এক আনাও আমি তোমাকে দেব না, তার পরিবর্তে আচ্ছা করে পিট্টি লাগাব। যাও, সরে পড়ো এই মরা বাঘের কাছ থেকে।

মৌগলি তখন বাঘের কাঁধের ছালটা ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। সে তীব্র কণ্ঠে বলল, আরে, আমাকে কি সারাটা দুপুর এই বুড়ো বাঁদরের সঙ্গে বকবক করে কাটাতে হবে ? আকেলা, এ লোকটা আমাকে খুব জ্বালাচ্ছে।

বলদেব তখনো শের খানের মাথার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল যে সে পাশের ঘাসের উপর চিৎপটাং হয়ে পড়ে আছে, আর তার বুকের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল ধূসর নেকড়ে, আর মৌগলি এক মনে বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে চলেছে যেন সারা ভারতে সে ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই।

দাঁতে দাঁত ঘসে মৌগলি বলল তুমি ঠিকই বলেছ, বলদেব, তুমি ওই পুরস্কারের এক আনাও আমাকে দেবে না। ওই ল্যাংড়া বাঘ আর আমার মধ্যে এটা একটা পুরনো লড়াই-এর জের আছে। অনেক অনেক দিনের পুরনো লড়াই এবং এখন সে লড়াই-এ আমি জিতেছি।

বলদেবের পক্ষে একথা বলতে হবে যে তার বয়স যদি আরো দশ বছর কম হতো আর জঙ্গলের মধ্যে সে যদি আকেলার মুখোমুখি হতো তখন সে নিঃসন্দেহে একটা চেষ্টা করত, কিন্তু এই নেকড়ে, যে মানুষ খেকো বাঘের সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে লিপ্ত একটা বালকের আদেশ মেনে চলে, সে তো সাধারণ কোনো জানোয়ার নয়। বলদেবের মনে হলো এসব একটা মায়া, সব চাইতে খারাপ ধরনের যাদু। তার গলায় যে তাবিজ ঝোলানো আছে সেটা তাকে রক্ষা করতে পারবে কিনা কে জানে। সে পাথরের মতো নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। তার মনে হলো মুহূর্তের মধ্যে মৌগলিও বোধহয় একটা বাঘে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

অবশেষে বলদেব ভাঙা গলায় কোনো রকমে ফিসফিস করে বলল, মহারাজ! রাজাধিপতি!

মৌগলি নিজের মুখ না ঘুরিয়েই চাপা হাস্যধ্বনির সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, কী বলবে?

আমি বুড়ো মানুষ, আপনি যে সামান্য এক রাখাল বালক নন, অন্যকিছু, আমি সেটা বুঝতে পারি নি, আমি কি এখন উঠে এখান থেকে চলে যেতে পারি, নাকি আপনার আজ্ঞাবহ দাস আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে?

যাও এবং শান্তিতে যাও। শুধু দ্বিতীয়বার আমার শিকার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না। ওকে যেতে দাও, আকেলা।

বলদেব যত দ্রুত বেগে সম্ভব গ্রামের দিকে লেংড়াতে লেংড়াতে ছুটল। মাঝে মাঝেই সে মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল, কী জানি মৌগলি নিজেকে আরো সাংঘাতিক কিছুতে রূপান্তরিত করে ফেলল কিনা! গ্রামে পৌঁছে যাদু আর মায়াবী ছলাকলার এক আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করল সে। তার কথা শুনে পুরোহিতের মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য নেমে এলো।

ওদিকে মৌগলি তার কাজ করে চলল। অবশেষে ধূসর ভাই আর আকেলার সাহায্যে সে যখন শের খানের বিরাট চামড়াটা তার দেহ থেকে পুরোপুরি খসিয়ে আনল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

এখন এই চামড়া কোথাও লুকিয়ে রেখে মোষের পাল নিয়ে আমাকে ঘরে ফিরতে হবে। আকেলা, মোষগুলিকে জড়ো করতে একটু সাহায্য কর।

গোধূলির আলো আঁধারের মধ্যে মোষের পালকে জড়ো করা হলো। তারা যখন গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন মৌগলি কুটিরে কুটিরে আলো জ্বলতে দেখল, মন্দিরে শাঁখ আর কাঁসার ঘণ্টা বাজছে শুনতে পেল। তার মনে হলো গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক তার জন্য গ্রামের প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করছে। সে মনে মনে বলল, আমি শেরখানকে মেরেছি, সেই জন্য এই আয়োজন। কিন্তু তখনই তার কানের পাশ দিয়ে বৃষ্টির মতো পাথরের টুকরা ছুটে যেতে শুরু করল। গ্রামবাসীরা চিৎকার করে বলছে, শয়তান যাদুকর নেকড়ের বাচ্চা! অরণ্যের দানো! চলে যাও! তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় হও, নইলে পুরোহিত তোমাকে আবার নেকড়ে বানিয়ে দেবেন। বলদেব, গুলি চালাও, গুলি চালাও!

তার পুরনো টাওয়ার গাদাবন্দুক থেকে সশব্দে একটা গুলি ছুটে এলো আর একটা মোষ মন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

গ্রামবাসীরা চেঁচিয়ে উঠল, আরো যাদুর খেল দেখাচ্ছে! ও গুলির গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। বলদেব, ওই মোষটা তো তোমার ছিল।

ততক্ষণে পাথরের শিলাবৃষ্টি আরো বেড়ে গিয়েছিল। বিভ্রান্ত বিমূঢ় মৌগলি বলল, এসব কী হচ্ছে?

শান্তভাবে বসে পড়ে আকেলা বলল, তোমার এই ভাইরা আমাদের জঙ্গলের দলের চাইতে খুব একটা ভিন্ন রকমের নয়। আমার মনে হচ্ছে গুলি ছোঁড়ার অর্থ একটাই। ওরা তোমাকে এখান থেকে বার করে দিতে চাইছে।

পুরোহিত এই সময় আবার চিৎকার করে উঠলেন, নেকড়ে! নেকড়ের বাচ্চা! পবিত্র তুলসী গাছের একটা ডাল হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন, ভাগো! চলে যাও এখান থেকে!

আবার? আগেরবার এরকম কাণ্ড ঘটে কারণ আমি ছিলাম মানুষ। আর এবার একই কাণ্ড ঘটছে কারণ আমি হলাম নেকড়ে। ঠিক আছে, চল আকেলা, যাওয়া যাক।

এমন সময় এক রমণী, মেসুয়া, সামনের দিকে ছুটে এসে চিৎকার করে বলল, ওহ্, আমার ছেলে, আমার ছেলে! ওরা বলছে তুমি নাকি যাদুকর, ইচ্ছা করলেই নিজেকে জানোয়ারে পরিণত করতে পার। আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু

তবু তুমি চলে যাও এখান থেকে, নইলে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। বলদেব বলছে তুমি যাদুকর, কিন্তু আমি জানি তুমি আমার নাথুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছ।

জনতা চেঁচিয়ে উঠল, ফিরে এসো, মেসুয়া। ফিরে এস, নইলে আমরা তোমার দিকেও পাথর ছুঁড়ে মারব।

একটা শিলাখণ্ড মৌগলির মুখের উপর এসে পড়ল। কর্কশ মৃদু হাস্যধ্বনি করে মৌগলি বলল, মেসুয়া, তাড়াতাড়ি দৌড়ে ফিরে যাও। সন্ধ্যা বেলায় বড় গাছটার নিচে বসে ওরা যেসব আজগুবি গালগল্প করে এটাও সেইরকম একটা গল্প। আমি কোনো যাদুকর নই, মেসুয়া। তবে আমি অন্তত তোমার ছেলের প্রাণের মূল্য পরিশোধ করেছি। বিদায়! এখন তাড়াতাড়ি ছুট লাগাও, কারণ ওদের ইটপাথরের বন্যার চাইতেও দ্রুত বেগে ওদের দিকে আমি এখনই মোষের পালকে ছুটিয়ে দেব। বিদায়, মেসুয়া।

মৌগলি উচ্চ কণ্ঠে বলল, তাহলে, আকেলা, আরেকবার মোষের পালকে নিয়ে আসো।

মোষগুলি গাঁয়ে ঢুকবার জন্য উদগ্রীব হয়েই ছিল। আকেলার তর্জনের কোনো দরকার ছিল না। তারা প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঢুকে গেল। জনতা দিশেহারা হয়ে ডানে-বাঁয়ে ছিটকে পড়ল।

মৌগলি ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে বলল, শুনে নাও। কী জানি আমি হয়তো একটা মোষ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি। ভালো করে শুনে নাও, কারণ আর আমি কখনো তোমাদের গরু-মোষ চরাব না। বিদায় মানবসন্তানরা, ভালো থেকো। আর আমি যেন আমার নেকড়েদের সঙ্গে নিয়ে গাঁয়ের রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তোমাদের শিকার না করে বেড়াই সেজন্য মেসুয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকো।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ নেকড়েকে পাশে নিয়ে চলতে শুরু করল। উপর দিকে তাকিয়ে আকাশে নক্ষত্রমালা দেখতে দেখতে তার মন খুশিতে ভরে উঠল। আর আমাকে ওই ফাঁদের মতো জায়গায় ঘুমাতে হবে না। চল, শের খানের চামড়াটা নিয়ে আমরা চলে যাই। না, আমরা গাঁয়ের কোনো ক্ষতি করব না, কারণ মেসুয়া সর্বদা আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে।

ততক্ষণে প্রান্তরের উপরে চাঁদ উঠেছে। সমস্ত জায়গাটা দুধের মতো সাদা দেখাচ্ছে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা মৌগলিকে চলে যেতে দেখল। তার সঙ্গে

চলেছে দুটো নেকড়ে আর তার মাথার উপর একটা পুঁটুলি। নেকড়ের দ্রুত দুলকি চালে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতি আগুনের মতো মাইলের পর মাইলকে গিলে ফেলে। গ্রামবাসীরা তখন আগের চাইতেও জোরে তাদের শাঁখে ফুঁ দিল, মন্দিরের ঘণ্টা বাজাল, আর মেসুয়া কাঁদতে থাকল, আর বলদেব রঙের পর রং চড়িয়ে তার অরণ্যের নানা অভিযানের কথা বলতে লাগল এবং শেষ করল এই বলে যে আকেলা এক পর্যায়ে তার পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং কথা বলেছিল মানুষের ভাষায়।

মৌগলি আর নেকড়ে দুটি যখন দলীয় সভামঞ্চের টিলার কাছে এসে পৌঁছল তখন চাঁদ সবেমাত্র অস্ত যাচ্ছে। তারা মা-নেকড়ের গুহার কাছে এসে থামল।

মৌগলি চেঁচিয়ে বলল, মা, ওরা আমাকে মানুষের দল থেকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু আমি আমার প্রতিশ্রুতি মতো শের খানের চামড়া নিয়ে এসেছি। মা-নেকড়ে ঋজু পায়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। পেছন পেছন এলো তার শাবকরা। বাঘের ছালটা দেখে মা-নেকড়ের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

ছোট্ট ব্যাঙ আমার, যেদিন সে তোমাকে মারবার জন্য এই গুহার মধ্যে তার মাথা আর কাঁধ ঠেসে ঢুকাতে চেয়েছিল আমি সেদিনই বলেছিলাম যে শিকারিই একদিন নিজে শিকার হবে। সাবাশ তোমাকে।

ঝোপের ভেতর থেকে একটা ভারি গভীর গলা শোনা গেল, সাবাশ, ছোট ভাইটু। তোমাকে ছাড়া এই অরণ্য আমাদের কাছে বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেছে। বলতে বলতে বাঘিরা ছুটে এসে মৌগলির পায়ের কাছে বসে পড়ল। তখন তারা এক সঙ্গে দলীয় সভার টিলামঞ্চে উঠল, আর আকেলা যেখানে এক সময় বসত সেখানে সমতল শিলাখণ্ডের উপর শের খানের চামড়াটা বিছিয়ে দিল। তারপর মৌগলি চারটা তীক্ষ্ণ বাঁশের কঞ্চি এনে চামড়াটা চারপাশে শক্ত করে আটকে দিল। আকেলা তখন তার উপর গা এলিয়ে দিয়ে পুরনো দিনের মতো সভার ডাক দিল। হে নেকড়ের দল, দেখ, ভালো করে, দেখ! মৌগলিকে প্রথম এখানে উপস্থিত করার সময় সে যে আহ্বান জানিয়েছিল এখনো ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে সে এই আহ্বান জানাল।

আকেলাকে দলপতিচ্যুত করার পর থেকে দলের কোনো নেতা ছিল না। সবাই নিজের নিজের খুশিমতো শিকার আর লড়াই করত। কিন্তু অভ্যাসের বসে তারা আকেলার আহ্বানে সাড়া দিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফাঁদে পড়ে

খোঁড়া হয়ে গেছে, কেউ কেউ বন্দুকের গুলি পায়ে লাগার ফলে খুঁড়িয়ে চলছে, আজেবাজে খাবার খাওয়ার ফলে কারো গায়ে ঘা হয়েছে, চামড়ার রোঁয়া উঠে গেছে, আর অনেকে হারিয়েই গেছে। কিন্তু যারা ছিল তারা সবাই সভার টিলামঞ্চে এল। তারা শিলাখণ্ডের ওপর বিছানো দেখল শের খানের ডোরাকাটা চামড়া, তার বিশাল থাবায় নখগুলি দেখা যাচ্ছে, তার শূন্য পাগুলি ঝুল ঝুল করে ঝুলছে। এই সময়ে মৌগলি একটা গান বানিয়ে ফেলল, কোনো রকম ছন্দ ছাড়াই। গানটা আপনা থেকেই তার গলায় উঠে এলো, আর সে ওই গান গেয়ে উঠল চিৎকার করে, ঝমঝম শব্দ করা বাঘের চামড়ার উপর লাফাতে লাফাতে, তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে তাল ঠুকতে ঠুকতে। অবসন্ন হয়ে বসে না পড়া পর্যন্ত সে গেয়ে চলল, আর ধূসর ভাই এবং আকেলা গানের ফাঁকে ফাঁকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

গান শেষ হবার পর মৌগলি বলল, ভালো করে দেখ, নেকড়ের দল। আমি কি আমার কথা রেখেছি? নেকড়েগুলি জবাব দিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

একটা রোগাপটকা নেকড়ে ডাক ছেড়ে বলল, ও আকেলা, আবার তুমি আমাদের নেতৃত্ব দাও। ও মানবসন্তান, আইন-শৃঙ্খলা বলে এখন এখানে কিছু নেই। এ অবস্থা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমরা আবার মুক্ত স্বাধীন প্রাণী হতে চাই।

বাঘিরা গরগর করে বলল, না, তা আর হবার নয়। যখনই তোমাদের উদর পূর্তি হবে তখনই হয়তো আবার তোমাদের মাথায় পাগলামি চাড়া দেবে। খামোকা তোমাদের স্বাধীন প্রাণী নাম দেয়া হয় নি। স্বাধীনতার জন্য তোমরা লড়াই করেছ এবং স্বাধীনতা এখন তোমাদের করায়ত্ত। যাও, ওটা খাও গিয়ে, নেকড়ের দল।

মৌগলি বলল, মানুষের দল আর নেকড়ের দল উভয়ই আমাকে বার করে দিয়েছে। এখন থেকে আমি অরণ্যে একাই শিকার করব।

চারটি নেকড়ে শাবক বলল, আর আমরা শিকার করব তোমার সাথে।

ওই দিন থেকে মৌগলি চার নেকড়ে শাবককে নিয়ে শিকার করতে লাগল। কিন্তু সে সব সময় একা থাকে নি, কারণ কয়েক বছর পর সে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠে এবং তখন সে বিয়ে করে।

কিন্তু সেটা অন্য গল্প, বড়দের জন্য।

অরণ্যের অনুপ্রবেশ

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, দলীয় সভার টিলামঞ্চে শের খানের চামড়া বিছিয়ে আটকে দেবার পর সিওনি দলের যে সব প্রাণী তখনো

অবশিষ্ট ছিল তাদের লক্ষ্য করে মৌগলি বলেছিল, এখন থেকে সে একাই অরণ্যে শিকার করবে, আর মা ও বাবা-নেকড়ের চারটি সন্তান তখন বলেছিল যে তারাও তার সঙ্গে শিকার করবে। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে কারো পক্ষেই তার সারা জীবনের অভ্যাস পাল্টে দেওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে অরণ্যে। বিশৃঙ্খল দলের সদস্যরা যখন এদিক ওদিক সটকে পড়ল তখন মৌগলি সর্বপ্রথম যে কাজটা করল তা হলো এই : সে তার গুহা-গৃহে গিয়ে একটা গোটা দিন ও একটা গোটা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল। তারপর সে তার মা ও বাবা নেকড়েকে মানুষের আস্তানায় তার অভিযানের কথা বলল, যতটুকু তারা বুঝতে পারবে ততটুকু। যে ছুরিটা দিয়ে সে শের খানের চামড়া ছাড়িয়েছিল তার উপর সকালের সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করে উঠল। মা ও বাবা নেকড়ে বলল, সে তাহলে বেশ কিছু শিখেছে। তারপর খাড়ি-উপত্যকায় মোষবাহিনীর বিশাল আক্রমণে আকেলা আর ধূসর ভাই তাদের ভূমিকার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করল। বালু এসব শোনার জন্য বেশ পরিশ্রম করে উপরে উঠে এসেছিল, আর মৌগলির সার্থক যুদ্ধ পরিচালনার বৃত্তান্ত শুনে বাঘিরা আনন্দে গড়াগড়ি দিয়ে নিজের সারা গায়ে চাপড় লাগালো।—

অনেকক্ষণ আগে সূর্য উঠে গেলেও কেউ ঘুমাতে যাবার কথা চিন্তা করল না। এই সব কথাবার্তার সময় মা-নেকড়ে থেকে থেকে তার মাথা উঁচু করে একটু পেছনে হেলিয়ে টিলামঞ্চে বিছানো শের খানের চামড়ার হাওয়ায় ভেসে আসা গন্ধ গভীর সন্তোষের সঙ্গে নাকে টেনে নিচ্ছিল।

কাহিনীর শেষে মৌগলি বলল, কিন্তু এই আকেলা আর ধূসর ভাই না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। ওহ্, মা, মা, কালো বিশাল ষাঁড়গুলি যখন উপত্যকার নিচের দিকে প্রবল বেগে ছুটে নামছিল, কিংবা মানুষের দল আমার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারার পর ওরা গ্রামের প্রবেশদ্বার দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো যেভাবে ঢুকে গেল সে দৃশ্য যদি তুমি দেখতে!

মা-নেকড়ে কঠিন গলায় বলল, শেষ দৃশ্যটি যে আমাকে দেখতে হয় নি সে জন্য আমি খুশি। আমার বাচ্চাদের কেউ শেয়ালের মতো এদিক ওদিক তাড়িয়ে বেড়াবে সেরকম দৃশ্য সহ্য করার অভ্যাস আমার নেই। মানুষের দল থেকে আমি এর দাম আদায় করে নিতাম, তবে যে রমণীর দুধ তুমি পান করেছ তাকে রেহাই দিতাম। হ্যাঁ, একমাত্র তাকেই আমি রেহাই দিতাম।

বাবা-নেকড়ে অলসভাবে বলল, শান্ত হও, রক্ষা, শান্ত হও। আমাদের ব্যাঙ আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে, আর এতটাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়ে এসেছে যে ওর বাবাকে তার পা চাটতে হবে। তাছাড়া মাথা একটু আধটু কেটে ছিঁড়ে গেলে কী হয় তাতে ? মানুষের চিন্তা বাদ দাও। বালু ও বাঘিরা উভয়েই তার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, মানুষের চিন্তা বাদ দাও।

মা-নেকড়ের পার্শ্বদেশে নিজের মাথা রেখে পরিতৃপ্ত কণ্ঠে মৌগলি বলল, তার নিজের কথা যদি বলতে হয় তাহলে সে আর কখনো মানুষকে দেখতে বা তার গলা শুনতে বা তার গায়ের গন্ধ পেতে চায় না।

আকেলা তার একটা কান উঁচু করে বলল, কিন্তু, ছোট ভাই, মানুষ যদি তোমাকে তোমার নিজের মতো থাকতে না দেয়, মানুষ যদি তোমাকে ছেড়ে না দেয় ?

ধূসর ভাই তার চারপাশে তাকিয়ে বলল, আমরা পাঁচজন আছি! পাঁচজন কথাটা বলার সময় সে দাঁতে দাঁত ঘষল।

বাঘিরা মাটিতে তার লেজ সামান্য আছড়ালো, একটা মৃদু হুশ হুশ শব্দ উঠল। বালুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমরাও হয়তো ওই শিকারে যোগ দেব। কিন্তু আকেলা, এখন মানুষের কথা ভাবছো কেন!

নিঃসঙ্গ নেকড়ে বলল, কারণ আছে। হলুদ চোরটার চামড়া শিলার উপর বিছানো হবার পর আমি আমাদের পদচিহ্ন ধরে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলাম। আমি আমাদের আগের পায়ের ছাপের উপর পা ফেলে, কখনো এপাশ ওপাশ করে, কখনো গড়াগড়ি দিয়ে একটা জটপাকানো চিহ্নরেখা তৈরি করি, যেন কেউ সহজে আমাদের অনুসরণ করতে না পারে। কিন্তু আমি সবকিছু এমনই গোলমাল করে ফেলেছিলাম যে নিজেই প্রায় পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এক সময় আমি মং বাদুড়কে দেখলাম। গাছের মধ্য দিয়ে উড়ে এসে আমার উপর ঝুলতে ঝুলতে সে খবর দিল, মানুষদলের গ্রাম, যে গ্রাম থেকে ওরা মানবসন্তানকে বার করে দেয়, সে গ্রামে এখন ভীমরুলের চাকের মতো গুঞ্জন উঠেছে।

মৌগলি হাসতে হাসতে বলল, আমি বেশ একটা বড় পাথর ছুড়ে মেরেছিলাম যে! সে প্রায়ই মজা করার জন্য ভীমরুলের চাকে পাকা পেঁপে ছুড়ে দিয়ে, ভীমরুলের দল তাকে আক্রমণ করার আগেই, এক ছুটে কাছের কোনো জলাশয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

আকেলা বলল, আমি মংকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কী দেখেছে। মং জানাল, সে গ্রামের প্রবেশদ্বারে লাল ফুলকে গনগন করে জ্বলতে দেখছে। তার চারপাশে বন্দুক হাতে নিয়ে কয়েকজন মানুষ বসে আছে। আকেলা তার গায়ের শুকিয়ে যাওয়া পুরনো ক্ষত চিহ্নের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খুব ভালো করে জানি মানুষ মজা করার জন্য বন্দুক হাতে তুলে নেয় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই, ছোট ভাই, বন্দুক হাতে একটা মানুষ আমাদের চিহ্নরেখা ধরে এগিয়ে আসবে, যদি না সে ইতোমধ্যেই তার যাত্রা শুরু করে দিয়ে থাকে।

মৌগলি রেগে গিয়ে বলল, কিন্তু কেন ? মানুষের দল তো আমাকে বার করে দিয়েছে ? আর কী চাই ওদের ?

আকেলা পাল্টা প্রশ্ন করল, ছোট ভাই, তুমি নিজে তো একটা মানুষ। আমরা স্বাধীন শিকারি, মানুষ কী করে, কেন করে, সেটা তো তুমি আমাদের বলবে। সে কথা তো আমাদের বলার নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মৌগলির চামড়া ছিলবার ছুরিটা পাশের মাটিতে অনেকখানি গেঁথে গেল। আকেলা তার থাবাটা অবশ্য এর আগেই বিদ্যুৎগতিতে সরিয়ে নিয়েছিল, সাধারণ মানুষের চাইতে অনেক বেশি দ্রুততার সঙ্গে মৌগলি আঘাত হানতে পারত, তবু নেকড়ে তো নেকড়েই।

ছুরিটা খাপে ঢুকাতে ঢুকাতে মৌগলি আস্তে আস্তে বলল, এর পর আর কখনো মানুষ আর মৌগলির নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করবে না, ঠিক আছে ?

ছুরি যেখানে মাটিতে কেটে বসেছিল সে জায়গাটা স্পর্শ করে আকেলা বলল, কী তীক্ষ্ণ দাঁত রে, বাবা। তবে, ছোট ভাই, মানুষের দলে থেকে তোমার চোখের ধার একটু কমে গেছে। আমাকে আঘাত করতে তুমি যেটুকু সময় নিলে আমি তার মধ্যে একটা হরিণ শিকার করে ফেলতে পারতাম।

এই সময় বাঘিরা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, যতটা সম্ভব ততটা পেছনে তার মাথা হেলিয়ে দিল, নাক দিয়ে শুঁকলো কোনো গন্ধ, আর তার গোটা শরীর টানটান হয়ে উঠল। ধূসর ভাইও তার দৃষ্টান্ত দ্রুত অনুসরণ করল, বাঘিরার একটু বাঁয়ে দাঁড়িয়ে ডান দিক থেকে আসা বাতাসের গন্ধ শুঁকল, আর আকেলা প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনের দিকে লাফিয়ে ছুটে গেল, অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে। তারও সারা শরীর টানটান হয়ে উঠেছে। মৌগলি ঈর্ষার সাথে ওদের দেখল। তার নাকের মতো অত তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি খুব কম মানুষেরই ছিল, তবু অরণ্যের প্রাণীর নাকে যে অবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণ শক্তি থাকে সেটা তার ছিল না। তার উপর

মানুষের সাহচর্য তিন মাসে তাকে অনেকখানি পেছনে ঠেলে দিয়েছিল। যাই হোক, সে তার আঙুল ভিজিয়ে নিজের নাক ঘষল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উপরের দিক থেকে আসা গন্ধটা কিসের সেটা বুঝতে চেষ্টা করল। খুব ক্ষীণ হলেও সে ঠিকই বুঝল গন্ধটা কিসের।

আকেলা নিজের পাছার উপর বসে গরগর করে বলল, মানুষ!

মৌগলি বসে পড়ে বলল, বলদেব! সে আমাদের চিহ্নরেখা অনুসরণ করে এখানে চলে এসেছে। ওই যে তার বন্দুকের উপর সূর্যের আলো ঝলসে উঠছে।

এক ঝলক সূর্যালোক মাত্র, এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য, বলদেবের গাদাবন্দুকের পিতল-তামার বন্ধনীর উপর এসে পড়েছিল। কিন্তু অরণ্যে ঊর্ধ্বাকাশে মেঘমালা যখন ছুটে যায় সেই সময় ছাড়া আর কখনো ওই রকম ঝলসানি দেখা যায় না। ওই সময় এক খণ্ড অভ্র, কিংবা ছোট্ট একটা জলাশয়, এমনকি খুব মসৃণ একটা গাছের পাতাও একটা হেলিওগ্রাফের মতো ঝলসে উঠতে পারে। কিন্তু আজ কোথাও কোনো মেঘ ছিল না, সব কিছু ছিল নিশ্চল নিস্তরঙ্গ।

আকেলা বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, আমি জানতাম মানুষেরা আমাদের পেছনে আসবে। আমি খামোকা দলের নেতৃত্ব দিই নি।

চার বাচ্চা-নেকড়ে কিছু বলল না, কিন্তু তারা মাটিতে প্রায় পেট লাগিয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটে গেল। কাঁটা আর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা ছুছুন্দরীর মতো তারা মিলিয়ে গেল।

মৌগলি চেঁচিয়ে ডাকল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা, তাও আবার কিছুই না বলে?

ধূসর ভাই জবাব দিল, শ্‌স্। আজ দুপুরের আগেই এখানে আমরা ওর মাথার খুলি নিয়ে খেলা করব।

মৌগলি চিৎকার করে ডাকল, ফেরো! ফিরে এসো! অপেক্ষা করো। মানুষ মানুষ খায় না!

চার বাচ্চা-নেকড়ে মুখ গোমড়া করে ফিরে এসে মাটিতে বসে পড়ল আর আকেলা বলল, একটু আগে কে নেকড়ে ছিল? সে মানুষ হতে পারে একথা বলায় কে আমাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিল?

মৌগলি আগুন হয়ে বলল, আমাকে কি আমার সব কাজের কারণ ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?

বাঘিরা চাপা গলায় বলল, এই হলো মানুষ! মানুষ এইভাবেই কথা বলে! উদয়পুরে খাঁচার চারপাশে আমি যে মানুষদের দেখেছি তারাও এরকম করেই কথা বলতো। আমরা অরণ্যের প্রাণীরা জানি যে জ্ঞানবুদ্ধিতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা যদি আমাদের কাজকে বিশ্বাস করতাম তাহলে আমাদের জানা উচিত যে মানুষ হচ্ছে সবার চাইতে বেশি মূর্খ ও নির্বোধ। গলা তুলে সে যোগ করল, মানবশিশু একটা কথা ঠিক বলেছে। মানুষ শিকার করে দল বেঁধে। অন্যরা কী করবে সেটা না জেনে একটি মানুষকে মারা হবে বাজে শিকার। চল, ওই লোকটা আমাদের কী করতে চায় দেখা যাক।

ধূসর ভাই চাপা গর্জন করে বলল, তুমি একাই শিকার কর, ছোট ভাই। আমরা আমাদের মন জানি। এতক্ষণে ওর মাথার খুলি এখানে নিয়ে আসার জন্য তৈরি হয়ে পড়ে থাকত।

মৌগলি এতক্ষণ পরপর তার বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তার বুক ওঠানামা করছে, তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে নেকড়েগুলির দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা হাঁটু গেড়ে বসে বলল, আর আমি আমার মন জানি না ? আমার দিকে তাকাও!

নেকড়েগুলির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিল। তাদের দৃষ্টি চারিদিকে ঘোরাফেরা করল। মৌগলি বারবার তার দিকে তাদের চোখ ফেরাতে বলল। শেষে তাদের গায়ের সব রোম খাড়া হয়ে উঠল, তাদের সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করল, আর মৌগলি অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েই থাকল।

সে বলল, তো আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে কে দলপতি ?

ধূসর ভাই বলল, তুমি দলপতি, ছোট ভাই। সে মৌগলির পা চেটে দিল।

মৌগলি বলল, তাহলে এসো আমার পেছন পেছন। ওরা চারজন নিজেদের পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে মৌগলিকে অনুসরণ করল।

বাঘিরাও তাদের পেছন পেছন আসতে আসতে বলল, মানুষের দলে বাস করার এই ফল হয়েছে। এখন জঙ্গলের আইনের পরেও আরো অন্য জিনিস আছে, বালু।

বুড়ো ভালুক কিছু বলল না, কিন্তু তার মনের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু চিন্তা খেলে গেল।

মৌগলি বলদেবের পথের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক সময় ঝোপঝাড় সরিয়ে সে বৃদ্ধ শিকারিকে

দেখতে পেল। বন্দুক কাঁধে নিয়ে গতরাতের চিহ্নরেখা ধরে সে কুকুরের দুলকি চালে ছুটে চলেছে।

তোমাদের মনে আছে যে মৌগলি যখন শের খানের কাঁচা চামড়ার ভারি বোঝাটা কাঁধে নিয়ে আসছিল, তখন তার পেছনে ছুটে এসেছিল আকেলা ও ধূসর ভাই। ফলে তিনজোড়া পায়ের ছাপ স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। এর একটু পরেই বলদেব সেই জায়গায় এসে পৌঁছল যেখানে আকেলা ফিরে গিয়ে সব চিহ্নরেখাগুলি এলোমেলো করে গুলিয়ে দিয়েছিল। বলদেব ওখানে বসে পড়ল, কাশল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, চিহ্নরেখা খুঁজে পাবার জন্য এদিক ওদিক তাকাল, আর এই সারাটা সময় মৌগলিরা তার এত কাছে থেকে তার উপর নজর রাখছিল যে বলদেব ইচ্ছা করলেই তাদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে পারত। কোনো নেকড়ে যদি চাইত যে তার উপস্থিতি কেউ টের পাবে না তাহলে অরণ্যের অন্য কোনো প্রাণীই তার মতো নীরব নিস্তব্ধ হতে পারত না। নেকড়েদের ধারণায় মৌগলির নড়াচড়া এলোমেলো আর অগোছালো, কিন্তু আসলে মৌগলিও যাওয়া-আসা করতে পারত একটা ছায়ার মতো। একটা দ্রুত ধাবমান জাহাজকে যেমন মাঝে মাঝে এক দঙ্গল শুশুক ঘিরে ফেলে ওরা এখন বলদেবকে ওইভাবে ঘিরে ফেলল। ওরা নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু এত নিচু লয়ে যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না পেলে কোনো মানুষের পক্ষেই সে শব্দ শোনা সম্ভব ছিল না।

বলদেবকে দেখা গেল সে নিচু হচ্ছে, চোখ সরু করে এদিক ওদিক দেখছে, হাঁসফাঁস করছে, আর ধূসর ভাই বলল, এর চাইতে উত্তম শিকার আর হয় না। ওকে দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে নদীর ধারে পথ হারানো একটা শুয়োরের মতো। বলদেবকে হিংস্রভাবে কী একটা বিড় বিড় করে বলতে দেখে ধূসর ভাই জিজ্ঞাসা করল, কি বলছে ও ?

মৌগলি অনুবাদ করে দিল। ও বলছে যে নেকড়ের দল নিশ্চয়ই আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে নেচেছে। বলছে যে তার জীবনে সে এই রকম চিহ্নরেখা কখনো দেখে নি। বলছে যে সে খুব ক্লান্ত।

বাঘিরা প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, চিহ্নরেখা আবার খুঁজে পাবার আগেই তার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সে একটা গাছের গুঁড়ির চারপাশ দিয়ে একটা চক্কর দিল যেন কানামাছি খেলছে। তো ওই রোগা লোকটা এখন কী করছে ?

কিছু খাচ্ছে কিংবা মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। মানুষেরা সব সময়ই তাদের মুখ দিয়ে খেলা করে। মৌগলির কথা শুনে নীরব অনুসরণকারীরা বুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখল যে সে একটা হুঁকোতে আগুন দিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে টানছে। ওরা তামাকের গন্ধটা খুব ভালো করে খেয়াল করে রাখল যেন প্রয়োজন হলে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যেও তারা বলদেবের উপস্থিতি টের পায়।

একটু পরেই কাঠকয়লা-পোড়ানিয়াদের একটা ছোট্ট দল ওই পথে এসে পড়ল। স্বাভাবিকভাবেই তারা বলদেবের সঙ্গে কথা বলবার জন্য তার সামনে একটু দাঁড়াল। শিকারি হিসেবে বলদেবের খ্যাতি চারপাশে অন্তত বিশ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওরা বলদেবের পাশে বসে সবাই মিলে ধূমপান করল, বাঘিরা আর অন্যান্যরা আরো একটু কাছে সরে এসে সব কিছু দেখতে থাকল, আর বলদেব শয়তান-শিশু মৌগলির কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের শোনাতে লাগল, নিজের কল্পনার সাহায্যে তার কাহিনীতে নানা নতুন নতুন সংযোজন করল। কীভাবে সে নিজে শের খানকে মেরেছিল, মৌগলি কীভাবে নিজেকে একটা নেকড়েতে রূপান্তরিত করেছিল, পুরো একটা বিকেল সে কীভাবে বলদেবের সঙ্গে লড়েছিল, তারপর সে কীভাবে আবার মানবশিশুতে পরিণত হয়ে যায়, তারপর বলদেবের বন্দুককে পর্যন্ত সে যাদু করে ফেলে, যার ফলে মৌগলির দিকে তাক করা গুলি দিক-পরিবর্তন করে বলদেবের নিজের একটা ষাঁড়কে মেরে ফেলে— অবলীলাক্রমে সে এই সব গল্প বলে গেল। গ্রামের লোক সবাই তাকে সিওনি অঞ্চলের সব চাইতে সাহসী শিকারি বলে জানত, তাই তারা ওই শয়তান-শিশুকে মারবার জন্য তাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে গ্রামবাসীরা ওই শয়তান-শিশুর মা-বাবা মেসুয়া আর তার স্বামীকে তাদের নিজেদের কুটিরে আটকে রেখেছে। শিগগিরই ওদের উপর নির্যাতন চালিয়ে ওরা যে ডাইনি আর যাদুকর এই স্বীকারোক্তি ওদের কাছ থেকে আদায় করবে, তারপর ওদের পুড়িয়ে মারা হবে।

কাঠকয়লা-পোড়ানিয়ারা জিজ্ঞাসা করল, কখন ? ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য তারা খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে।

বলদেব জানাল যে সে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না। গ্রামবাসীদের ইচ্ছা সে আগে অরণ্য-বালকটিকে খতম করবে। তারপর তারা মেসুয়া ও তার স্বামীকে হত্যা করে তাদের জমিজমা ও মোষগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেবে। মেসুয়ার স্বামীর কয়েকটা খুব ভালো মহিষ আছে। বলদেবের মতে যাদুকরদের শেষ করে দেয়া অতি উত্তম কাজ। আর যারা

জঙ্গল থেকে আসা নেকড়ের বাচ্চাদের আদরযত্ন করে তাদের মতো খারাপ ডাইনি আর হয় না।

কিন্তু, কাঠকয়লা-পোড়ানিয়ারা বলল, ইংরেজরা যদি এই খবরটা শোনে? ওরা শুনেছে ইংরেজরা একেবারে পুরো পাগল, সৎ চাষীদেরকেও শান্তিতে ডাইনিদের পুড়িয়ে মারতে দেয় না।

বলদেব বলল, গাঁয়ের মোড়ল বলবে যে মেসুয়া আর তার স্বামী সাপের কামড়ে মারা গেছে। ওসব আগেই ঠিক করা আছে। এখন শুধু নেকড়ে-বালকটিকে মারা বাকি। ওরকম কাউকে তারা দেখেছে কি?

কাঠকয়লা-পোড়ানিয়ারা সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে, না, ওরকম কাউকে তারা দেখে নি। তবে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে যদি কেউ তাকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে তা বলদেবের মতো একজন সাহসী মানুষই পারবে। ইতোমধ্যে সূর্য অনেকখানি নেমে এসেছে। ওদের মনে হলো ওদের এখনই তাড়াতাড়ি করে বলদেবদের গ্রামে গিয়ে ডাইনিটাকে দেখা উচিত। বলদেব বলল, শয়তান শিশুটিকে হত্যা করা যদিও তার কর্তব্য তবু এই রকম নিরস্ত্র এক দল মানুষকে সে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এইভাবে যেতে দিতে পারে না। নিরাপত্তা দেবার জন্য সে সঙ্গে না থাকলে নেকড়ে শয়তানটা যে কোনো মুহূর্তে দেখা দিতে পারে। তাই সে তাদের সঙ্গে থাকবে, আর ডাইনির বাচ্চাটা যদি এসে হাজির হয় তাহলে সিওনির সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারি ওইরকম পরিস্থিতির কীভাবে মোকাবেলা করে সেটা সে ওদের দেখিয়ে দেবে। ব্রাহ্মণ পূজারী তাকে একটা যাদুমন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে। সে-মন্ত্র ওই জাতীয় প্রাণীর হাত থেকে তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখবে।

কয়েক মিনিট পর পরই নেকড়েগুলি জিজ্ঞাসা করছিল, ও কী বলছে? ও কী বলছে? মৌগলি বলদেবের কথা ওদের জন্য অনুবাদ করে দিচ্ছিল, কিন্তু ডাইনি-পর্বে এসে সে ব্যাপারটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারল না। সে শুধু বলল যে মেসুয়া আর তার স্বামী, যারা তার সঙ্গে খুব সদয় ব্যবহার করেছিল, তাদের ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে।

বাঘিরা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে মানুষও মানুষকে ফাঁদে ফেলে?

মৌগলি বলল, ও তো তাই বলল। ওর এসব কথা আমি বুঝতে পারি না। মেসুয়া আর তার স্বামী আমাকে নিয়ে কী করেছে যার জন্য তাদের ফাঁদে

আটকাতে হবে ? আর এই লাল ফুলের কী কথা ? আমাকে খোঁজ নিতে হবে। যাই হোক, মেসুয়াকে ওরা যাই করতে চায় বলদেব না ফেরা পর্যন্ত সেটা হবে না। অতএব— তার ছুরির বাটে হাত বুলাতে বুলাতে মৌগলি গভীর ভাবনায় ডুবে গেল, আর বলদেব এবং কাঠকয়লা-পোড়ানিয়ারা বীরদর্পে মিছিলের মতো একজনের পেছনে একজন করে চলে গেল।

অবশেষে মৌগলি বলল, আমি এখুনি ছুটে চললাম মানুষ-দলের কাছে।

ধূসরভাই কাঠকয়লা পোড়ানিয়াদের বাদামি পৃষ্ঠদেশের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল, আর ওরা ?

মৌগলি হাসতে হাসতে বলল, ওদেরকে গানের ধাক্কায় বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। আমি চাই না যে অন্ধকার হবার আগে ওরা গ্রামের প্রবেশদ্বারে পৌঁছাক। তুমি কি ওদের আটকে রাখতে পারবে ?

ধূসর ভাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ সাদা দাঁত বের করে বলল, মানুষকে আমি যতটুকু চিনি তাতে বলতে পারি যে ইচ্ছা করলে আমি ওদের খোঁটায় বাঁধা ছাগলের মতো একই জায়গার চারপাশে ঘোরাতে পারব।

না, তার দরকার নেই আমার। ওদেরকে একটু-আধটু গান শোনাবে, নইলে এই নির্জন পথে ওদের খুব একা একা মনে হতে পারে। আর, ধূসর ভাই, খুব মিষ্টি গান হবার দরকার নেই। বাঘিরা, তুমিও সঙ্গে যাও, ওই গান রচনায় সাহায্য করো। তারপর রাত ভালো করে নামলেই গ্রামের মুখে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হবে। ধূসর ভাই জায়গাটা চেনে।

মানবশিশুর পক্ষ নিয়ে শিকার পরিচালনা করা হালকা কর্ম নয়। আমোদের সম্ভাবনায় তার চোখে খুশির আভাস ফুটে উঠলেও বাঘিরা হাই তুলে উপরের উক্তিটি করার পর বলল, আমি ঘুমাব কখন ? ন্যাংটা মানুষদের উদ্দেশে আমাকে গান করতে হবে ? ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখা যাক।

সে তার মাথা একটু নিচু করল যেন শব্দটা অনেক দূর যায়, তারপর সে একটা লম্বা শুভ শিকার-এর ডাক দিল, অপরাহ্নেই একটা মধ্যরাত্রির ডাক। শুরুতেই সেটা ছিল ভয়ঙ্কর। মৌগলি ওই ধ্বনিকে গমগম করে উঠতে শুনল, সেটা আরো উচ্চকিত হলো, তারপর একটু নিচু লয়ে নেমে এলো, আর মৌগলি অরণ্যের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আপন মনে হেসে উঠল। সে দেখল যে কাঠকয়লা পোড়ানিয়ারা আতঙ্কে একজায়গায় গুটি পাকিয়ে রয়েছে, আর বলদেবের বন্দুকের নল একটা কলা পাতার মতো কাঁপছে, যেন এক সঙ্গে

তারা তাদের মুখ দিয়ে খেলা করে আর তারা দুর্বলকে হত্যা করে খাবার জন্য নয়, ফুর্তির জন্য।

কম্পাসের সবগুলি দিক-নির্দেশ করছে। ধূসর ভাই ইয়া-লা-হি! ইয়ালাহা! বলে চিৎকার করে উঠল। বিশালদেহী নীলগাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় নেকড়ের দল এই আওয়াজ তোলে। এই ধ্বনি মনে হলো পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে, কাছে, আরো কাছে, আরো কাছে, অবশেষে হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারের পর তা থেমে গেল। অন্য তিনজন এর উত্তর দিল, আর মৌগলির পর্যন্ত মনে হলো অরণ্যের গোটা নেকড়েকুল যেন তাদের সর্বোচ্চ কণ্ঠে ডেকে উঠেছে। এর পর তারা অরণ্যের চমকপ্রদ প্রভাতসঙ্গীত ধরল। লয়-তালের বিস্তারে, সুরের ওঠানামায়, কণ্ঠের নানা কারুকাজে তা ছিল অপূর্ব।

ভীতসন্ত্রস্ত লোকগুলি পড়ি-মরি করে গাছে উঠে বসল আর বলদেব বারবার তার মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকল। তখন নেকড়েগুলি নিজেরা মাটিতে শুয়ে পড়ল, ঘুমাল, কারণ ওদের মনের গঠন ছিল সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ। তাছাড়া ঘুম বাদ দিয়ে কারো পক্ষেই ভালো করে কাজ করা সম্ভব হয় না। ইতোমধ্যে মৌগলি অনায়াসে মাইলের পর মাইল দ্রুতবেগে অতিক্রম করে গেল। মানুষের মধ্যে অতদিন সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকার পরও তার শরীর যে একদম ঠিক আছে এটা দেখে সে খুশি হলো। তার মাথায় তখন একটা ভাবনাই ঘুরছে। মেসুয়া আর তার স্বামী যে ফাঁদেই ধরা পড়ুক সে-ফাঁদ থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। যে কোনো রকম ফাঁদ সম্পর্কেই মৌগলির ছিল গভীর অবিশ্বাস। মেসুয়া আর তার স্বামীকে মুক্ত করার পর সে গ্রামবাসীদেরকে দেখে নেবে, তাদের পাওনা মিটিয়ে দেবে কড়ায় গণ্ডায়।

মৌগলি তার সুপরিচিত চারণভূমিতে এসে পৌঁছল। যেদিন সে শের খানকে হত্যা করে সেদিন সকালে ধূসর ভাই তার জন্য যে ঢাকগাছের কাছে অপেক্ষা করছিল সেটা সে দেখতে পেল। তখন গোধূলি নেমে এসেছে। সমস্ত মানবসমাজের বিরুদ্ধে রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। এমন সময় গ্রামের দিকে তাকাতেই তার গলার মধ্যে একটা ডেলা আটকে গেল, তার নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে এলো। সে দেখল যে আজ অস্বাভাবিক আগেই সবাই মাঠ থেকে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। রাতের রান্নাবান্নার কাজ বাদ দিয়ে তারা এখন এক বিশাল জনতার রূপ নিয়ে গাঁয়ের বড় গাছটার নিচে জড়ো হয়ে কথা বলছে, চেঁচাচ্ছে।

মৌগলি মনে মনে বলল, আমার জন্য সারাক্ষণ ফাঁদ না পাতলে মানুষের যেন তৃপ্তি হয় না! গত রাত ছিল মৌগলির জন্য, মনে হয় কত কাল আগের কথা, আর আজ হলো মেসুয়া আর তার স্বামীর জন্য। তারপর আগামীকাল, রাতের পর আরো অনেক রাতের পর, আবার মৌগলির পালা আসবে।

সে দেয়ালের পাশে পাশে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে মেসুয়াদের কুটিরের কাছে এসে পৌঁছল। তারপর জানালা দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা মেসুয়ার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে, হাত আর পা বেঁধে রেখেছে। মেসুয়া কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, গোঙাচ্ছে। ওর স্বামীকে তারা বেঁধে রেখেছে উজ্জ্বল রং করা খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে। কুটিরের রাস্তার দিকে দরজা শক্ত করে আটকানো। তার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে তিন-চার জন লোক।

মৌগলি গ্রামবাসীদের আচারআচরণ বেশ ভালো করেই জানত। সে মনে মনে ভাবল, যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা খেতে, কথা বলতে, আর ধূমপান করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আর কিছুই করবে না। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলেই তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে শুরু করবে। বলদেবও অল্পক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে এবং তার নিরাপত্তা প্রহরীরা যদি তাদের কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে থাকে তাহলে বলদেবকে সবার কাছে একটা অত্যাশ্চর্য গল্প বলতেই হবে। তাই মৌগলি জানালা দিয়ে কুটিরে প্রবেশ করল, নিচু হয়ে মেসুয়া আর তার স্বামীর বাঁধন খুলে দিল, ওদের মুখে গুঁজে দেয়া কাপড় টেনে বার করল, তারপর ঘরে কোথাও একটু দুধ আছে কিনা দেখার জন্য চারপাশে তাকাল।

ব্যথা আর ভয়ে মেসুয়া প্রায় আধা-পাগল হয়ে গিয়েছিল। সারা সকাল ওরা তাকে বেদম পিটিয়েছে, ওর গায়ে পাথর ছুঁড়েছে। মেসুয়া চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু মৌগলি দ্রুত তার মুখে হাত চাপা দিল। মেসুয়ার স্বামীকে দেখাল বিভ্রান্ত এবং ক্রুদ্ধ। ওরা তার দাড়ির অনেকখানি টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল। সে এখন তার দাড়ির মধ্য থেকে ধুলাবালি আর খড়কুটা ঝেড়ে বের করল।

অবশেষে মেসুয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, আমি জানতাম— আমি জানতাম যে ও ঠিক আসবে। এখন তো আমি নিঃসন্দেহে জানি যে ও আমার ছেলে। সে মৌগলিকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণ পর্যন্ত মৌগলি শান্ত ও অচঞ্চল ছিল কিন্তু এবার তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে জিজ্ঞাসা করল, এই সব দড়িদড়া কেন? ওরা তোমাকে কেন এভাবে বেঁধে রেখেছে?

মেসুয়ার স্বামী গোমড়া মুখে বলল, তোমাকে যে ও ছেলে বানিয়েছে সেই জন্য এখন ওরা তাকে মেরে ফেলবে, আর কী জন্য? দেখো, আমার হাত-পা থেকে রক্ত ঝরছে।

মেসুয়া কিছু বলল না, কিন্তু মৌগলি মেসুয়ার আঘাতের দিকেই তাকিয়ে ছিল। সেখানে রক্ত দেখতে পেল সে, আর ওরা তখন তার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ শুনতে পেল। মৌগলি জিজ্ঞাসা করল, কার কাজ এটা? তাকে চড়া দাম দিতে হবে এর জন্য।

গোটা গাঁয়ের কাজ। আমি বড় বেশি ধনী হয়ে গেছি। আমার গরু-মোষের সংখ্যা বড় বেশি হয়ে গেছে। অতএব ওই মেয়েলোক আর আমি ডাইনি-যাদুকর, কারণ আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মেসুয়াকে বলতে দাও।

নাথু, তুমি আমার দুধ খেয়েছ, মনে আছে তোমার ? তুমি আমার ছেলে, বাঘ তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম। ওরা বলে আমি তোমার মা, একটা শয়তানের মা, তাই মৃত্যু আমার উপযুক্ত শাস্তি!

মৌগলি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু শয়তান জিনিসটা কী ? মৃত্যু আমি দেখেছি।

মেসুয়ার স্বামী আঁধার মুখ তুলে তাকাল কিন্তু মেসুয়া হেসে উঠল। সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখেছ! আমি জানতাম— আমি বলেছিলাম ও কোনো যাদুকর নয়। ও আমার ছেলে— আমার ছেলে!

পুরুষটি বলল, ছেলে কিংবা যাদুকর যাই হোক, তাতে আমাদের কী লাভ ? আমাদের তো মরতেই হচ্ছে।

মৌগলি জানালার ওপারে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখছ, ওই পথ সোজা জঙ্গলে চলে গেছে। এখন তোমাদের হাত-পা বন্ধনমুক্ত। চলে যাও জঙ্গলে।

মেসুয়া বলল, বাবা, তুমি যেমন চেনো আমরা জঙ্গলকে তেমন চিনি না। আমার মনে হয় না আমি অতদূর হেঁটে যেতে পারব।

তার স্বামী বলল, আর গ্রামের লোক আমাদের ধরে ফেলবে, তারপর আবার এখানে টেনে নিয়ে আসবে।

মৌগলি বলল, হুঁ! তার ছুরির ডগাটা নিজের হাতের তালুতে একটু বুলিয়ে সে বলল, গ্রামের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই, এখন পর্যন্ত। কিন্তু আমার মনে হয় না ওরা তোমাদের ধরে রাখবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অন্যদিকে নজর দিতে হবে। আহ্! সে মাথা তুলল, বাইরে চিৎকার আর হুড়োহুড়ির শব্দ শুনল। তাহলে শেষ পর্যন্ত ওরা বলদেবকে ঘরে ফিরতে দিল ?

মেসুয়া বলল, আজ সকালে তোমাকে মারবার জন্য ওকে পাঠানো হয়েছিল। ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি ?

হয়েছে। আমাদের— আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে। ও একটা গল্প শোনাবে, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে আমাদের অনেক কাজ শেষ করতে হবে। তার আগে আমাকে জানতে হবে ওদের উদ্দেশ্যটা কী। তোমরা কোথায় যেতে চাও ভেবে ঠিক কর। আমি ফিরে এলেই আমাকে জানাবে।

সে এক লাফে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে গিয়ে গ্রামের দেয়ালের পাশ ঘেঁসে পিপুল গাছের নিচে অনেক লোক জড়ো হয়ে যেখানে কথাবার্তা বলছিল তার কাছে চলে গেল। বলদেব মাটিতে শুয়ে আছে, কাশছে, মাঝে মাঝে একটু গোঙাচ্ছে, আর তার চারপাশের লোকজন তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। বলদেবের দীর্ঘ কেশরাশি তার কাঁধের উপর নেমে এসেছে। গাছের উপর চড়ার সময় তার হাত ও পা বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে প্রায় কথাই বলতে পারছিল না, কিন্তু ওই অবস্থাতেও নিজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিল। থেকে থেকে সে শয়তানগুলি, গান-গাওয়া শয়তানগুলি, যাদু, মায়া ইত্যাদি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলছিল, একটু পরেই কী আশ্চর্য কাহিনী সে শোনাবে তার একটু প্রাক-স্বাদ দিচ্ছিল জনতাকে । তারপর সে একজনকে জল আনতে বলল।

বাহ্! মৌগলি বলল। শুধু বকবকানি! কথা আর কথা! মানুষ সত্যিই বান্দরলোকের রক্ত-ভ্রাতা। এখন সে জল দিয়ে কুলকুচা করবে, তারপর হুঁকা টানবে। এসব শেষ করে সে তার গল্প বলা শুরু করবে। খুব জ্ঞানী এরা— এই মানুষেরা। বলদেবের গল্প শুনতে শুনতে কান ভরে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা মেসুয়াকে পাহারা দেবার জন্যও কাউকে সেখানে রাখবে না। আর— আমিও যে ওদের মতো আলসে হয়ে উঠেছি ?

সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিঃশব্দে কুটিরে ফিরে গেল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে তার পায়ের কাছে একটা স্পর্শ পেল। জিভের ওই স্পর্শ ছিল তার অতি চেনা। সে জিজ্ঞাসা করল, মা, তুমি এখানে কী করছ ?

মা-নেকড়ের সারা শরীর শিশিরে ভেজা। সে বলল, আমি আমার সন্তানদের জঙ্গলের মধ্যে গান গাইতে শুনি, শুনেই যে ছেলেকে আমি সব চাইতে বেশি ভালোবাসি তাকে অনুসরণ করি। ছোট্ট ব্যাঙ, যে রমণীর দুধ তুমি পান করেছ তাকে এক নজর দেখার আমার বড় সাধ।

ওরা তাকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। আমি ওর বাঁধন খুলে দিয়েছি। ওর স্বামীর সঙ্গে ও আজ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাবে।

আমিও ওদের পেছন পেছন যাব। আমি বুড়ো হয়েছি ঠিকই কিন্তু এখনো দন্তহীন হই নি।

মা-নেকড়ে দুপায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে জানালাপথে কুটিরের ভেতরে অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

এক মুহূর্ত পরেই সে নিঃশব্দে নেমে পড়ে শুধু বলল, আমি তোমাকে প্রথম বুকের দুধ খাইয়েছি, কিন্তু বাঘিরা সত্য কথাই বলেছে। মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই যায়।

মৌগলি বলল, হয়তো তাই। তার মুখে একটা ভয়ঙ্কর ভাব ফুটে উঠল। সে যোগ করল, আজ রাতে আমার মনের অনুভূতি খুবই অন্যরকম কিন্তু। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা করো, তবে ও যেন তোমাকে দেখতে না পায়।

ছোট্ট ব্যাঙ, তুমি তো কক্ষণো আমাকে ভয় পেতে না। মা-নেকড়ে নিঃশব্দে পেছনের লম্বা ঘাসের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্যমান করে সেখানে বসে থাকল।

মৌগলি তখন লাফ দিয়ে কুটিরের ভেতর আবার ঢুকে খুশি গলায় বলল, ওরা সবাই এখন বলদেবকে ঘিরে বসে তার গল্প শুনছে, আর যেসব ঘটনা আদপেই ঘটে নি বলদেব তা বলে যাচ্ছে। ওর গল্প বলা শেষ হলেই ওরা এখানে আসবে। ওরা বলছে ওরা এখানে লাল— আগুন নিয়ে আসবে, তোমাদের দুজনকেই পুড়িয়ে মারবে। তখন কী হবে?

মেসুয়া বলল, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। খানিওয়ারা এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। খানিওয়ারায় আমরা ইংরেজদের দেখা পাব—

তারা আবার কোন দল? মৌগলি জিজ্ঞাসা করল।

আমি জানি না। তাদের গায়ের রং সাদা। সমস্ত দেশ তারা শাসন করে। কাউকে তারা পুড়িয়ে মারতে দেয় না। আমরা যদি আজ রাতেই ওখানে পৌঁছতে পারি তাহলে আমরা বাঁচব, নইলে মরব।

তাহলে বাঁচো তোমরা। আজ রাতে আর কোনো মানুষ গ্রামের দরজা পেরুবে না। কিন্তু ও কী করছে ওখানে? মৌগলি মেসুয়ার স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। লোকটি তখন কুটিরের এক কোনায় হাঁটু গেঁড়ে বসে দু'হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

মেসুয়া বলল, ওখানে সামান্য কিছু টাকা লুকানো আছে। আমরা তো আর কিছু নিয়ে যেতে পারব না।

মৌগলি বলল, ও, সেই জিনিসটা যেটা মানুষের হাত চালাচালি করে কিন্তু কখনো গরম হয় না। এ জায়গার বাইরেও কী ওটার দরকার হয় নাকি?

মেসুয়ার স্বামী ক্রুদ্ধ চোখে মৌগলির দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, ও শয়তান না, একটা বোকাস্য বোকা! তারপর বলল, এই টাকা দিয়ে আমি

একটা ঘোড়া কিনতে পারব। আমাদের হাত-পায়ের যে অবস্থা তাতে আমরা বেশি দূর হাঁটতে পারব না, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামের লোকেরা আমাদের পিছু নেবে।

মৌগলি বলল, আমি না চাওয়া পর্যন্ত কেউ তোমাদের পিছু নেবে না। তবে ঘোড়া কেনার কথাটা ভালোই বলেছ। মেসুয়া ভীষণ ক্লান্ত। মেসুয়ার স্বামী উঠে দাঁড়িয়ে শেষ মুদ্রাটি কোমরে ভালো করে গুঁজে বেঁধে নিল। মৌগলি মেসুয়াকে জানালা দিয়ে নামতে সাহায্য করল। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া তাকে কিছুটা চাঙ্গা করল, কিন্তু তারার আলোয় অরণ্যকে দেখাল গাঢ় কালো ও বিভীষিকাময়।

মৌগলি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা খানিওয়ারার পথ চেনো? তারা হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল।

খুব ভালো। শোনো, একটুও ভয় পাবে না। আর খুব তাড়াহুড়ো করারও দরকার নেই। শুধু— অরণ্যে, তোমাদের সামনে, তোমাদের পেছনে, মাঝে মাঝে সামান্য গানের শব্দ শুনতে পাবে।

মেসুয়ার স্বামী বলল, আগুনে পুড়ে মরবার ভয় না থাকলে কি তুমি মনে করো আমরা আর কিছুর জন্য রাতের বেলায় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার এই ঝুঁকি নিতাম? মানুষের হাতে মরার চাইতে জঙ্গলের পশুর হাতে মরা অনেক ভালো। কিন্তু মেসুয়া কিছু না বলে মৌগলির দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল।

মৌগলি বলল, শোনো। মনে হলো সে যেন বালু, একটা বোকা নেকড়ে-শিশুকে শতবারের মতো অরণ্যের আইন শেখাচ্ছে। মৌগলি বলল, আমি বলছি অরণ্যের একটি দাঁতও তোমাদের কামড়াবে না, একটি পা-ও তোমাদের আঘাত হানবে না। তোমরা খানিওয়ারা চোখে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ কিংবা পশু তোমাদের আটকাবে না। সব সময় তোমাদের উপর চোখ রাখা হবে। মৌগলি দ্রুত মেসুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ও বিশ্বাস করছে না, কিন্তু তুমি তো কর?

হ্যাঁ, আমার ছেলে। মানুষ হও, কিংবা প্রেতাত্মা হও, কিংবা অরণ্যের নেকড়ে হও, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি।

আমার লোকজন যখন গান ধরবে তখন ও ভয় পাবে। কিন্তু তুমি বুঝবে। এখন যাও, আস্তে আস্তে যাও, তাড়াতাড়ি করার কোনো দরকার নেই। গ্রামের সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মেসুয়া মৌগলির পায়ের কাছে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। মৌগলি তাড়াতাড়ি করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। মেসুয়া তার গলা জড়িয়ে ধরে কত কিছুর নাম নিয়ে তাকে আশীর্বাদ করল, কিন্তু তার স্বামী ক্ষেতগুলির দিকে ঈর্ষান্বিত চোখে তাকিয়ে শুধু বলল, যদি খানিওয়ারায় পৌঁছতে পারি আর ইংরেজদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই তাহলে ওই ব্রাহ্মণ ব্যাটা, বুড়ো বলদেব, আর গাঁয়ের অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আমি এমন একটা মামলা ঠুকে দেব যে ওরা সবাই হাড়ে হাড়ে মজা বুঝবে। আমার অনাবাদি জমি আর শস্য আর উপোসী মোষদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি ওদের কাছ থেকে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে নেব। আমি অবশ্যই ন্যায়বিচার পাব।

মৌগলি হেসে উঠল। ন্যায়বিচার কী জিনিস আমি জানি না। কিন্তু—সামনের বর্ষার মৌসুমটা আসতে দাও, তখুনি দেখা যাবে কী অবশিষ্ট আছে।

ওরা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল, আর মা-নেকড়ে তার গোপন আস্তানা থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল।

মৌগলি বলল, ওদের পেছন পেছন যাও, আর সমস্ত অরণ্য যেন ওদের নিরাপদ রাখে সেদিকে লক্ষ রেখো। একটুখানি গলা ছেড়ো। বাঘিরাকেও সঙ্গে ডেকে নিতে পারো। তখন একটা দীর্ঘ চাপা গর্জন উঠল, পড়ল। মৌগলি দেখল যে মেসুয়ার স্বামী কাঁপছে, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, এক ছুটে আবার কুটিরে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে।

মৌগলি হাসিভরা গলায় বলল, চলতে থাকো। আমি তো বলেইছি কিছু গানটান হতে পারে। এই ধ্বনি খানিওয়ারা পর্যন্ত তোমাদের অনুসরণ করবে। এ হলো তোমাদের প্রতি অরণ্যের অনুগ্রহ।

মেসুয়া তার স্বামীকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে তাড়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ওরা দুজন অন্ধকারের ভেতর ডুবে গেল। বাঘিরা তখন যেন মাটি ফুঁড়ে মৌগলির পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। এই রকম রাত্রির আনন্দ অরণ্যের প্রাণীদের প্রায় পাগল করে দেয়। সেই আনন্দের শিহরণ দেখা গেল বাঘিরার গায়ে। সে গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে বলল, তোমার ভাইদের কাণ্ড দেখে আমার লজ্জা হচ্ছে।

মৌগলি বলল, কেন? ওরা কি বলদেবকে চমৎকার গান শোনায় নি?

খুবই চমৎকার! খুবই চমৎকার! আমি পর্যন্ত আমার মর্যাদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমি গান গাইতে গাইতে ছুটেছিলাম, যেন আমি বসন্তে প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছি! কেন, তুমি আমাদের গান শোনো নি?

আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বলদেবকে জিজ্ঞাসা করে দেখো ওর ভালো লেগেছে কিনা। কিন্তু ওই চারজন কোথায়? আমি চাই না যে আজ রাতে একটা মানুষও গ্রামের বাইরে যেতে পারে।

বাঘিরা বলল, সেজন্য ওই চারজনের কী দরকার! সে প্রায় নেচে উঠল, তার চোখ দুটি আগুনের মতো জ্বলছে, তার গলার ঘড়ঘড়ানি আরো একটু উচ্চগ্রামে উঠল। আমিই গ্রামবাসীদের ধরে রাখতে পারব, ছোট ভাই। তাহলে কি অবশেষে আজ শিকার হবে? গান আর মানুষগুলির গাছে চড়ার দৃশ্য আমাকে রীতিমতো প্রস্তুত করে দিয়েছে। মানুষ কী যে তাদের জন্য আমাদের ভাবতে হবে— রোমলোমহীন, দন্তহীন, মাটিখেকো মানুষ, তাদের জন্য আমরা কেন ভাবব? আমি সারাদিন ওদের অনুসরণ করেছি— সূর্যের সাদা আলোয় সারা দুপুর। নেকড়ে যেমন হরিণের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় আমি সেইভাবে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছি। আমি বাঘিরা! বাঘিরা! বাঘিরা! আমার নিজের ছায়াকে ঘিরে আমি যেভাবে নাচি সেইভাবে ওই লোকগুলির চার পাশে আমি নেচেছি। দেখো! বেড়ালের বাচ্চা যেভাবে গাছ থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঝরে পড়তে থাকা মরা পাতা ধরবার জন্য উপর দিকে লাফ দেয় বিশাল চিতাটা ওইভাবে লাফ দিল, তার থাবা দিয়ে শূন্য হাওয়ায় আঘাত হানল, একবার ডান দিকে, একবার বাম দিকে, প্রতি আঘাতের মাঝখানে গুনগুন করে গান গাইল, তারপর আবার নিঃশব্দে মাটিতে নেমে এলো। সে এই রকম করল কয়েকবার, আর তার গলার আধাঘড়ঘড়ানি আধাগর্জন উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠল, একটা বয়লারের মধ্যে বাষ্পের মতো। আমার আঘাতকে কে ঠেকাবে? মানবশিশু, আমার থাবার এক আঘাতে আমি তোমার মাথা গ্রীষ্মের মরা ব্যাঙ-এর মতো চ্যাপ্টা করে দিতে পারি।

করো তাহলে! মৌগলি বলল। কথাটা বলল সে অরণ্যের ভাষায় নয়, গ্রামের মানুষের ভাষায়, আর মানুষের এই ভাষা শুনে বাঘিরা সম্পূর্ণ থেমে গেল। সে তার কম্পমান পাছায় ভর দিয়ে বসে পড়ল, তার মাথা ঠিক সমান্তরাল হয়ে স্থির হলো মৌগলির মাথার সামনে। মৌগলি যেভাবে বিদ্রোহীভাবাপন্ন নেকড়ের বাচ্চাগুলির দিকে তাকিয়েছিল এখন আরেকবার ঠিক

সেই ভাবে বাঘিরার দিকে তাকাল, সরাসরি চোখ রাখল চিতার উজ্জ্বল-সবুজ দুই চোখের উপর, আর চিতার সবুজ চোখের পেছনের লাল অসহনীয় আলোটা নিভে গেল, সমুদ্রের ওধারে বাতিঘরের আলো যেভাবে নিভে যায় ঠিক সেইভাবে। তারপর চিতার চোখ দুটি নত হলো, সেই সঙ্গে তার বিশাল মাথাটা— নিচে, নিচে, আরো নিচে নেমে এলো, আর তার লাল জিহ্বা দিয়ে সে মৌগলির পায়ের উপর দিকটা ঘষে দিল।

বালকটি ফিস ফিস করে বলল, ভাইয়া— ভাইয়া— ভাইয়া! সে তার ঘাড় থেকে স্পন্দমান পিঠ পর্যন্ত আলতোভাবে এক লয়ে তার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, শান্ত হও, শান্ত হও! এ দোষ রাত্রির, এ দোষ তোমার নয়।

বাঘিরা অনুতপ্ত গলায় বলল, রাত্রির চারপাশের গন্ধ এর জন্য দায়ী। বাতাস আমাকে চিৎকার করে ডাকে। কিন্তু তুমি কী করে একথা জানলে ?

ভারতবর্ষের গ্রামের চারপাশ সব সময়ই নানারকম গন্ধে পরিপূর্ণ থাকে। আর যে প্রাণী তার প্রায় সব কাজই করে গন্ধ শুঁকে, তার কাছে গন্ধ হলো এক পাগলকরা জিনিস, মানুষের কাছে যেমন সঙ্গীত ও মাদকদ্রব্য। মৌগলি আরো কিছুক্ষণ চিতাকে শান্ত করল। শেষে চিতাটা একটা বেড়াল যেমন আগুনের চুল্লির সামনে শুয়ে থাকে সেইভাবে শুয়ে পড়ল, তার বুকের নিচে টেনে নিল নিজের থাবা দুটি আর তার চোখ দুটি অর্ধ-নিমীলিত হয়ে এলো।

অবশেষে বাঘিরা বলে উঠল, তুমি অরণ্যের, আবার তুমি অরণ্যের নও-ও। আর আমি তো একটা কালো চিতা মাত্র। তবে, ছোট ভাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শেষের বাক্যটি মৌগলি লক্ষ করল না। সে বলল, গাছের নিচে আজ ওরা অনেক কথা বলছে। বলদেব নিশ্চয়ই নানা গল্প শোনাচ্ছে ওদের। শিগগিরই ওরা মেসুয়া আর তার স্বামীকে ফাঁদ থেকে বের করে টেনে নিয়ে লাল ফুলের মধ্যে ফেলে দেবার জন্য এখানে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে চিচিং ফাঁক, ফাঁদে কেউ নেই। হো! হো!

বাঘিরা বলল, না, আমার কথা শোনো। এখন আমার রক্ত থেকে জ্বর নেমে গেছে। ওরা এসে আমাকে ওখানে দেখুক। আমার সাক্ষাৎ পাবার পর একটি মানুষও আর ঘর থেকে বেরুবে না। আর, খাঁচায় আমি আগেও থেকেছি। আমার মনে হয় না ওরা আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধবে।

মৌগলি হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে, তাই করো। সেও চিতার মতো বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। আর চিতা নিঃশব্দে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করল।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, ছোহ্! সমস্ত জায়গাটা মানুষের গন্ধে ভরা। কিন্তু এই যে খাট, উদয়পুরের রাজাদের খাঁচায় শোবার জন্য ওরা আমাকে এরকম একটা খাট-ই দিয়েছিল। এবার শোয়া যাক। জানোয়ারটির বিশাল ওজনের ভারে খাটিয়ার কয়েকটা ফিতা ফট ফট শব্দ করে ছিঁড়ে গেল।

মৌগলির কানে এসে লাগল সেই শব্দ। বাঘিরা বলল, যে ভাঙা তালা আমাকে মুক্তি দিয়েছে তার নামে শপথ করে বলছি, ওরা ভাববে যে, বাহ্ কী বিশাল শিকার ধরেছি আমরা! এসো, ছোট ভাই, আমার পাশে এসে বসো। আমরা দুজনে এক যোগে ওদেরকে 'শুভ শিকার' সম্ভাষণ জানাব।

না, আমার পেটে অন্য মতলব এসেছে। এই খেলায় আমার কোনো অংশ আছে এটা মানুষদের অজানা থাকুক। তুমি তোমার শিকার করো, আমি সেটা দেখতে চাই না।

বাঘিরা বলল, ঠিক আছে। ওই যে, ওরা আসছে।

গ্রামের দূরপ্রান্তে পিপুল গাছের নিচের সভায় হৈচৈ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছিল। তারপর উন্মত্ত চিৎকার শোনা গেল। বহু পুরুষ-মেয়ে গদা, লাঠিসোঁটা, কাস্তে আর ছুরি হাতে নিয়ে রাস্তা ধরে এই কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে। জনতার একেবারে মাথায় আছে বলদেব এবং ব্রাহ্মণটি, তবে অন্যান্যরা ঠিক তাদের পেছনেই এবং তারা চিৎকার করে বলছে, ডাইনি আর যাদুকর! দেখা যাক, গরম মুদ্রা চেপে ধরে ওদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় কিনা। এসো, ওদের মাথার উপরে চালে আগুন ধরিয়ে দেয়া যাক। নেকড়ে-শয়তানদের আশ্রয় দিলে কী হয় সে শিক্ষা ওদের আমরা ভালোভাবে দেব। না, আগে ওদের আচ্ছামতো পেটানো যাক। মশাল! আরো মশাল আনো! বলদেব, তোমার বন্দুকের নল গরম করে নাও!

দরজার ছিটকিনি নিয়ে এই সময়ে একটু অসুবিধা দেখা গেল। ওরা খুব বেশি শক্ত করে ওটা আটকে দিয়েছিল। কিন্তু জনতা গোটা দরজাটাকেই উপড়ে ফেলল, আর তখন মশালের আলোয় পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল। তখন দেখা গেল খাটের উপর একটা বিশাল চিতা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, তার থাবাগুলি আড়াআড়িভাবে রাখা, খাটের পাশ দিয়ে আলতোভাবে ঝুলছে,

আলকাতরার মতো কালো তার গায়ের রং, একটা পিশাচের মতো ভয়ঙ্কর। বাঘিরা। আধ মিনিটের মতো সময় ধরে একটা মরিয়া নীরবতা বিরাজ করল, তারপরই জনতার সামনের কাতার আঁচড়ে কামড়ে ধাক্কাধাক্কি করে চৌকাঠ পেরিয়ে দ্রুতবেগে পেছনে হটে গেল। আর বাঘিরা তখন তার মাথা তুলে সযত্নে, জাঁকালোভাবে, লম্বা একটা হাই তুলল, সমকক্ষ কাউকে অপমান করতে চাইলে সে যা করত তাই করল বাঘিরা। সে তার ঠোঁট একটু পেছনে টেনে নিল, একটু উঁচু করল, তার লাল জিভ সামান্য কুঞ্চিত হলো, নিচের চিবুকটা নেমে এলো, অনেকখানি, তার তপ্ত গলা দিয়ে তার ভেতরে প্রায় অর্ধেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তার বিরাট শ্বদন্ত মাড়ির গহ্বর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তারপর তার দু'পাটি দাঁত সশব্দে বন্ধ হলো, মনে হলো ইস্পাত লাগানো একটা সিন্দুকের ডালা যেন কঠিনভাবে লাগিয়ে দেয়া হলো। পরের মুহূর্তেই সমস্ত রাস্তা জনশূন্য হয়ে গেল। বাঘিরা জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে এসে মৌগলির পাশে দাঁড়াল। ওদিকে তখন প্রচণ্ড চেঁচামেচি, আতঙ্কিত চিৎকার, স্রোতের মতো মানুষ হোঁচট খেতে খেতে একে অন্যকে ধাক্কা দিতে দিতে, নিজ নিজ বাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে।

বাঘিরা ধীর গলায় বলল, সকাল হবার আগে ওরা কেউ আর ঘর থেকে বেরুবে না। তো এখন কী করব আমরা?

মনে হলো অপরাহ্নকালীন নিদ্রায় গোটা গ্রাম এক গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন। তবু তার মধ্যেই তারা একটা শব্দ শুনতে পেল। ওরা তাদের শস্যের বিরাট বিরাট বাক্সগুলি মাটির মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে দরজার গায়ে লাগিয়ে রাখছে। বাঘিরা ঠিকই বলেছে। আলো ফুটবার আগে গাঁয়ের কেউ আজ ঘরের বাইরে আসবে না। মৌগলি নিশ্চল হয়ে বসে ভাবতে লাগল, তার মুখ ক্রমেই কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পর বাঘিরা মৌগলির পায়ের কাছে বসে তোষামোদ করার ভঙ্গিতে বলল, কী করেছি আমি?

খুব চমৎকার কাজ ছাড়া আর কিছু করো নি। এখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত ওদের উপর চোখ রেখো। আমি ঘুমাতে চললাম। সে এক ছুটে অরণ্যের মধ্যে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডের উপর মড়ার মতো শুয়ে পড়ল। তারপর সে ঘুমাতেই থাকল, পুরো একটা দিন পার করে আবার রাত না আসা পর্যন্ত সে ঘুমাল।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই তারা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে শুরু করবে।

জেগে ওঠার পর মৌগলি দেখল যে বাঘিরা তার পাশে বসে আছে, আর পায়ের কাছে পড়ে আছে সদ্য শিকার করা একটি হরিণ। বাঘিরা কৌতূহলী চোখে মৌগলিকে তার ছাল-ছাড়ানোর ছুরি দিয়ে কাজে নেমে পড়তে দেখল। তারপর আহার পর্ব শেষ করে, জল খেয়ে, দু'হাতের উপর চিবুক রেখে মৌগলি এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাঘিরা বলল, ওই মেয়েলোক আর তার পুরুষ নিরাপদে খানিওয়ারার দৃষ্টিসীমানার মধ্যে পৌঁছে গেছে। তোমার গুহা-মা চিলের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে। যে রাতে ওদের মুক্ত করা হয় সে রাতেই, মাঝ-রাত হবার আগেই, ওরা একটা ঘোড়া যোগাড় করে ফেলে, তারপর খুব জোরে ছুটে চলে যায়। ভালো হয় নি?

মৌগলি বলল, খুব ভালো হয়েছে।

আর আজ সকালে সূর্য অনেক উপরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত গাঁয়ের কেউ ঘর ছেড়ে বের হয় নি। তারপর তারা খাওয়া দাওয়া সেরে আবার তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ি ফিরে গেছে।

ওরা কি তোমাকে কখনো দেখতে পেয়েছিল ?

দেখে থাকতে পারে। খুব ভোরে আমি প্রবেশদ্বারের সামনে ধুলোর মধ্যে গড়াগড়ি দিয়েছি, আপন মনে একটু আধটু গানও গেয়ে থাকতে পারি। ছোট ভাই, এখন আর আমাদের কিছু করবার নাই। এসো, বালু আর আমার সঙ্গে শিকারে চলো। তার নতুন মৌচাকগুলি সে তোমাকে দেখাতে চায়। আমরা সবাই চাই সব আবার আগের দিনগুলির মতো হোক। তোমার মুখ থেকে ওই দৃষ্টিটা সরিয়ে নাও। ওটা দেখলে আমি পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠি। ওই মেয়েলোকটিকে আর তার পুরুষকে আর ওরা লাল ফুলের মধ্যে ফেলে দিতে পারবে না। এবং অরণ্যে সব কিছু ভালোভাবে চলছে। ঠিক না ? তাহলে মানুষের কথা ভুলে যাওয়া যাক।

একটুক্ষণের মধ্যেই তাই হবে। আচ্ছা, আজ রাতে হাতি কোথায় খাওয়া দাওয়া করছে ?

যেখানে তার পছন্দ। ওই নীরব প্রাণীর কথা কে বলতে পারে ?

কিন্তু এমন কী কাজ পড়ল যেটা হাতি করতে পারে আর আমরা পারি না ?

ওকে গিয়ে আমার কাছে আসতে বলো। ওর তিন ছেলেকে যেন সঙ্গে নিয়ে আসে।

কিন্তু— শোনো, ছোট ভাই, এটা সমীচীন মনে হয় না, হাতিকে গিয়ে বলা, এখানে আসো, ওখানে যাও। মনে রেখো, হাতি হলো অরণ্যের প্রভু, আর মানুষের দল তোমার মুখের চেহারা বদলে দেবার আগে হাতি-ই তোমাকে অরণ্যের প্রধান বাণীগুলি শিখিয়েছিল।

ঠিক আছে। এখন তার জন্য আমার একটা প্রধান বাণী আছে। তাকে মৌগলির কাছে, ব্যাঙ-এর কাছে, আসতে বলো। যদি প্রথমে না শোনে তাহলে তাকে ভরতপুরের শস্যক্ষেত ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলে আসতে বলবে।

বাঘিরা নিশ্চিত হবার জন্য দু'তিন বার বলল, ভরতপুরের শস্যক্ষেত ধ্বংসযজ্ঞ। মৌগলিকে লক্ষ্য করে বাঘিরা বলল, তাহলে আমি যাই। হাতি বড়জোর ক্রুদ্ধ হবে, তার বেশি তো নয়। আর কী প্রধান বাণী যা হাতিকে পর্যন্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য করে সেটা জানার জন্য আমি আমার এক পক্ষকালের শিকার পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি।

বাঘিরা চলে গেল। মৌগলি অসম্ভব ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তার ছুরি মাটির বুকে বারবার বসাতে লাগল। সে মানুষের রক্ত আগে কখনো দেখে নি। মেসুয়াকে বেঁধে রাখা ধারালো দড়ির গায়ে মেসুয়ার রক্ত দেখে, সেই রক্তের গন্ধ নাকে পেয়ে, মৌগলি অস্থির হয়ে যায়। ভালোবাসা সম্পর্কে যতটুকু সে বুঝত তাতে তার মনে হলো মেসুয়াকে সে ভীষণ ভালোবাসে। গোটা মানুষজাতিকে যত তীব্রভাবে সে ঘৃণা করে ঠিক ততটুকু তীব্রভাবেই সে মেসুয়াকে ভালোবাসে। মেসুয়া সব সময় তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে। কিন্তু মানুষকে সে যতই ঘৃণা করুক, তাদের গালগল্প, তাদের নিষ্ঠুরতা, তাদের কাপুরুষতা সত্ত্বেও, আর অরণ্য তাকে যতকিছুই দিতে পারুক তার মূল্য হিসেবেও, সে নিজে কখনো কোনো মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারবে না, তার নাকে ওই ভয়ঙ্কর গন্ধ সে কখনোই সহ্য করতে পারবে না। তাই সে আরো সহজ একটা পরিকল্পনা করল, আরো সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত। এ পরিকল্পনাটা তার মাথায় এসেছে পিপুল গাছের নিচে এক সন্ধ্যায় বলদেবের বলা একটা গল্প শুনে। একথা মনে হতেই মৌগলি আপন মনে হেসে উঠল।

বাঘিরা তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, ওটা ঠিকই প্রধান বাণী ছিল। ওরা নদীর ধারে খাচ্ছিল, তোমার নির্দেশ ওরা এমনভাবে পালন করল যেন ওরা হাতি নয়, বলদ। ওই দেখো, আসছে ওরা।

হাতি আর তার তিন ছেলে নিজেদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী নিঃশব্দে সেখানে এসে দাঁড়াল। তাদের গায়ের দুপাশে এখনো নদীর কাদামাটি লেগে আছে। হাতি তার দাঁত দিয়ে একটা কচি তালগাছ উপড়ে নিয়ে এসেছিল, এখন একমনে তার সবুজ কাণ্ডটি চিবুচ্ছে। কিন্তু তার গায়ের প্রতিটি রেখা দেখে বাঘিরা বুঝল যে এখন অরণ্যের প্রভু মানবসন্তানের সঙ্গে কথা বলছে না, বরং সে ভীত একটি প্রাণী, এখন সে এমন একজনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে ভীত নয়। তার তিন পুত্র দুলতে দুলতে বাবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতি মৌগলিকে 'শুভ শিকার' সম্ভাষণ জানাল কিন্তু মৌগলি যেন তার মাথাও তুলল না। হাতি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তার দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে স্থানান্তরিত করল, তারপর মৌগলি মুখ খুলল। তখন সে হাতিদের উদ্দেশ করে কিছু না বলে বাঘিরার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটা গল্প শোনাব। আজ যে শিকারিকে তুমি শিকার করেছ সে-ই গল্পটা বলেছিল। গল্পটা এক বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ হাতিকে নিয়ে যে মানুষের পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছিল।

গর্তের ভেতরে সাজিয়ে রাখা ধারালো দণ্ডগুলি হাতিটির গোড়ালির একটু উপর থেকে কাঁধ পর্যন্ত কেটে দিয়েছিল। পুরো জায়গা জুড়ে একটা সাদা দাগ পড়ে যায়। মৌগলি তার একটা হাত প্রসারিত করল, হাতি সামান্য ঘুরে দাঁড়াল, আর চাঁদের আলোয় তার ধূসর দেহে একটা লম্বা সাদা দাগ দেখা গেল, যেন কেউ একটা আগুনে তাতানো চাবুক চালিয়েছে তার উপর। মৌগলি বলে চলল, মানুষেরা পরে তাকে ফাঁদ থেকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল, কিন্তু হাতিটি ছিল অতিশয় শক্তিশালী। সে তার দড়িদড়া ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যায়। তারপর তার ক্ষত সেরে যাবার পর এক রাতে সে ওই শিকারিদের ক্ষেতের কাছে ফিরে আসে। ভীষণ ক্রুদ্ধ তখন। এখন আমার মনে পড়ছে, তার তিন ছেলে ছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, আর অনেক দূরের এক জায়গায় ভরতপুরের ক্ষেতগুলিতে। পরবর্তী ফসল কাটার সময় ওই ক্ষেতগুলির কী অবস্থা হয়েছিল, হাতি?

হাতি বলল, সে ফসল কেটেছিলাম আমি আর আমার তিন পুত্র।

আর ফসল কাটার পরে নতুন করে হাল চাষ করার কাজটা কেমন হয়েছিল? মৌগলি জিজ্ঞাসা করল।

হাতি জানাল, কোনো হাল চাষ হয় নি।

আর যারা জমির সবুজ শস্য খেয়ে জীবনধারণ করে সেই মানুষগুলির কী হলো? মৌগলি প্রশ্ন করল।

তারা চলে যায়।

আর যে কুটিরগুলিতে মানুষেরা ঘুমাত সেগুলির কী হলো? মৌগলি জানতে চাইল।

আমরা তার ছাদগুলি ভেঙে তছনছ করে দিই, আর অরণ্য এসে দেয়ালগুলি পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলে।

আর কী? মৌগলি জিজ্ঞাসা করল।

আমি দু'রাতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর তিন রাতে উত্তর থেকে দক্ষিণে যতদূর হেঁটে যেতে পারি ততটুকু জায়গা অরণ্য নিয়ে নেয়। আমরা পাঁচটা গ্রামের উপর জঙ্গলকে প্রবেশ করতে দিই। আর ওই গ্রামগুলির জায়গাজমি, গো-চারণ ভূমি, শস্য উৎপাদনের কোমল ক্ষেত সব কিছুর মধ্যে জঙ্গল ঢুকে পড়ে। মাটিতে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর জীবনের জন্য নির্ভরশীল একটি মানুষও আজ ওখানে নেই।

এটাই ছিল ভরতপুরের শস্যক্ষেত ধ্বংসযজ্ঞ, যে কাজটা করেছিলাম আমি এবং আমার তিন পুত্র। তো আমি এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, মানবশিশু, এসব খবর তুমি কী করে পেলে ?

হাতির প্রশ্নের উত্তরে মৌগলি বলল, একটা মানুষ আমাকে এই কাহিনী শুনিয়েছিল আর আমি এখন দেখছি যে বলদেবও সত্য কথা বলতে পারত। সাদা রেখাচিহ্নিত হাতি, কাজটা তুমি ভালোভাবেই করেছ, কিন্তু দ্বিতীয়বার তা আরো ভালোভাবে সম্পাদিত হবে, কারণ এবার পরিচালনা করবার জন্য একজন মানুষ থাকবে। যে গ্রাম থেকে মানুষদল আমাকে বার করে দিয়েছে তুমি সেটা চেনো ? ওরা অলস, বুদ্ধিহীন এবং নিষ্ঠুর। তারা তাদের মুখ দিয়ে খেলা করে আর তারা দুর্বলকে হত্যা করে খাবার জন্য নয়, ফুর্তির জন্য। ভরা-পেট থাকলে তারা আপন সন্তানদেরও লাল ফুলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে পারে। এ আমার চোখে দেখা। ওদের আর এখানে বাস করা ঠিক নয়। আমি ওদের ঘৃণা করি।

হাতির তিন পুত্রের মধ্যে সবচাইতে ছোটটি এক গুচ্ছ ঘাস উপড়ে নিয়ে নিজের পায়ে আছড়ে ধুলো পরিষ্কার করল, পরে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার ছোট ছোট লাল চোখ দুটি চুপিসারে এদিক ওদিক দেখল। সে বলে উঠল, তাহলে ওদের মেরে ফেলো।

মৌগলি রেগে উঠে জবাব দিল, কয়েকটা সাদা হাড় আমার কী কাজে লাগবে ? আমি কি একটা নেকড়েশাবক যে রোদের মধ্যে কাঁচা মাথা নিয়ে খেলব ? শের খানকে আমি হত্যা করেছি, তার চামড়া এখন সভাটিলামঞ্চে পচছে। কিন্তু শের খান কোথায় গেছে আমি জানি না, আর আমার পেট এখনও খালি। এবার আমি তাই নেব যেটা আমি দেখতে পাই, যা আমি স্পর্শ করতে পারি। হাতি, অরণ্যকে ওই গ্রামে প্রবেশ করতে দাও!

বাঘিরা কেঁপে উঠে গুটিগুটি হয়ে বসে পড়ল। চরম খারাপ কিছু হলে গ্রামের রাস্তা ধরে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাওয়া, ডানে-বাঁয়ে জনতার গায়ে আঘাত হানা, কিংবা গোধূলির সময় তারা যখন ক্ষেত চাষ করে তখন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে চাতুর্যের সঙ্গে মানুষ মারা, এটা সে বুঝতে পারে কিন্তু এই রকম সুপরিকল্পিতভাবে মানুষ ও পশুর চোখ থেকে একটা গোটা গ্রামকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া— বাঘিরার রীতিমতো ভয় হলো। হাতিকে মৌগলি কেন ডেকে পাঠিয়েছে এবার সে সেটা বুঝতে পারল। দীর্ঘজীবী হাতি ছাড়া আর কারো পক্ষে এরকম একটা যুদ্ধ পরিচালনা ও সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ভরতপুরের ক্ষেত থেকে মানুষ যেভাবে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওদেরও সেইভাবে ছুটে পালাতে দাও। তারপর একটি মাত্র লাঙলের জন্য বৃষ্টির জল জমবে, ভারি পাতাগুলির উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ হবে, আমি আর বাঘিরা ব্রাহ্মণের বাড়িতে আমাদের আস্তানা গাড়ব আর মন্দিরের পেছনের পুকুরে হরিণের পাল জল পান করবে! হাতি, অরণ্যকে প্রবেশ করতে দাও!

হাতি সন্দিগ্ধচিত্তে বলল, কিন্তু ওদের সঙ্গে তো আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। মানুষের ঘুমাবার জায়গা ধ্বংস করে দেবার জন্য প্রচণ্ড যন্ত্রণায় একটা লাল ক্রোধের দরকার হয়।

জঙ্গলে কি একমাত্র তোমরাই ঘাস খাও ? তোমার সব লোকজন নিয়ে আসো। হরিণ, শুয়োর আর নীলগাই-এর দল ব্যাপারটা দেখুক। সমস্ত ক্ষেত বিরাণ হয়ে যাবার আগে তোমার গায়ের চামড়ার একটুখানিও তোমাকে দেখাতে হবে না। যাও হাতি, অরণ্যকে অনুপ্রবেশ করতে দাও!

কাউকে মারতে হবে না তো ? ভরতপুরের ধ্বংসযজ্ঞে আমার দাঁত লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি আর গন্ধ জাগাতে চাই না।

আমিও চাই না। তাদের হাড় পরিচ্ছন্ন মাটির উপর পড়ে থাকুক তাও আমি চাই না। ওরা অন্য কোথাও গিয়ে নতুন বাসভূমি খুঁজে নিক। এখানে ওরা থাকতে পারবে না। যে রমণী আমাকে খাবার দিয়েছে আমি তার রক্ত দেখেছি, তার রক্তের গন্ধ পেয়েছি। আমি না থাকলে ওরা তাকে মেরে ফেলত। তাদের দোরগোড়ায় একমাত্র নতুন ঘাসের গন্ধই পারে ওই গন্ধ দূর করতে। ওটা আমার মুখের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে। অরণ্যকে অনুপ্রবেশ করতে দাও, হাতি!

আহ্! বলল হাতি। ধারালো বাঁশের দণ্ডগুলি ওই রকম করেই আমার চামড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বসন্তের ঝোপজঙ্গলের নিচে গ্রামগুলিকে যখন আমরা মরে যেতে দেখলাম শুধু তখনই ওই জ্বলুনির অবসান ঘটে। আমি এখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। তোমার যুদ্ধ আমাদেরও যুদ্ধ। আমরা অরণ্যকে ঢুকতে দেব!

রাগে ঘৃণায় মৌগলির সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। কখন হাতিগুলি চলে গেছে তা সে টেরও পায় নি। ভীত বাঘিরা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

অবশেষে কালো চিতা বলল, যে ভাঙা তালা আমাকে মুক্তি দিয়েছে তার নামে শপথ করে বলছি, তুমি কি সত্যিই সেই ছোট ন্যাংটা জিনিসটা দলের সভায় যার পক্ষ নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম ? যখন সবাই ও সব কিছু ছিল নবীন ? হে অরণ্যের প্রভু, যখন আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে তখন তুমি আমার পক্ষে কথা বলো, বালুর পক্ষে কথা বলো, আমাদের সবার পক্ষে কথা বলো। তোমার সামনে আমরা শিশু। পায়ের নিচে জীর্ণ খড়কুটা! মা-হারা হরিণীর বাচ্চা!

বাঘিরা একটা নিরাশ্রয় মৃগশাবক এই চিন্তাই মৌগলির ভেতরটা ওলটপালট করে দিল। সে হাসল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, সে কাঁদল, আবার হাসল, শেষে নিজেকে সামলাবার জন্য জলাশয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানে সে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটল। জলাশয়ে চাঁদের আলো পড়ে রেখার পর রেখা সৃষ্টি হয়েছিল। মৌগলি তার মধ্য দিয়ে, যার নামে তার নাম সেই ব্যাঙ-এর মতো, ডুব দিচ্ছিল আর ভেসে উঠছিল।

ওদিকে হাতি তার তিন পুত্রকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে তাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছিল। তারা নিঃশব্দে এক মাইল দূর দিয়ে উপত্যকার নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। তারা দু'দিন ধরে জঙ্গলের মধ্যদিয়ে এক নাগাড়ে চলল, সে প্রায় ষাট মাইলের মতো। আর তাদের প্রতি পদক্ষেপ, তাদের শুঁড়ের প্রতিটি ওঠানামা চোখে পড়ল মং বাদুড়ের, চিলের, আর বান্দরলোকদের আর সমস্ত পক্ষীকুলের। তারা ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করল। তারপর হাতিরা আহারে মন দিল। শান্তভাবে তারা এক সপ্তাহ ধরে খেলো। হাতি আর তার পুত্ররা ছিল পাহাড়ি অজগর কা'র মতো। অনিবার্য না হলে তারা কখনো তাড়াহুড়া করত না।

ওই এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর অরণ্যের সর্বত্র একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে। কে যে এটা শুরু করে তা কেউ বলতে পারল না। গুজবটা হলো এই যে অমুক জায়গায় অমুক উপত্যকায় আরো ভালো খাবার ও জল পাওয়া যাবে। ভালোভাবে ভরপেট খাবার জন্য শুয়োর দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে রাজি ছিল। ওই গুজবের পর তারাই সর্বপ্রথম দল বেঁধে উল্লিখিত জায়গার দিকে ছুটল। তাদের পেছন পেছন গেল হরিণের পাল আর ছোট ছোট বুনো শেয়ালের দল যারা অন্য পশুর মরা মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে, হরিণের পালের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাল রেখে চলল ভারি বলিষ্ঠ কাঁধের নীলগাই-এর দল। সামান্য ছোট্ট কোনো একটা জিনিসই এই ছড়ানো ছিটানো পশুর দলকে ঘুরিয়ে দিতে

পারত কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটলেই কেউ না কেউ এসে তাদের শান্ত করত। কখনো চলে আসত সাহি নামের সজারুটি, এসেই খবর দিত যে সামনে একটু দূরেই চমৎকার খাবার রয়েছে। কখনো প্রফুল্লচিত্তে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মং বাদুড় এসে জানাত যে সামনের বন একেবারে ফাঁকা। কখনো মুখভর্তি শেকড় নিয়ে বালু এসে পাশে দাঁড়াত, ভয় দেখিয়ে কিংবা হৈচৈ করে, খেলাধুলা করে দোদুল্যমান পশুর সারিকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনত। অনেক প্রাণী দলছুট হয়ে পালিয়ে গেল কিংবা উৎসাহ হারিয়ে ফেলল, তবুও অনেকেই থেকে গেল, এগিয়ে চলল সামনের দিকে। আরো দিন দশেক পর পরিস্থিতি দাঁড়াল এই রকম। হরিণ, শুয়োর আর নীলগাই-এর পাল আট-দশ মাইলের ব্যাসার্ধের মধ্যে একটা বৃত্ত তৈরি করে জটলা পাকিয়ে অনবরত ঘুরতে লাগল আর মাংসাশী জানোয়াররা তাদের প্রান্ত দিয়ে ছোটখাট বিচ্ছিন্ন লড়াই-এ লিপ্ত হতে থাকল। আর এই বৃত্তের কেন্দ্রে রইল গ্রামটি। সেখানে শস্য পাকতে শুরু করেছে। আর শস্য ক্ষেতের মধ্যে পায়রার জন্য বানানো বাসার মতো চারটে বংশদণ্ডের উপর বসানো মাচায় কয়েকটি লোক লাঠি হাতে বসে আছে— পাখি আর অন্যান্য লুটেরাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্য। এই পর্যায়ে হরিণের পালকে আর মিষ্টি কথায় ভোলানো হলো না। তাদের পেছনে খুব কাছেই ছিল মাংসাশী জানোয়াররা। তারাই হরিণদের সামনে আর ভেতরের দিকে ছুটে যেতে বাধ্য করল।

হাতি তার তিন পুত্রকে নিয়ে অরণ্যের ভেতর থেকে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো এক অন্ধকার রাতে। তারা তাদের শুঁড় দিয়ে মাচার বংশদণ্ডগুলি ভেঙে ফেলল। সেগুলি ছিন্ন পুষ্পের মতো হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল। আর লোকগুলির কানে এসে বাজল হাতির গলার ভেতর থেকে আসা গভীর গলগল শব্দ। এর পর বিভ্রান্ত পশুগুলির অগ্রগামী সেনাদলের মধ্যে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। তারা বন্যার স্রোতের মতো গ্রামের চারণভূমি আর চাষ করা ক্ষেতগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ খুর বিশিষ্ট বুনো শুয়োরের পাল এলো তাদের সঙ্গে। হরিণের পাল যা ধ্বংস করে নি তা ধ্বংস করে দিল এই শুয়োরের পাল। মাঝে মাঝে নেকড়ের গর্জনে বিচলিত পশুগুলি মরিয়া হয়ে বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। তাদের পায়ের চাপে ধ্বংস হয়ে গেল সদ্য অঙ্কুরিত যবের দানা। জল সেচের জন্য গ্রামবাসীর যে সব খাল কেটেছিল তার উঁচু পাড়গুলি ওদের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে গিয়ে সমতল হয়ে গেল। সকাল হবার আগেই বৃত্তের বাইরের দিকের একটা জায়গা আর চাপ সহ্য করতে পারল না।

মাংসাশী জানোয়াররা পেছনে সরে যাওয়ায় দক্ষিণের দিকে একটা খোলা পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই পথ দিয়ে হরিণের পাল ছুটে পালাল। যারা একটু বেশি সাহসী ছিল তারা তাদের আগামী রাতের খাবার শেষ করার উদ্দেশ্যে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকল।

কিন্তু ইতোমধ্যে কাজ, বলতে গেলে, সমাধা হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা দেখলো যে তাদের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তার মানে এখনই এখান থেকে অন্যত্র চলে না গেলে মৃত্যু অবধারিত। অরণ্যের এতো কাছে বাস করার জন্য তাদেরকে কোনোরকমে এক বছর থেকে আরেক বছর পর্যন্ত জীবন-ধারণ করতে হতো। মোষগুলিকে যখন চরতে পাঠানো হলো তখন বুভুক্ষু পশুগুলি দেখল যে হরিণের পাল চারণভূমি সাফ করে দিয়েছে, কোথাও কিছু নেই। মোষগুলি তখন হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল, তারপর তাদের বুনো সাথীদের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে তিন চারটা ঘোড়া ছিল। আস্তাবলে তারা শুয়ে ছিল। সকালে দেখা গেল তাদের মাথা আঘাতে আঘাতে চূর্ণ। বাঘিরা ছাড়া আর কারো পক্ষে এরকম আঘাত হানা সম্ভব ছিল না। চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সে শেষ ঘোড়াটার মৃতদেহ খোলা রাস্তার উপর টেনে এনেছিল।

সে রাতে গ্রামবাসীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখার মতো উৎসাহ নিজেদের মধ্যে পেল না। ফলে হাতি আর তার তিন পুত্র মাঠে সামান্য যা কিছু পড়ে ছিল তা নিঃশেষে সাফ করে দিল এবং হাতি কিছু সাফ করার পর সাফ করার মতো কিচ্ছু পড়ে থাকে না। মানুষগুলি তখন স্থির করল যে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের জমিয়ে রাখা বীজশস্য খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকবে। গ্রামের শস্য ব্যবসায়ীর আড়তে তার মটকাগুলি ছিল শস্যে পরিপূর্ণ। সে মনে মনে ভাবছিল এবার বেশ চড়া দাম পাবে। এই সময় হাতির তীক্ষ্ণ ধারালো বিশাল দাঁত তার মাটির ঘরের কোনাগুলি ভেঙে দিল, তার বড় বেতের সিন্দুকটা চুরমার করে দিল, তার ভেতরকার মূল্যবান সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

যখন শেষ ক্ষতিটা আবিষ্কৃত হলো তখন কিছু বলার জন্য ব্রাহ্মণের পালা এলো। সে তার নিজস্ব ঈশ্বরদের কাছে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পায় নি। সে বলল, গ্রাম হয়তো অজান্তেই অরণ্যের কোনো ঈশ্বরকে তাচ্ছিল্য বা অপমান করেছে, তাকে ক্রুদ্ধ করেছে, কারণ অরণ্য যে তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব তারা তখন

তাদের সবচাইতে নিকটবর্তী আদিবাসী গণ্ডদের মোড়লকে ডেকে পাঠাল। এই ক্ষুদ্রাকার, প্রাজ্ঞ, চরম কৃষ্ণবর্ণ শিকারিরা গভীর অরণ্যে বাস করত। এদের পিতা-প্রপিতামহরা ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ, সমস্ত ভূমির মালিক ছিল ওই আদিবাসীরা। গ্রামের লোকেরা তাদের যা কিছু ছিল তাই দিয়ে গণ্ডমোড়লকে অভ্যর্থনা করল। গণ্ডমোড়ল দাঁড়িয়ে থাকল এক পায়ে ভর দিয়ে, হাতে তার ধনুক, বিষ মাখানো কয়েকটা তীর তার মাথার উপর ঝুটিবাঁধা চুলে গোঁজা। সে কিছুটা ভীতভাবে কিছুটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চিন্তাগ্রস্ত গ্রামবাসী আর তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্ষেতগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। গ্রামবাসীরা জানতে চাইল তার ঈশ্বররা, প্রাচীন কালের ঈশ্বররা, কি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে? হয়ে থাকলে কী উৎসর্গ, কী বলিদান করতে হবে? গণ্ডটি কোনো কথা বলল না, কারেলা নামের যে লতাঝাড়ে তেতো বুনো লাউ ধরে তার একটা লতা সে হাতে তুলে নিল। তারপর মন্দিরের দরজায় যে লাল রঙের হিন্দু দেবমূর্তি বসানো ছিল সে তার মুখের চারপাশে ওই লতাটি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে দিল, মন্দিরের দরজার চারপাশেও সে আড়াআড়িভাবে ওই লতা বিছিয়ে দিল। তারপর সে খানিওয়ারার দিকে খোলা হাওয়ার মধ্যে তার হাত প্রসারিত করে দিয়ে আবার তার অরণ্যে ফিরে গেল, অরণ্যের প্রাণীদের অরণ্যের মধ্যদিয়ে এদিক ওদিক চলে যেতে দেখল। সে জানত, যখন অরণ্য চলতে শুরু করে তখন শ্বেতাঙ্গ মানুষ ছাড়া আর কেউ তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারবে বলে আশা করে না।

গণ্ডমোড়ল কী বোঝাতে চেয়েছে সেটা জিজ্ঞাসা করবার কোনো দরকার ছিল না। যেখানে তারা ঈশ্বরের উপাসনা করত সেখানে এখন বুনো লাউ জন্মাবে। তারা এখন যত দ্রুত আত্মরক্ষা করতে পারবে ততই মঙ্গল।

কিন্তু একটা গ্রামকে তার শিকড়-নোঙর ছিঁড়ে উৎপাটিত করা এক কঠিন কাজ, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন খাদ্যবস্তু কিছুটা পাওয়া গেল ততক্ষণ পর্যন্ত তারা গ্রামেই থেকে যায়। তারপর তারা অরণ্যের ভেতর থেকে বাদাম কুড়িয়ে আনার চেষ্টা করল কিন্তু কঠোর চোখের অনেক ছায়া তাদের উপর নজর রাখল, দিনদুপুরেও তারা তাদের দেখা পেতে লাগল। তারা ভয় পেয়ে গ্রামের মধ্যে দ্রুত ফিরে আসত। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিট আগে তারা যে গাছের অক্ষত কাণ্ডটির পাশ দিয়ে গিয়েছিল এখন তারা দেখল যে তার বাকল ছেঁড়াখোঁড়া, কোনো বিশাল নখরযুক্ত থাবার চিহ্ন সেখানে সুস্পষ্ট। তারা যতই নিজেদেরকে গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে লাগল অরণ্যের প্রাণীদের সাহস ততই উত্তরোত্তর

বেড়ে চলল। ওই প্রাণীরা এখন ওয়েনগুঙ্গার তীরবর্তী চারণভূমিতে ছোটাছুটি করে, উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয়। গ্রামের পেছন দিকের দেয়াল কিংবা শূন্য গোয়ালঘরগুলি মেরামত করার সময় গ্রামবাসীরা পেল না। অরণ্য এখন গ্রামের মধ্যে প্রায় ঢুকে পড়েছে। বুনো ঘাস আর লতাপাতায় চারিদিক ছেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে পালালো গাঁয়ের অবিবাহিত মানুষগুলি। এই গ্রাম যে অভিশপ্ত এবং আশু মৃত্যুপথযাত্রী সে খবর তারা চারপাশে ছড়িয়ে দিল। তারা জানালো যে পিপুল গাছের তলায় পাটাতনের নিচে নিজের গর্তে যে গোখরা সাপটা থাকত সে-ও কোথায় যেন চলে গেছে। এই অবস্থায় জঙ্গল বা জঙ্গলের ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে কে লড়াই করতে পারে? বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ক্রমেই সঙ্কুচিত হলো। মাঠের মধ্য দিয়ে যে সব পায়ে চলা পথ ছিল সেগুলি অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠল। অবশেষে এক সময় হাতি আর তার তিন পুত্রের উচ্চ নিনাদে তারা আর অস্থির হলো না, কারণ লুট করে নিয়ে যাবার মতো তাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। জমির উপর বেড়ে ওঠা ফসল আর জমির নিচের বীজ সব কিছু ওরা ধ্বংস করে ফেলেছে। চারপাশের দূরবর্তী মাঠগুলি ইতোমধ্যে তাদের আকৃতি বদলে ফেলেছে। এখন সময় হয়েছে খানিওয়ারায় গিয়ে ইংরেজদের কাছে দয়া ভিক্ষা করার।

কিন্তু নিজেদের চিরকালীন অভ্যাস অনুযায়ী তারা তাদের প্রস্থানের সময়টা দিনের পর দিন পিছিয়ে দিতে থাকল এবং এক সময় প্রথম বর্ষার তোড়ের মধ্যে তারা ধরা পড়ল। তারা তাদের ঘরের ছাদ মেরামত করতে পারে নি। ভাঙা চাল ভেদ করে জল পড়ে বন্যার মতো সব ভাসিয়ে দিল। চারণভূমিতে গোড়ালি ডুবে যাওয়া জল দাঁড়িয়েছে। গ্রীষ্মের গরমের পর সমস্ত জীবন নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এইবার সকালের উত্তপ্ত অঝোর বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে থপথপ করে কাদাজল ভাঙতে ভাঙতে গ্রাম ছেড়ে যাত্রা শুরু করল পুরুষ, নারী ও শিশুর দল। আর স্বাভাবিকভাবেই তারা একবার পেছন ফিরে তাদের ঘরবাড়ির উপর শেষবারের মতো বিদায়ী দৃষ্টিপাত করল।

শেষ পরিবারটি সারি বেঁধে গ্রামের তোরণ পেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দেয়ালের পেছনে একটা প্রচণ্ড ভাঙনের শব্দ শোনা গেল। কড়িবর্গা আর খড়ের চাল সশব্দে নিচে পড়ে গেল। ওরা পেছন ফিরে মুহূর্তের জন্য একটা চকচকে কালো বাঁকানো শুঁড় উঠে আসতে দেখল, তারপরই জলে ভেজা খড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আবার আরেকটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ হলো,

তারপর আবার আরেকটা। তোমরা যেমন অনায়াসে জলপদ্ম ছিঁড়ে আনো হাতি ঠিক তেমনি অনায়াসে কুটিরের ছাদগুলি টেনে খুলে ফেলে দিতে লাগল। একটা বর্গা এসে হঠাৎ তার গায়ে বিঁধল। তার দেহের সমস্ত শক্তি বন্ধনমুক্ত করার জন্য এইটুকুই বাকি ছিল। আর অরণ্যের সকল প্রাণীকুলের মধ্যে একটা ক্ষিপ্ত হাতির মতো আর কেউ এত নির্বিচার ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠতে পারে না। সে পেছনের পা দিয়ে একটা মাটির দেয়ালে ধাক্কা দিল, দেয়ালটা হুড়মুড় করে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল আর গুঁড়ো মাটি বৃষ্টির জলস্রোতের নিচে হলুদ কাচের মধ্যে গলে মিশে গেল। তারপর হাতি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে গাঁয়ের সরু রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো ছুটল, ডানে-বাঁয়ে কুটিরগুলির গায়ে একটু হেলান দিল, কুটিরের দরজাগুলি থরথর করে কেঁপে উঠল, তার তিন পুত্রও তার পেছন পেছন ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে ছুটতে লাগল, তারা ঠিক যেমন করেছিল ভরতপুরের শস্যক্ষেতের ধ্বংসযজ্ঞের সময়।

ওই ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য থেকে একটা ধীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মৌগলির। এই খোলসগুলি অরণ্য সহজেই গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু বাইরের দেয়ালটা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মৌগলির উন্মুক্ত কাঁধ আর বাহুর উপর দিয়ে বৃষ্টি জলস্রোতের মতো গড়িয়ে যাচ্ছিল। সে লাফ দিয়ে একটা দেয়াল থেকে নেমে আসতে আসতে উপরের কথাগুলি বলল।

হাঁপাতে হাঁপাতে হাতি বলল, ঠিক সময়ে সব হবে। ওহ্, কিন্তু ভরতপুরে আমার দাঁত রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল! চল ছেলেরা, এবার বাইরের দেয়াল। মাথা দিয়ে! সবাই এক সঙ্গে। এখন!

চারটি হাতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিল, আর বাইরের দেয়ালটা নড়ে উঠল, ফাঁক হয়ে গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর গ্রামবাসীরা ভয়ে বোবা হয়ে গিয়ে ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কাদামাটি মাখানো হাতিগুলির বিশাল মাথা দেখতে পেল। তারপর গৃহহীন খাদ্যহীন মানুষগুলি উপত্যকা দিয়ে নিচের দিকে ছুটে পালাল, আর পেছনে পড়ে থাকল তাদের গ্রাম, ছিন্নভিন্ন, পদপিষ্ট, গলে নিশ্চিহ্নপ্রায়।

এক মাস পর জায়গাটাকে একটা গোল ঢিবির মতো দেখাল, তার উপর নরম সবুজ নানা জিনিস গজিয়েছে। আর বর্ষার শেষে দেখা গেল যে জায়গায় মাত্র ছ'মাস আগে লাঙল দিয়ে চাষবাস করা হয়েছে এখন সেখানে অরণ্য পূর্ণ দাপটের সঙ্গে সগর্জনে ঢুকে পড়েছে।

লাল কুকুর

অরণ্যের অনুপ্রবেশের পর মৌগলির জীবনের সব চাইতে মধুর পর্ব শুরু হয়। ঋণ পরিশোধের পর বিবেক যে স্বাচ্ছন্দ্য

বোধ করে সে তা অনুভব করছিল। সমস্ত অরণ্য তার বন্ধু, যদিও সবাই তাকে ঈষৎ ভয়ও করে। এক প্রাণীকুল থেকে অন্য প্রাণীকুলের মধ্যে সে যখন ঘুরে বেড়ায়, কখনো একা কখনো তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে, তখন সে যেসব জিনিস দেখেছে ও যেসব শব্দ ও কথা শুনেছে সেসব বলতে গেলে অনেকগুলি গল্প বলতে হবে এবং প্রতিটি গল্পই হবে বর্তমান গল্পের মতো দীর্ঘ। অতএব তোমরা কখনোই শুনবে না মৌগলি কীভাবে মাগুলার পাগল হয়ে যাওয়া হাতিটির সাক্ষাৎ পায় সে গল্প। ওই হাতি বাইশটা বলদকে হত্যা করে।

বলদগুলি এগারোটি গোযানে করে সরকারি খাজাঞ্চিখানা থেকে রুপার মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছিল। মত্ত হস্তী ওই চকচকে টাকাগুলি ধুলায় ছড়িয়ে দেয়। উত্তরের জলাভূমিতে মৌগলি কীভাবে পুরো একটা রাত কুমিরের সঙ্গে লড়াই করেছিল, কুমিরের শক্ত পিঠে লেগে কীভাবে তার চামড়া ছাড়ানোর ছুরিটা ভেঙে যায়; কীভাবে এক বুনো শুয়োর কর্তৃক নিহত একটি লোকের গলায় ঝোলানো আরো লম্বা ও নতুন একটা ছুরি সে সংগ্রহ করে; কীভাবে সে ওই শুয়োরটির পদচিহ্নরেখা অনুসরণ করে তাকে হত্যা করে ছুরিটির ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করে; কীভাবে সে একবার মহা দুর্ভিক্ষের শিকার হয় এবং সে সময় দুরন্ত বেগে ছুটে যাওয়া হরিণের পায়ের নিচে পড়ে সে কীভাবে প্রায় পিষ্ট হতে চলেছিল; কীভাবে সে হাতিকে আরেকবার মানুষের পাতা ফাঁদে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে, ফাঁদের নিচে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার লাঠি পোঁতা ছিল, কীভাবে পরদিনই সে নিজে চিতাবাঘের জন্য পাতা একটা চতুর ফাঁদে পড়ে যায় এবং কীভাবে ফাঁদের উপরদিকের মোটা শক্ত কাঠের বেড়াগুলি চুরমার করে ভেঙে দিয়ে হাতি তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করে; কীভাবে সে জলাভূমিতে বুনো মোষের দুগ্ধ দোহন করেছিল— এসব কাহিনী তোমাদের শোনানো সম্ভব হবে না।

তবে আমাদের একটা গল্প একবারে বলতে হবে। মা ও বাবা-নেকড়ে মারা গেল। মৌগলি তাদের গুহার মুখে একটা বিশাল পাথরের চাঙড় বসিয়ে দিল। তারপর তাদের উদ্দেশে মৃত্যুগীত গাইল। বালুর বয়স অনেক বেড়ে গেছে, এখন তার গা-হাত-পা নাড়াতে বেশ কষ্ট হয়। এমনকি বাঘিরা, যার স্নায়ু ছিল ইস্পাতের মতো আর মাংসপেশি লোহার মতো, সেও তার শিকারের সময় আগের চাইতে সামান্য শ্লথগতি হয়ে পড়েছিল। আকেলা নিছক বয়সের ভারে ধূসর থেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল, এখন তার শুকনো পাঁজর দেখা যায়, হাঁটার সময় মনে হয় সে যেন কাঠের তৈরি, মৌগলিই এখন তার শিকার মেরে দেয়।

সিওনির নেকড়েদল ভেঙে যায়, কিন্তু দলের তরুণ নেকড়েগুলি সদর্পে বেড়ে উঠেছিল। এখন তারা প্রায় চল্লিশটির মতো হয়েছে, কণ্ঠে জোরালো আওয়াজ, পা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বয়স পাঁচ বছরের মতো, কোনো প্রভু নেই তাদের। আকেলা তাদের বলল যে তাদের উচিত দলবদ্ধ হওয়া, অরণ্যের আইন মেনে চলা এবং একজন দলপতির অধীনে কাজ চালিয়ে যাওয়া। স্বাধীন প্রাণীকুলের জন্য তাই সঙ্গত।

এ ব্যাপারের সঙ্গে মৌগলির কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে জানাল যে সে টক ফল খেয়েছে, কোন গাছে ওই ফল ধরে তা সে জানে, কিন্তু যখন ফাওনার পুত্র ফাও লড়াই করে নিজের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করল, নেকড়েদলের প্রভু হলো এবং অরণ্যের আইন অনুযায়ী তার ডাক দিল, গান গেয়ে উঠল, যখন তারাভরা রাতে সেই ডাক ও গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো তখন মৌগলি পুরনো অভ্যাসের দরুন সভার টিলামঞ্চে এসে উপস্থিত হলো। আগের দিনে সে কিছু বলতে চাইলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নেকড়ের দল অপেক্ষা করত, কথা শেষ করে সে ফাওর চাইতে একটু উঁচুতে পাথরের উপর আকেলার পাশে তার আসন গ্রহণ করত। সেই দিনগুলি ছিল শুভ শিকারের ও শুভ নিদ্রার। দলটিকে তখন সবাই বলত মৌগলির প্রাণীকুল আর তাদের এলাকায় বাইরের অচেনা কেউ তাদের জন্য প্রবেশ করার সাহস পেত না। এখন তরুণ নেকড়েগুলি বড় হয়েছে, মোটা হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। অনেক শাবককে পর্যবেক্ষণের জন্য এখন টিলামঞ্চে আনতে হচ্ছে। মৌগলি এসব সময়ে অবধারিতভাবে উপস্থিত থাকত। তার মনে পড়ত সেই রাতের কথা যখন এক কালো চিতা এক উলঙ্গ বাদামি শিশুকে দলের সামনে হাজির করেছিল, যখন ডাক উঠেছিল, দেখো, ভালো করে দেখো, ও নেকড়ের দল। এই সময় তার বুকে একটা দোলা লাগত। এছাড়া সে সারাক্ষণ কাটাত তার ধূসর ভাইকে নিয়ে অরণ্যের দূরদূরান্ত অংশে, নতুন নতুন জিনিসের স্বাদ নিয়ে, তাদের দেখে, স্পর্শ করে, অনুভব করে।

একদিন গোধূলিলগ্নে সে মন্থর গতিতে দুলকি লয়ে পাহাড়ি টিলা পাড়ি দিয়ে আকেলার কাছে আসছিল। সে একটা হরিণ শিকার করেছে, তার অর্ধেকটা আকেলাকে দেবে। পেছন পেছন আসছে তার চার ভাই, হুড়াহুড়ি আর আপোসে পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করতে করতে, নিছক বেঁচে থাকার আনন্দে। এই সময় মৌগলি একটা চিৎকার শুনল। শের খানের অশুভ সময়ের

পর এরকম চিৎকার আর শোনা যায় নি। অরণ্যের এই চিৎকারকে তারা বলে 'ফিয়াল', একটা জঘন্য চিৎকার, বাঘের পেছন পেছন শিকার করার সময় শিয়াল যে ধরনের চিৎকার দেয় সেই রকম, কিংবা কোনো একটা বিশাল শিকার আসন্ন বোঝা গেলে যে ধরনের চিৎকার শোনা যেত সেরকম একটা চিৎকার। একসঙ্গে ঘৃণা, ভয়, হতাশা ও জয়ের আনন্দমিশ্রিত একটা ধ্বনি যদি পা থেকে মাথা পর্যন্ত তোমার দেহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে কল্পনা করতে পারো তাহলে ওয়েনগুঙ্গার উপর দিয়ে ফিয়ালের কাঁপাকাঁপা এবং উঁচু পর্দায় উঠে নিচু লয়ে নেমে আসা এই ধ্বনি সম্পর্কে তুমি কিছুটা ধারণা করতে পারবে। মৌগলির চার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠেছে, তাদের মুখ থেকে চাপা গরগর শব্দ বেরুচ্ছে। মৌগলির হাত চলে গেল তার ছুরির কাছে, ঠিক আছে কিনা দেখে নিল সে। তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস, তার ভ্রু কুঞ্চিত।

সে বলল, ডোরাকাটা কারো সাহস নেই এখানে শিকার করবার। ধূসর ভাই বলল, এটা তার ডাক নয়। বিশাল একটা শিকারযজ্ঞ আসন্ন। শোনো!

আবার ওই ধ্বনি শোনা গেল, আধা ডুকরে ওঠা কান্না, আধা খুকখুক হাসি, যেন শিয়ালটার মানুষের ঠোঁট আছে। মৌগলি সজোরে বুকে নিঃশ্বাস টেনে সভার টিলামঞ্চের দিকে ছুটে গেল। দলের অন্যান্য নেকড়েরাও সে দিকে যাচ্ছিল, মৌগলি তাদের ছাড়িয়ে গেল। ফাও এবং আকেলা শিলাখণ্ডের উপর পাশাপাশি বসে আছে, নিচে বসে অন্য নেকড়েরা, সকলের স্নায়ু টানটান। মায়েরা তাদের শিশুসন্তানসহ দ্রুত নিজেদের গুহায় ফিরে যাচ্ছে। ফিয়ালের চিৎকার শোনা যাবার পর দুর্বল কেউ খোলা প্রান্তরে থাকে না।

ওয়েনগুঙ্গা গলগল করে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। ওই শব্দ আর গাছের উঁচু পত্রপল্লবের মধ্যদিয়ে শনশন আওয়াজ তুলে বয়ে যাওয়ার বাতাসের শব্দ ছাড়া সব নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। এমন সময় হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিল নদীর ওপার থেকে ভেসে আসা এক নেকড়ের ডাক। স্পষ্টতই দলের কোনো নেকড়ে নয়, কারণ দলের সব নেকড়েই এখন এই টিলায়। নেকড়ের ডাকটা ধীরে ধীরে একটা প্রলম্বিত হতাশাচ্ছন্ন চিৎকারে পরিণত হলো। সেটা বলে উঠল, ঢোল! ঢোল! শিলাখণ্ডগুলির উপর ক্লান্ত পদশব্দ শোনা গেল। তারপরই একটা কঠিন কৃশ নেকড়েকে দেখা গেল, তার দেহের দু'পাশে রক্তের দাগ, তার সামনের ডান পা

অকেজো হয়ে গেছে, তার মুখে সাদা ফেনা। সে বৃত্তের মধ্যদিয়ে এগিয়ে এসে মৌগলির পায়ের কাছে এলিয়ে পড়ল।

ফাও গম্ভীর মুখে বলল, শুভ শিকার! তো তোমার দলপতি কে ?

উত্তর এল, শুভ শিকার! আমি ওনতোল্লা। অর্থাৎ সে একা, তার সঙ্গিনী আর বাচ্চাদের নিয়ে কোনো নির্জন গুহায় থাকে। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক নেকড়েই এভাবে থাকে। ওনতোল্লার মানে দলগোষ্ঠীহীন বহির্বাসী, দলের বাইরে বাস করে সে। এই উত্তরটা দেবার পর সে হাঁপাতে থাকল। সবাই দেখল যে তার হৃদস্পন্দন তাকে একবার সামনের দিকে একবার পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ফাও জিজ্ঞাসা করল, কী চলাফেরা করছে ? ফিয়ালের চিৎকার শোনা গেলে সমস্ত অরণ্যই এই প্রশ্ন করে।

ঢোল, দাক্ষিণাত্যের ঢোল, লাল কুকুর, খুনির পাল। তারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসেছে, বলছে যে দক্ষিণ এখন বিরাণ। তারা এগিয়ে আসছে হত্যা করতে করতে। এই চাঁদ যখন নতুন তখন আমার পরিবারে ছিল চারজন, আমার সঙ্গিনী আর তিনটি শিশু। ওদের মা ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরে ওদের শিকার করার রীতিনীতি ও কৌশল শেখাচ্ছিল, কীভাবে হরিণের পালকে তাড়া করতে হবে ইত্যাদি। দুপুর রাতে আমি তাদের সম্মিলিত চিৎকার শুনেছি, হরিণের পদচিহ্নরেখা অনুসরণ করে ছুটেছে ওরা। আর প্রত্যুষে আমি ওদের দেখলাম ঘাসের বুকে মরে শক্ত হয়ে পড়ে আছে, চারজন মুক্ত প্রাণী, চাঁদ যখন নতুন তখন তাই ছিল। তারপর আমি আমার রক্তের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমি ঢোলের খোঁজে বের হই।

মৌগলি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, ওরা দলে কতজন হবে ? আর নেকড়েদলের সবার গলার গভীর থেকে তখন চাপা গর্জনধ্বনি উত্থিত হলো।

জানি না। তবে ওদের মধ্যে তিনজন আর কখনো শিকার করবে না। কিন্তু অবশেষে ওরা আমাকে একটা হরিণের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমাকে আমার তিন পায়ে ভর দিয়ে ছুটতে হয়। দেখো, মুক্ত প্রাণীকুল।

সে তার কাটাছেঁড়া সামনের পা বাড়িয়ে ধরল। সেখানে রক্ত শুকিয়ে গাঢ় কালো রং হয়ে গেছে। তার পার্শ্বদেশে অনেকদূর নিচে পর্যন্ত নির্মম কামড়ের দাগ। তার গলাও ক্ষতবিক্ষত।

মৌগলি আকেলার জন্য যে মাংস এনেছিল আকেলা তার উপর থেকে উঠে পড়ে বলল, খাও। বহির্বাসী সঙ্গে সঙ্গে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তার ক্ষুধার প্রথম ধারটা মিটিয়ে নিয়ে সে বিনীতভাবে বলল, এটা তোমাদের ক্ষতির কারণ হবে না। স্বাধীন প্রাণীকুল, আমাকে আমার শক্তি একটু ফিরে পেতে দাও, তখন আমিও শিকার করব। এই চাঁদ যখন নতুন ছিল তখন আমার গুহা ছিল পূর্ণ। আমার রক্তঋণ এখনো পুরো শোধ করা হয় নি। তার দাঁত মৃত হরিণের পশ্চাদ্দেশের একটা হাড়ের উপর পড়ে কড়কড় শব্দ করে উঠল।

ফাও তা শুনে অনুমোদনের কণ্ঠে বলল, ওই শক্ত চোয়াল আমাদের দরকার হবে। তো ঢোল দলের সঙ্গে কি ওদের বাচ্চারা ছিল ?

না, না। লাল শিকারিরা সবাই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক কুকুরের দল। দাক্ষিণাত্যে যতই টিকটিকি খেয়ে বেঁচে থাকুক ওরা সবাই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী।

ওনতোল্লা ওদের জানাল যে দাক্ষিণাত্যের লাল শিকারিদল শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। ওখানকার নেকড়েদলের জানা ছিল যে বাঘও তার সদ্য মারা শিকারকে ঢোলের হাতে ছেড়ে দেয়। ঢোল দল অরণ্যের মধ্যদিয়ে সোজা ছুটে যায় আর সামনে যা পড়ে তাকেই টুকরো টুকরো করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ওরা নেকড়ের মতো অত বড় নয়, অত চতুরও নয়, কিন্তু ওরা অত্যন্ত বলশালী এবং সংখ্যায় অনেক অনেক। ঢোলরা অন্তত একশো জন না হলে নিজেদেরকে একটা দল বলে না, যেখানে চল্লিশ জন হলেই নেকড়েরা একটা দল গঠন করে ফেলে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মৌগলি একবার দাক্ষিণাত্যের উঁচু ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের একেবারে কিনারা পর্যন্ত গিয়েছিল। সে ওদের ছোট ছোট ফাঁপা কোটরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকতে, খেলা করতে, ও নখ দিয়ে নিজেদের গা আঁচড়াতে দেখেছে। সে তাদের ঘৃণা করত কারণ তাদের গায়ের গন্ধ ছিল মুক্ত প্রাণীদের চাইতে ভিন্ন রকম। কারণ তারা গুহায় বাস করত না, সর্বোপরি এই জন্য যে তাদের আঙুলের ফাঁকে ছিল লোম, যেখানে তার আর তার বন্ধুদের আঙুল ছিল পরিষ্কার, লোমহীন। কিন্তু মৌগলি জানত যে ঢোলদের শিকারি দল একটা অসম্ভব সাংঘাতিক জিনিস। হাতি তাকে সেকথা বলেছে। তাদের দলের সামনে থেকে হাতি পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়। তাদের হত্যা না করা পর্যন্ত অথবা খাদ্যের ঘাটতি না পড়া পর্যন্ত ঢোলরা এগিয়ে যেতেই থাকে।

ঢোলদের সম্পর্কে আকেলারও কিছু জানা ছিল। সে শান্তকণ্ঠে মৌগলিকে বলল, দলপতিহীন একা মারা পড়ার চাইতে পুরো দলের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা

আলালা! মরতে যদি হয় তবে মরব আমরা, তবে এটা চমৎকার একটা শিকারযজ্ঞ হবে।

ভালো। এটা হবে শুভ শিকার— এবং আমার সর্বশেষ। কিন্তু মানুষের জীবনকালের হিসাবে, ছোট্ট ভাই, তোমার সামনে এখনো পড়ে আছে অনেক রাত, অনেক দিন। তুমি উত্তরে চলে যাও, সেখানে শান্তিতে থাকো। ঢোলদের সঙ্গে লড়াইর পর কেউ যদি বেঁচে থাকে তবে সে তোমার কাছে এই লড়াই-এর সংবাদ পৌঁছে দেবে।

মৌগলি গম্ভীরভাবে বলল, তাই ? তাহলে আমাকে জলাভূমি অঞ্চলে যেতে হবে, ধরতে হবে ছোট ছোট মাছ, ঘুমুতে হবে গাছের উপর কিংবা বান্দরলোকের সাহায্য চাইতে হবে, আমাকে বাদাম ভেঙে খেতে হবে, আর নিচে লড়াই করবে আমাদের দল ?

আকেলা বলল, এ লড়াই শেষ হয় মৃত্যুতে। তুমি কখনো ঢোলের, এই লাল খুনিদের, মুখোমুখি হও নি। ডোরাকাটা পর্যন্ত—

মৌগলি অসহিষ্ণুভাবে বলল, একটা ডোরাকাটা বানরকে আমি হত্যা করেছি এবং আমি নিশ্চিত যে শের খান যদি তিন পাহাড়ের ওপার থেকেও বাতাসে ভেসে আসা ঢোলদের গন্ধ পেত তাহলে সে তার সঙ্গিনীকে ওদের খাবারের জন্য ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যেত। এখন শোনো, এক নেকড়ে ছিল আমার বাবা, আরেক নেকড়ে ছিল আমার মা, আরেক বয়স্ক ধূসর নেকড়ে ছিল, এখন সাদা হয়ে গেছে, খুব প্রাজ্ঞও নয়, সে ছিল আমার বাবা ও মা। অতএব আমি— সে তার কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলল এবার, আমি বলছি যে ঢোলরা যখন আসবে, যদি তারা আসে, তখন মৌগলি এবং মুক্ত প্রাণীকুল এক হয়ে লড়বে। আমি বলছি, যে ষাঁড়ের মূল্যে আমাকে ক্রয় করা হয়েছিল তার নামে শপথ করে বলছি, আমার জন্য বাঘিরা যে ষাঁড়ের দাম দিয়েছিল, অনেকদিন আগের ব্যাপার সেটা, তোমাদের মনে থাকবার কথা নয়, সেই ষাঁড়ের নামে শপথ করে আমি বলছি, তোমরা অরণ্যের সব গাছপালা ও নদী শুনে রাখো, যেন আমি ভুলে না যাই, আমি বলছি আমার এই ছুরি হবে সমগ্র দলের জন্য একটা দাঁত এবং আমার মনে হয় না যে এটা তেমন কিছু ভোঁতা একটা অস্ত্র। এই হলো আমার বাণী।

ওনতোল্লা বলল, ওহে নেকড়ের ভাষায় কথা বলা মানুষ, ঢোলকে তুমি চেনো না। আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবার আগে আমি শুধু আমার রক্তঋণ শোধ করতে চাই। তারা চলে সন্তর্পণে, মারতে মারতে এগিয়ে যায়, কিন্তু দুদিনের মধ্যে আমি আমার গায়ের জোর কিছুটা ফিরে পাব, আর তখন আমি আমার রক্তঋণ শোধ করতে ওদের কাছে ফিরে যাব। কিন্তু তোমরা, মুক্ত প্রাণীকুল, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা উত্তরে চলে যাও, আর ঢোলরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অল্প কিছু খেয়েই সন্তুষ্ট থাকো। এই শিকারে খাবার মতো কোনো মাংস নেই।

মৌগলি হেসে উঠে বলল, বহির্বাসীর কথা শোনো! পাছে দৈবক্রমে ঢোলদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায় সে জন্য আমাদের উত্তরে যেতে হবে, সেখানে নদীতীরের ইঁদুর আর টিকটিকি খেয়ে আমাদের জীবনধারণ করতে হবে। আমাদের শিকার-ভূমিতে সে শিকার করবে এবং তার সুবিধা মতো ওই ভূমি আমাদের ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমাদেরকে উত্তরে লুকিয়ে থাকতে হবে! ওটা একটা কুকুর, একটা কুকুরছানা, হলুদ পেটের কুকুর, গুহাহীন, পায়ের আঙুলের ফাঁক লোমে পূর্ণ! আমরা, মুক্ত প্রাণীকুল, আমাদের অবশ্যই পালিয়ে

যেতে হবে এবং মৃত গবাদিপশুর নিকৃষ্ট অংশগুলি খাবার জন্য উত্তরের প্রাণীদের অনুমতি ভিক্ষা করতে হবে! এই প্রবাদটা তো তোমরা সবাই জানো, উত্তর হচ্ছে ইঁদুর আর দক্ষিণ হচ্ছে উকুন। আমরাই হলাম অরণ্য। বেছে নাও, বেছে নাও। শুভ শিকার এটা। সমস্ত দলের জন্য, গুহার জন্য, শিশুদের জন্য, যে সঙ্গিনী হরিণের পেছনে ছোটে তার জন্য, গুহাতে যে বাচ্চারা বসে আছে তার জন্য, সবার জন্য এ একটা চমৎকার শিকার। তাই না? তাই না? তাই না?

দলের সবাই একযোগে গর্জন করে সায় দিল, শব্দ শুনে মনে হলো রাতের অন্ধকারে একটা বিশাল গাছ হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙে পড়ল। সবাই বলল, 'তাই! তাই! তাই!২

মৌগলি তার চার সঙ্গীকে বলল, তোমরা এদের সঙ্গে থাকো। আমাদের প্রতিটি দাঁত দরকার হবে। ফাও আর আকেলাকে লড়াই-এর প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি যাই লাল কুকুরগুলি সংখ্যায় কত গুনে আসি।

ওনতোল্লা আধা উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে ও! রোমলোমহীন ওই রকম একটা প্রাণী লাল কুকুরের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে? মনে রেখো, ডোরাকাটা পর্যন্ত—

মৌগলি মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি যথার্থই বহির্বাসী। যাক, ঢোলগুলি মারা যাবার পর আমরা এ বিষয়ে আবার কথা বলব। সবার উদ্দেশে শুভ শিকার!

সে দ্রুতবেগে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে গেল। উত্তেজনায় টগবগ করছে। কোথায় পা দিচ্ছে ভালো করে তা লক্ষ করছে না। ফলে যা হবার তাই হলো। সে এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে কা'র কুণ্ডলী পাকানো বিশাল শরীরের উপর সটান লম্বা হয়ে পড়ে গেল। কা ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে হরিণের পদচিহ্নরেখা লক্ষ করছিল মনোযোগ দিয়ে।

কা রেগে উঠে বলল, আহ্! এইভাবে হুড়মুড় করে পড়ে একটা রাতের শিকার নষ্ট করা কি কোনো অরণ্যের কাজ?

মৌগলি ওঠে দাঁড়িয়ে বলল, দোষ আমার। শোনো, চ্যাপ্টামাথা, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গে যখনই আমার দেখা হয় আমি দেখি যে তুমি আরো লম্বা হয়েছ, আরো চওড়া হয়েছ। গোটা অরণ্যে তোমার মতো আর কেউ নেই, জ্ঞানী, প্রবীণ, শক্তিমান, এবং সব চাইতে সুন্দর কা।

তোমার মতলবটা কী? কা-'র কণ্ঠস্বর এখন শান্ত। এক পক্ষকাল আগে সব সময় ছুরি নিয়ে চলা এক মানবসন্তান আমার মাথা লক্ষ্য করে পাথর

ছুঁড়েছে, আমাকে যা নয় তাই বলে গাল দিয়েছে, আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘুমিয়ে ছিলাম শুধু সেই জন্য।

মৌগলি কা'র বিচিত্রিত কুণ্ডলীর উপর বসে ধীর গলায় বলল, হ্যাঁ, তাড়িয়ে আনা হরিণদের সে চারদিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, আর ওই একই চ্যাপ্টা মাথা এতটাই কালা হয়ে গিয়েছিল যে সে মৌগলির শিস্ শুনতে পায় নি, হরিণের পথ যে উন্মুক্ত রাখতে হবে সেটা খেয়াল করে নি।

কা বলে চলল, আর এখন ওই মানবসন্তান মধুর মধুর তোষামোদের বাণী নিয়ে সেই চ্যাপ্টামাথার কাছে এসেছে, বলছে সে কত জ্ঞানী, কত শক্তিমান আর কত সুন্দর দেখতে, আর সেই চ্যাপ্টামাথা তার কথা বিশ্বাস করছে, ওই পাথর ছোঁড়া মানবসন্তানকে বসার জন্য এইভাবে জায়গা করে দিচ্ছে— হ্যাঁ, এবার আরাম করে বসেছ তো ? বাঘিরা কি বিশ্রাম করার জন্য তোমাকে এমন সুন্দর আসন করে দিতে পারত ?

কা চিরাচরিত প্রথামতো নিজের শরীরকে পাকিয়ে মৌগলির জন্য একটা নরম দোলনা-বিছানা বানিয়ে দিল। মৌগলি অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে কা'র নমনীয় ঘাড়টা টেনে এনে তার মাথা নিজের কাঁধের উপর স্থাপন করল। তারপর ওই রাতের ঘটনা সে কা'কে খুলে বলল।

সব শুনে কা বলল, আমি জ্ঞানী হতে পারি, কিন্তু আমি যে কালা হয়ে গেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তা না হলে ফিয়ালের চিৎকার ঠিকই আমি শুনতাম। তৃণভোজী প্রাণীগুলি কেন অত অস্থির হয়ে গিয়েছিল তা এখন বুঝতে পারছি। ঢোলরা সংখ্যায় কত হবে ?

আমি ওদের এখনো দেখি নি। আমি প্রথমেই দ্রুতবেগে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি হাতির চাইতেও বয়োবৃদ্ধ। ওহ্ কা— মৌগলি নিছক খুশিতে তার সারা শরীর মোচড়াল—কী চমৎকার শিকার হবে এবার! আমাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক প্রাণীই চাঁদের আগামী পক্ষ দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে।

তুমি কি এর মধ্যে অংশ নিতে চাও ? মনে রেখো তুমি একটা মানুষ, আর এও মনে রেখো কোন দল তোমাকে বের করে দিয়েছিল। নেকড়ের দলকে লাল কুকুরদের বিরুদ্ধে লড়তে দাও। তুমি একটা মানুষ।

মৌগলি বলল, গত বছরের বাদাম এ বছরের কালো ধুলোমাটি। একথা ঠিক যে আমি একটা মানুষ কিন্তু আমার ভালো করে মনে আছে যে আমি আজ রাতেই বলেছি আমি একটা নেকড়ে। আমি নদী আর গাছপালাকে সেকথা মনে

রাখতে বলেছি। ঢোলরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি মুক্ত প্রাণীকুলেরই একজন, কা।

কা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, মুক্ত প্রাণীকুল, নাকি মুক্ত চোরের দল! আর তুমি মৃত নেকড়েদের স্মৃতির স্বার্থে নিজেকে এই মরণজালে জড়ালে? এ শিকার কোনো শুভ শিকার নয়।

কিন্তু আমি আমার বাণী উচ্চারণ করেছি, কা। সব গাছগাছালি জানে, নদী জানে। ঢোলরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমার বাণী আমার কাছে ফিরে আসবে না।

আহ্! আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে উত্তরাঞ্চলের জলাভূমিতে চলে যাব, কিন্তু একটা ছোট্ট ন্যাংটা রোমলোমহীন মানবসন্তানের বাণীও বাণীই। তো, আমি কা বলছি—

ভালো করে ভেবে দেখো, চ্যাপ্টামাথা শেষে তুমিও না নিজেকে মরণজালে জড়িয়ে ফেলো। তোমার কাছ থেকে আমি কোনো বাণী চাই না, কারণ আমি ভালো করেই জানি— কা বাধা দিয়ে বলল, ঠিক আছে, তাহলে আমি কোনো বাণী উচ্চারণ করব না। কিন্তু ঢোলরা এলে তুমি কী করবে? তোমার পেটের মধ্যে কী আছে?

ওদের তো ওয়েনগুঙ্গা সাঁতরে পার হতে হবে। আমি ভেবেছি আমার ছুরি হাতে জলাভূমিতে আমি ওদের মুখোমুখি হব, আমার ঠিক পেছনে থাকবে নেকড়েদল। তারপর ছুরির আঘাত হানতে হানতে, মারামারি করতে করতে, ওদের হয়তো ভাটির দিকে একটু পেছনে ঘুরিয়ে দিতে পারব কিংবা তাদের গলা কিছুটা শীতল করে দিতে সক্ষম হবো।

ঢোলরা কখনো পেছনে ফিরে যায় না, আর তাদের গলা বেশ গরম। শোনো, এই শিকারপর্ব যখন শেষ হবে তখন মানবসন্তানও থাকবে না। নেকড়ে শাবকও থাকবে না, পড়ে থাকবে শুধু কিছু শুকনো হাড়গোড়।

আলালা! মরতে যদি হয় তবে মরব আমরা, তবে এটা চমৎকার একটা শিকারযজ্ঞ হবে। কিন্তু আমার তো বয়স কম, খুব বেশি বর্ষার মৌসুম আমি দেখি নি। আমি জ্ঞানী নই, শক্তিমানও নই। তোমার কি আরো ভালো কিছু পরিকল্পনা আছে, কা?

আমি একশো বৃষ্টির মৌসুম দেখেছি। হাতির দুধদাঁত পড়বার আগেই ধুলোর বুকে আমার চিহ্নরেখা চওড়া হয়ে পড়েছে। আমি অনেক গাছের চাইতে বয়সে বড়। অরণ্যের সব কর্মকাণ্ড আমি দেখেছি।

মৌগলি বলল, কিন্তু এটাতো নতুন ধরনের শিকার। ঢোলরা এর আগে কখনো আমাদের চিহ্নরেখা অতিক্রম করে নি।

যা আছে তা ছিল। যা হবে তাও বছর না ঘুরতেই পেছন দিকে গিয়ে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে। একটু স্থির হয়ে থাকো, আমি আমার ওই বছরগুলি গুনে দেখি।

মৌগলি দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে কা'র কুণ্ডলীর মধ্যে শুয়ে থাকল, আর কা মাটিতে তার মাথা নিশ্চল রেখে ডিমের খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসার পর থেকে সে কী দেখেছে, কী জেনেছে, তার কথা ভাবতে লাগল। তার চোখের আলো যেন নিভে গেল, চোখ দুটি দেখাল নিষ্প্রভ উপল পাথরের মতো। মাঝে মাঝে সে তার মাথা দিয়ে ডানে-বাঁয়ে কঠিন ছোবল মারল, যেন ঘুমের মধ্যে শিকার করছে। আর মৌগলি এই সুযোগে একটু ঘুমিয়ে নিল, কারণ সে জানত যে শিকারে নামার আগে ঘুমের মতো আর কিছু নেই, আর দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে ঘুমিয়ে পড়বার ক্ষমতা সে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিল।

এক সময় সে অনুভব করল যে তার নিচে বিশাল অজগরটি ফুলে উঠছে, তার শরীর আরো বড় আরো চওড়া হচ্ছে, আর ইস্পাতের খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করার মতো তার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ বেরুচ্ছে।

অবশেষে কা বলল, আমি সব মরে যাওয়া ঋতু দেখেছি। বিশাল বিশাল গাছ, প্রবীণ হস্তীকুল, শ্যাওলা জমে উঠবার আগের বিবর্ণ তীক্ষ্ণমুখ শিলাখণ্ড সমূহ— সব আমি দেখেছি। তুমি কি এখনো বেঁচে আছো, ক্ষুদে মানবসন্তান?

মৌগলি বলল, মাত্র অল্প একটু আগে চাঁদ অস্ত গেছে। আমি বুঝতে পারছি না—

শ্‌স্‌স্। এখন আমি আবার কা। আমি জানি অল্প একটু সময় মাত্র পার হয়েছে। এখন আমরা নদীর কাছে যাব, ঢোলদের বিরুদ্ধে কী করতে হবে আমি তোমাকে সেটা দেখাব।

সে ঘুরে ওয়েনগুঙ্গার মূল স্রোতধারার দিকে তীরের মতো সোজা ছুটে গেল। তারপর শান্তি-শিলাকে আড়াল করে রাখা জলাশয়ের একটু উপর থেকে নিচে ঝাঁপ দিল কা। তার পাশেই ছিল মৌগলি।

কা বলল, না, সাঁতার কেটো না। আমি খুব দ্রুত এগিয়ে যাব। আমার পিঠে চড়ে বসো, ছোট্ট ভাইটি।

মৌগলি তার বাঁ বাহু দিয়ে কা'র গলা জড়িয়ে ধরল, ডান বাহু ছড়িয়ে দিল তার শরীর ঘেঁসে, আর নিজের পা দুটি সোজা করে রাখল, তারপর স্রোত উজিয়ে কা যেভাবে এগিয়ে গেল তা একমাত্র কা'র পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাধা পাওয়া জলের ঢেউ সোজা উপর দিকে উঠে একটা ঝালরের মতো হয়ে মৌগলির গলার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল, আর অজগরের দুপাশের জলের ঝাপ্টায় মৌগলির পা দুটি এপাশ ওপাশ করতে থাকল। শান্তি-শিলার দু'এক মাইল উপরে ওয়েনগুঙ্গা সরু হয়ে এসেছে। এক পাশে মার্বেল পাথরের আশি থেকে একশো ফুট উঁচু খাড়ি। এর মধ্যদিয়ে নানা রকমের কুৎসিত-দর্শন পাথরের উপর দিয়ে তীব্র জলস্রোতধারা প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু মৌগলি জলস্রোত নিয়ে মাথা ঘামাল না। এই পৃথিবীর কোনো জলধারাকেই সে ভয় করত না। সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল খাড়ির দু'পাশে আর নাক দিয়ে সে অস্বস্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। বাতাসে একটা টক-মিষ্টি গন্ধ, খুব গরম দিনে পিঁপড়ার ঢিবি যে রকম গন্ধ ছড়ায় সেই রকম গন্ধ। স্বজ্ঞাতাড়িত হয়ে সে তার সম্পূর্ণ শরীর জলের নিচে নামিয়ে দিল, শুধু নিঃশ্বাস নেবার জন্য মাঝে মাঝে মাথা উপরে তুলল। কা একটা ডুবন্ত শিলার চারপাশে তার লেজ দু'বার ঘুরিয়ে নিজেকে সেখানে আটকে রাখল। নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে একটা ফাঁপা গর্ত করে মৌগলিকে সে তার মধ্যে ধরে রাখল।

বালকটি বলল, এটা তো মৃত্যুপুরী। আমরা এখানে কেন এলাম ?

ওরা ঘুমাচ্ছে, কা বলল। হাতি বাঘের জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় না, অথচ হাতি এবং ডোরাকাটা উভয়েই ঢোলদের জন্য পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, আর প্রাণীকুল বলে যে ঢোলরা কারো জন্যই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় না। কিন্তু শিলাখণ্ডের ক্ষুদে প্রাণীরা কি কারো জন্য পথ ছেড়ে দেয় ? আমাকে বলো অরণ্যের প্রভু, অরণ্যের প্রভু কে ?

মৌগলি ফিস ফিস করে বলল, এরা। এটা মৃত্যুপুরী। চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

না, ভালো করে দেখে নাও, কারণ এখন ওরা ঘুমোচ্ছে। আমি যখন সামান্য এতটুকু ছিলাম, তোমার বাহুর সমান, তখন এ জায়গা যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে।

অরণ্যের জন্মলগ্ন থেকে শিলাখণ্ডের ক্ষুদে প্রাণীরা আবহাওয়ার সকল অত্যাচার সহ্য করা ওয়েনগুঙ্গার এই শিলাখণ্ডগুলি ব্যবহার করে আসছে—

ভারতবর্ষের এই ব্যস্ত, ভয়ঙ্কর, কালো মৌমাছিরা, আর মৌগলির খুব ভালো করে জানা ছিল যে খাড়িতে পৌঁছবার আধ মাইল আগে থেকেই সকল চিহ্নরেখা অন্য দিকে ঘুরে যেত। শত শত বছর ধরে ক্ষুদে প্রাণীরা এক ফাটল থেকে অন্য ফাটলে গিয়ে জড়ো হয়েছে, চাক বেঁধেছে, আবার অন্যখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে, বাসি মধুর দাগ ফেলে রেখেছে সাদা মার্বেলের উপর, তারপর আরো ভেতরের অন্ধকার গুহাগুলিতে লম্বা ও গভীর করে চাক বেঁধেছে, যেখানে তা স্পর্শ করবার সাধ্য ছিল না কোনো মানুষ কিংবা পশু কিংবা আগুন কিংবা জলের। দুপাশেই খাড়ির পুরো দৈর্ঘটা মনে হলো কালো ঝলমলে মখমলের পর্দায় আবৃত। এসব দেখতে দেখতে মৌগলি জলের নিচে ডুব দিল। ওগুলি ছিল লক্ষ লক্ষ জমাট বাঁধা ঘুমন্ত মৌমাছি। শিলাখণ্ডের গায়ে আরো লেগে ছিল অন্যান্য চাক, মালা বা ঝালরের মতো জিনিস, জীর্ণ গাছের কাণ্ড, বিগত কয়েক বছরের পরিত্যক্ত মৌমাছির চাক, কিংবা খাড়ির বায়ুহীন ছায়ায় নবনির্মিত নতুন নগরী, আর পচা গলা আবর্জনার বিশাল বিশাল স্তূপ যা গড়িয়ে নিচে নেমে এসেছে উপর থেকে, তারপর শিলাখণ্ডের গায়ে লেগে থাকা গাছ আর লতাপাতার মধ্যে আটকে গেছে। মৌগলি একাধিকবার মৌমাছির চাকের ঝরঝর মরমর শব্দ শুনল, কোথাও কোনো অন্ধকার কক্ষগুলিতে সেই চাকগুলি খসে পড়ে যাচ্ছে, তারপরই শোনা গেল অসংখ্য ক্রুদ্ধ পাখার ভোঁ ভোঁ গুঞ্জন আর অপচয়িত মধুর টুপ টুপ করে ঝরে পড়ার শব্দ, এক সময় যা কোনো একটা খাঁজে আটকে যাচ্ছে, তারপর আবার ঝরে পড়ছে ডালপালার উপর। নদীর এক পাশে একটা ছোট বেলাভূমি ছিল, পাঁচ ফুটের বেশি চওড়া হবে না, সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল অগণিত বছরের জঞ্জাল মরা মৌমাছি, ঝেঁটিয়ে আনা আবর্জনা, মৌমাছির বাসি চাক, মধুর খোঁজে আসা লুটেরা পতঙ্গের দল, সব হুড়মুড় করে পড়ে এখন নির্মাণ করেছে মসৃণ সূক্ষ্ম কালো ধুলোর স্তূপ। যাদের পাখা নেই কিংবা যারা ক্ষুদে প্রাণীগুলি সম্পর্কে অবহিত তাদের ত্রস্তভীত করে তোলার জন্য এ জায়গার তীব্র গন্ধই ছিল যথেষ্ট।

কা আবার উজান বেয়ে এগিয়ে গেল। অবশেষে সে খাড়ির মাথায় একটা বালির ঢিবির কাছে এসে থেমে বলল, দেখো, এই মৌসুমের শিকার।

তীরে পড়েছিল গোটা দুই তরুণ হরিণ ও একটা মোষের কঙ্কাল। মৌগলি দেখল যে কোনো নেকড়ে বা শিয়াল এই হাড়গোড় স্পর্শ করে নি। কঙ্কালগুলি পড়ে ছিল স্বাভাবিকভাবে।

আর সামনেই তারা শুনতে পাচ্ছে সিওনি নেকড়েদলের যুদ্ধের আহ্বান

মৌগলি অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, ওরা সীমানার বাইরে চলে এসেছিল, আর ক্ষুদে প্রাণীগুলি ওদের মেরে ফেলেছে। চলো, ওরা জেগে উঠবার আগেই আমরা চলে যাই।

ভোরের আগে ওরা উঠবে না, কা বলল। এবার শোনো, বহু বহু দিন আগে দক্ষিণ থেকে তাড়া খাওয়া এক হরিণ এখানে এসেছিল। এই অরণ্য ছিল তার অচেনা। তাকে তাড়া করে তার পেছন পেছন এসেছিল এক দল নেকড়ে, শিকারের নেশায় অন্ধ-উন্মত্ত। ভয়ে দিশেহারা হয়ে হরিণটা নিচে লাফ দেয়। সূর্য তখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি সংখ্যায় বিপুল, ভীষণ ক্রুদ্ধ তারা। নেকড়েদলের মধ্যে যারা ওয়েনগুঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তারাও সংখ্যায় ছিল অনেক। কিন্তু জল স্পর্শ করবার আগেই তারা মারা পড়ে। যারা ঝাঁপ দেয় নি তারাও শিলাখণ্ডের উপর মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু হরিণটি বেঁচে যায়।

কেমন করে ?

কারণ সে ছিল সর্বাগ্রে, সে ছুটেছিল প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে আর মৌমাছির ঝাঁক মারণযজ্ঞে মেতে উঠবার আগেই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তার পেছন পেছন আসা নেকড়ের দল মৌমাছিগুলির নিছক ওজনের ভারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মৌগলি ধীরে ধীরে পুনরুচ্চারণ করল, কিন্তু হরিণটা বেঁচে যায়?

অন্তত তখন মরে নি, যদিও জলের মধ্যে তাকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য কোনো মোটা কালা হলুদ চ্যাপ্টামাথা তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল না, দাক্ষিণাত্যের সমস্ত ঢোলরা এক মানবসন্তানকে তাড়া করে এলেও তার জন্য এই কা যেমন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে তেমন কেউ ছিল না ওই হরিণের। তো তোমার পেটের মধ্যে কী হচ্ছে? কা'র মাথা তখন মৌগলির কানের খুব কাছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৌগলি বলল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে মৃত্যুর গোঁফ টেনে উপড়ে ফেলি। কিন্তু, কা, তুমি নিশ্চিতভাবেই সমগ্র অরণ্যের মধ্যে সব চাইতে প্রাজ্ঞ প্রাণী।

অনেকেই সে কথা বলেছে। এখন শোনো, ঢোলরা যদি তোমার পেছন পেছন আসে—

অবশ্যই আসবে। হো! হো! আমার জিভের তলায় অজস্র ছোট ছোট কাঁটা আছে, আমি সেগুলি তাদের গায়ের চামড়ায় বিঁধিয়ে দেব।

তারা যদি রাগে অন্ধ-উন্মত্ত হয়ে তোমার পেছনে ছুটে আসে, যদি শুধু তোমার কাঁধের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তাহলে যারা উপরে মারা পড়বে না তারা হয় এখান থেকে কিংবা আরেকটু নিচের দিক থেকে নদীতে ঝাঁপ দেবে, কারণ ততক্ষণে ক্রুদ্ধ মৌমাছির দল তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে। আর ওয়েনগুঙ্গা হচ্ছে একটা বুভুক্ষু নদী, আর তাদেরকে ধরে রাখবার জন্য কোনো কা সেখানে থাকবে না। তারা তখন, তাদের মধ্যে যে কজন বেঁচে থাকবে তারা তখন, ভেসে যাবে সিওনি গুহাগুলির দিকে, আর নেকড়েদল সেখানে অপেক্ষা করে থাকবে তাদের গলা কামড়ে ধরার জন্য।

আহাই! ইয়োওয়াওয়া! এর চাইতে চমৎকার শিকার আর হতে পারে না। এখন বাকি আছে শুধু ছুটে চলা আর লাফ দেয়া। আমি ঢোলদের কাছে আমার অবস্থান জানিয়ে দেব আর ওরা একেবারে খুব কাছাকাছি আমার পেছন পেছন ছুটে আসবে।

উপরের ওই টিলাটা লক্ষ করেছ? প্রান্তরের দিকে?

না তো। ভুলে গিয়েছিলাম। যাও, দেখো গিয়ে। সমস্তটা পচা জমি, অজস্র গর্তে পূর্ণ। একবার তোমার অসতর্ক পা তার মধ্যে পড়লে সব শিকারের ওখানেই ইতি ঘটবে। শোনো, আমি তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি। আমি নেকড়েদলকে খবর দিয়ে আসি কোথায় ঢোলদের জন্য তাদের নজর রাখতে হবে। আমার কথা যদি বলি, তাহলে বলতে হয় আমি আর নেকড়েকুল এক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ি না।

কোনো পরিচিত জনকে অপছন্দ করলে অরণ্যের প্রাণীকুলের মধ্যে কা'র মতো অপ্রীতিকর কেউ হতে পারত না। সম্ভবত বাঘিরা ছাড়া। সে নদীর নিচের দিকে সাঁতরে চলে গেল। টিলার উলটো দিকে সে ফাও আর আকিলার দেখা পেল। ওরা দুজন বসে বসে রাত্রির নানা শব্দ শুনছিল।

কা প্রফুল্ল গলায় বলল, শ্‌স্! কুকুর। ঢোলের দল নদীর নিচের দিকে ভেসে আসবে। তোমরা ভয় না করলে অগভীর জলের মধ্যে তাদের মেরে ফেলতে পারবে।

ফাও জিজ্ঞাসা করল, ওরা কখন আসবে ? আর আকেলা জানতে চাইল, আমার মানবশিশুটা কোথায় ?

কা জবাব দিল, ওরা যখন আসবে তখন আসবে। অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে। আর তোমার মানবশিশু, যার কাছ থেকে তুমি বাণী আদায় করে নিয়েছ আর সে জন্য সে এখন নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তোমার মানবশিশু আমার সঙ্গে আছে, আর সে যদি ইতোমধ্যে মারা না গিয়ে থাকে তার জন্য তুমি দোষী হবে না! ঢোলের পালের জন্য এখানে অপেক্ষা করো, আর মানবশিশু ও আমি যে তোমাদের পক্ষ নিয়ে লড়ছি সেজন্য খুশি হও।

কা আবার দ্রুতবেগে উজান বেয়ে উপরের দিকে উঠে এসে খাড়ির ঠিক মাঝখানে নিজের অবস্থান নিল। খাড়া পাহাড়ের উপর দিকে তাকাবার অল্পক্ষণের মধ্যে সে মৌগলির মাথাটা নড়তে দেখল। তার পেছনে তারাভরা আকাশ। পরমুহূর্তে বাতাসের বুক চিরে একটা হুশ্ শব্দ শোনা গেল। তারপর একটা তীক্ষ্ণ পরিচ্ছন্ন আওয়াজ তুলে একটা দেহ নিচে নেমে এলো, প্রথমে তার দু'টি পা, তারপর তার গোটা দেহটি। পরমুহূর্তে বালকটিকে দেখা গেল কা'র কুণ্ডলীর মধ্যে আরাম করে বসে আছে।

মৌগলি শান্ত গলায় বলল, এটা রাতের অন্ধকারে কোনো লাফ দেয়া নয়। নিছক ক্রীড়ার উদ্দেশ্যে আমি এর দ্বিগুণ উঁচু থেকে লাফ দিয়েছি। কিন্তু উপরের

ওই জায়গাটা খুবই অশুভ— নিচু ঝোপঝাড় আর অনেক নিচে গভীরে নেমে যাওয়া গিরিখাদ, সব ক্ষুদে প্রাণীদের দ্বারা পূর্ণ। আমি তিনটা গিরিখাদের মুখে মস্ত বড় পাথরের চাঙড় বসিয়ে দিয়েছি। পরে দৌড়ে ছুটে যাবার সময় আমি পা দিয়ে সেগুলি সরিয়ে ফেলে দেব, আর ক্ষুদে প্রাণীগুলি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পিছু নেবে।

কা বলল, এই হলো মানুষের কথা আর মানুষের চাতুরী। কিন্তু, ছোট্ট ভাই, ক্ষুদে প্রাণীগুলি সর্বদাই রেগে থাকে।

গোধূলির সময় পাখাবিশিষ্ট সব প্রাণী, কাছের ও দূরের, কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেয়। আমি ওই গোধূলির সময় ঢোলদের নিয়ে কিছু খেলা করব, কারণ ওদের সর্বোত্তম শিকারের সময় হলো দিনের বেলা। এখন তারা ওনতোল্লার রক্তচিহ্নরেখা অনুসরণ করছে।

ঢিল কখনো মরা ষাঁড়কে ছেড়ে যায় না। ঢোলরাও কখনো রক্তচিহ্নরেখা ত্যাগ করে না, বলল কা।

তাহলে আমি এবার ওর জন্য নতুন এক রক্তচিহ্নরেখা বানাব, ওর নিজের রক্ত দিয়ে। যদি পারি আমি ঢোল দলপতিকে কাদামাটি খাওয়াব। কা, আমি ঢোলদের নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করবে তো ?

যদি না অরণ্যের মধ্যে ওরা তোমাকে মেরে ফেলে, কিংবা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার আগেই ক্ষুদে প্রাণীগুলির হাতে তুমি যদি প্রাণ বিসর্জন না দাও।

অরণ্যের একটি প্রবাদ উদ্ধৃত করে মৌগলি বলল, যখন আগামী কাল আসবে তখন আমরা আগামী কালের শিকার করব। তারপর সে বলল, যখন আমি মারা যাব তখন মৃত্যুগীত গাইবার সময় হবে। শুভ শিকার, কা!

সে অজগরের গলা থেকে নিজের হাত খুলে খাড়ির জলে লাফিয়ে পড়ে দূরের তীরের দিকে এগিয়ে গেল। একটু পরে সে দেখা পেল শিথিল শান্ত জলরাশির। নিছক খুশিতে সে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। তার নিজের কথায় মৃত্যুর গোঁফ টানার চাইতে, আর সে যে অরণ্যের সর্বোচ্চ প্রভু এটা অরণ্যকে জানিয়ে দেবার চাইতে, বেশি ভালো আর সে কিছু বাসত না। বালুর সাহায্য নিয়ে সে গাছ থেকে ঝুলে থাকা মৌমাছির চাক অনেকবার ভেঙে নিয়ে এসেছে। সে জানত যে ওই ক্ষুদে প্রাণীগুলি রসুনের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। তাই এখন সে ছোট এক পুঁটুলি রসুন যোগাড় করে সেটা একটা গাছের বাকলের দড়িতে বেঁধে সঙ্গে নিল, তারপর ওনতোল্লার রক্তচিহ্নরেখা অনুসরণ করে এগিয়ে

চলল। ওই রেখা নেকড়ে গুহাগুলির সামনে থেকে প্রায় পাঁচ মাইলের মতো দক্ষিণে চলে গেছে। মৌগলি চলতে চলতে তার মাথা একপাশে হেলিয়ে উপরের বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে উঠল।

সে আপন মনে বলল, আমি ব্যাঙ-মৌগলি হয়েছি। আমি নিজে বলেছি যে আমি নেকড়ে-মৌগলি। এবার হরিণ-মৌগলি হবার আগে আমাকে হতে হবে বানর-মৌগলি। আর সব শেষে আমি হব মানুষ-মৌগলি। হো! বলতে বলতে সে তার ছুরির আঠারো ইঞ্চি ফলার গায়ে আলতোভাবে তার বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিল। ওনতোল্লার পদচিহ্নরেখার কালো ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখা গেল। ঘন বড় বড় গাছের অরণ্যের মধ্যদিয়ে ওই রেখা এক সময় পূর্ব-উত্তর দিকে চলে গেল। মৌমাছিদের শিলাখণ্ডে পৌঁছবার দু'মাইল আগে থেকে গাছের সংখ্যা ক্রমে কমে আসতে থাকে। শেষ গাছটি থেকে মৌমাছিদের শিলাখণ্ডের ঝোপঝাড় পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর, সেখানে একটা নেকড়ের লুকিয়ে পড়বার মতো কোনো জায়গা নেই। মৌগলি গাছের তলা দিয়ে দুলকি চালে ছুটে চলল, উপরে তাকিয়ে এক শাখা থেকে আরেক শাখার দূরত্ব যাচাই করে নিল, কখনো কখনো একটা গাছের কাণ্ড বেয়ে উপরে উঠে এক গাছ থেকে আরেক গাছে পরীক্ষামূলক লাফ দিল, আর এইভাবে অবশেষে সে এসে পৌঁছল উন্মুক্ত প্রান্তরের সীমানায়। সেখানে সে একঘণ্টা ধরে চারপাশ খুব সতর্কতার সঙ্গে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেখানে ওনতোল্লার চিহ্নরেখা ছেড়ে এসেছিল আবার সেখানে ফিরে গেল ও তারপর আর একটা গাছ বেছে নিয়ে তার উপর চড়ে বসল। মাটি থেকে প্রায় আট ফুট উঁচুতে গাছটির একটা শাখা বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। মৌগলি সেখানে আরাম করে অবস্থান নিয়ে তার পায়ের পাতায় ঘষে ঘষে নিজের ছুরিটাকে আরো ক্ষুরধার করে তুলল। তারপর আপন মনে গান ধরল।

মধ্যাহ্নের অল্প আগে, সূর্য যখন ভয়ানক উত্তপ্ত, সে তখন অনেকগুলি পায়ের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ শুনল আর তার নাকে পেল ঢোলবাহিনীর জঘন্য গন্ধ। অল্প পরেই সে তাদেরকে ওনতোল্লার রক্ত চিহ্নরেখা ধরে চরম নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে দ্রুত ছুটে যেতে দেখল। উপর থেকে দেখলে একটা লাল ঢোলকে আকারে নেকড়ের অর্ধেকের চাইতেও ছোট বলে মনে হয়, কিন্তু তার পা ও চোয়ালের প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে মৌগলি অবহিত ছিল। সে ঢোল দলপতির সরু পিঙ্গল মাথা দেখতে পেল। মৌগলি তার উদ্দেশে বলল, শুভ শিকার!

হিংস্র পশুটি থমকে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকাল। তার পেছন পেছন আসা অনেক অনেকগুলি লাল কুকুরও দাঁড়িয়ে পড়ল, নিচের দিকে ঝোলা লেজ, ভারি কাঁধ, ঈষৎ দুর্বল পশ্চাদ্দেশ, রক্তপিপাসু মুখ। ঢোলরা সাধারণত নীরব প্রাণী। নিজেদের অরণ্যেও তাদের কোনো আদবকায়দার বালাই নেই। মৌগলির নিচে অন্তত দুশো ঢোল জড়ো হয়েছে। তাদের দলপতি ক্ষুধার্ত নাক-মুখ নিয়ে ওনতোল্লার চিহ্নরেখা শুঁকছে, তার দলকে দ্রুত ওই পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা হতে দেয়া যাবে না, তাহলে তারা উজ্জ্বল দিনের আলোতে নেকড়ে গুহাগুলির সামনে পৌঁছে যাবে, সন্ধ্যার অন্ধকার না নামা পর্যন্ত মৌগলি ঢোলদের এই গাছের তলায় আটকে রাখতে চায়।

মৌগলি প্রশ্ন করল, কার অনুমতি নিয়ে তোমরা এখানে এসেছ ? উত্তর এলো, সব অরণ্যই আমাদের অরণ্য। যে এই উত্তর দিল সে তার তীক্ষ্ণ সাদা দাঁত মেলে ধরল। মৌগলি নিচের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর দাক্ষিণাত্যের লাফানো-ইঁদুর চিকা'র তীক্ষ্ণ কিচিমিচি নিখুঁতভাবে অনুকরণ করল। মৌগলি ওদের বোঝাতে চাইল যে সে ঢোলদের চিকা'র চাইতে বেশি কিছু মনে করে না। লাল কুকুরের দল মৌগলির গাছের তলায় ঘন হয়ে জড়ো হলো, তাদের দলপতি হিংস্র চিৎকার করে উঠল, মৌগলিকে গেছো বানর বলে গাল দিল। উত্তরে মৌগলি তার একটা অনাবৃত পা সামনে বাড়িয়ে দিল আর তার পায়ের আঙুলগুলি দোলাতে লাগল ওদের দলপতির ঠিক মাথার উপরে। ওই ছিল যথেষ্ট। সমস্ত দল রাগে উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের পায়ের আঙুলের ফাঁকে লোম আছে তারা কারো কাছ থেকে সেকথা শুনলে অসম্ভব ক্ষেপে যেত। লাল কুকুরদের দলপতি উপর দিকে একটা লাফ দিতেই মৌগলি চকিতে তার পা সরিয়ে নিয়ে মধুরভাবে বলল, কুকুর! লাল কুকুর! দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে টিকটিকি ধরে ধরে খাও। তোমার ভাই চিকা'র কাছে যাও— কুকুর, কুকুর, লাল কুকুর! তোমার আঙুলের প্রতি ফাঁকে ফাঁকে লোমের সমারোহ! সে দ্বিতীয়বার তার নিজের আঙুলগুলি ওদের সামনে দোলাল।

ওরে রোমলোমহীন বানর, একবার শুধু নেমে আয়। তোকে উপোস রেখে রেখে মেরে ফেলবার আগে একবার নেমে আয়! লাল কুকুরের দল চিৎকার করে কথাগুলি বলল। মৌগলি ঠিক এটাই চাইছিল। সে তার গাছের ডালে নিজ দেহ এলিয়ে দিল, গাল পেতে রাখল গাছের বাকলে, ডান হাতটা খালি রাখল, তারপর ঢোলদের স্বভাবচরিত্র, আচারআচরণ, সঙ্গী-সঙ্গিনী, ছানাপোনা সম্পর্কে

সে কী ভাবে, কী জানে, সব একনাগাড়ে বলে গেল। ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের জন্য অরণ্যের প্রাণীকুল যে রকম তিক্ত হুলফোটানো ভাষা ব্যবহার করে তেমন ভাষা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মৌগলি কা'কে বলেছিল যে তার জিভের নিচে অনেক ছোট ছোট কাঁটা আছে, এখন সে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে ওই কাঁটাগুলি তাদের গায়ে ফুটিয়ে প্রথমে নীরবতা থেকে চাপা গর্জনে, চাপা গর্জন থেকে উচ্চ চিৎকারে, উচ্চ চিৎকার থেকে উন্মত্ত প্রলাপে নিয়ে গেল। আর ওই সারাক্ষণ মৌগলির ডান হাত তার পাশে বাঁকা হয়ে পড়ে রইল, আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত আর সে তার পা দুটি শক্ত করে আটকে রাখল গাছের শাখায়। বড় পিঙ্গল বর্ণের কুকুর-দলপতি বহুবার উপরের দিকে লাফ দিয়েছে, কিন্তু মৌগলি কোনো রকম ভুল করার ঝুঁকি নিতে সাহস পায় নি। অবশেষে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে অতিক্রম করে লাল কুকুরদলের নেতা মাটি থেকে প্রায় সাত-আট ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। আর তক্ষুণি মৌগলির একটা হাত গেছো সাপের মতো বিদ্যুৎবেগে প্রসারিত হয়ে সবলে ওর টুঁটি চেপে ধরে তাকে গাছের উপর টেনে আনতে চেষ্টা করল। তার ওজনের ভারে গাছের শাখা থরথর করে কেঁপে উঠল। একবার মনে হলো মৌগলি বুঝি ওই ওজনের ভারে মাটিতে পড়ে যাবে, কিন্তু সে তার বজ্রমুষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও শিথিল করে নি। এবার সে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে পশুটাকে টেনে গাছের শাখার উপরে তুলল। ওটা নিচের দিকে ঝুলে থাকল একটা জলে ডোবা শিয়ালের মতো। বাঁ হাত দিয়ে মৌগলি তার ছুরি তুলে আনল, তারপর ঢোল দলপতির লাল ঝাঁকড়া লেজ একটানে কেটে ফেলে পশুটিকে আবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ব্যস, এটুকুই মৌগলির দরকার ছিল। এখন মৌগলিকে হত্যা না করা পর্যন্ত অথবা মৌগলির হাতে নিজেরা নিহত না হওয়া পর্যন্ত লাল কুকুরের দল আর এখান থেকে নড়বে না। তারা গাছটা ঘিরে বৃত্তাকারে মাটিতে বসে পড়ল, তাদের পশ্চাদ্দেশ থরথর করে কাঁপছে। মৌগলি আরো একটু উপরে উঠে গাছের দুটি শাখার সংযোগস্থলে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল, তারপর ঘুমিয়ে গেল।

তিন-চার ঘণ্টা ঘুমোবার পর সে জেগে উঠে কুকুরগুলি গুনে দেখল। সবাই নিচে বসে আছে, নীরব, কর্কশ, রুক্ষ, চোখগুলি ইস্পাতের মতো। সূর্য অস্ত যেতে আরম্ভ করেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে শিলাখণ্ডের ক্ষুদে প্রাণীগুলি তাদের দিনের কাজ শেষ করবে। আর, তোমরা জানো, গোধূলির সময়টা ঢোলদের

জন্য সর্বোৎকৃষ্ট লড়াই-এর সময় নয়। মৌগলি গাছের একটা ডালে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার এত প্রভুভক্ত পাহারাদারের দরকার ছিল না। কিন্তু আমি এটা মনে রাখব। তোমরা আসলেই সত্যিকার ঢোল, তবে আমার বিবেচনায় বড় একপেশে। সেজন্য তোমাদের টিকটিকি-খেকো দলপতিকে তার লেজটা আমি ফেরত দিচ্ছি না। তোমরা খুশি, তাই না?

গাছের কাণ্ড আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুকুর দলপতি চিৎকার করে বলল, আমি নিজে আমার নখ দিয়ে তোর পেট চিরে ফেলব! মৌগলি বলল, না, দাক্ষিণাত্যের বিজ্ঞ ইঁদুর। তবে একটা জিনিস বিবেচনা করে দেখো। এখানে এখন অনেক লাঙুলহীন লাল কুকুরকে দেখা যাবে, তাদের পশ্চাদ্দেশের রক্তাক্ত মুড়া দেখা যাবে, গরম বালুর উপর বসলে সেখানে জ্বালা করবে। বাড়ি যাও, লাল কুকুর, এবং চিৎকার করে জানিয়ে দাও যে একটা বানর এই কাণ্ড করেছে। যাবে না? তাহলে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাদের আরো বিজ্ঞ বানিয়ে দেব।

বান্দরলোকের মতো সে এক লাফে পরের গাছে চলে গেল, তারপর তার পরের গাছে, তারপর তার পরের গাছে, আর কুকুরের দল তাদের ক্ষুধার্ত মাথা উঁচু করে মৌগলিকে অনুসরণ করল। মাঝে মাঝে মৌগলি এমন ভাণ করল যেন সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, আর তখন তার হত্যাযজ্ঞে উপস্থিত থাকার উদ্দেশ্যে লাল কুকুরের দল একজনের উপর আরেকজন হুমড়ি খেয়ে সেদিকে ছুটল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ছুরি হাতে একটা বালক, গাছের উপরের দিকের শাখা দিয়ে চলার সময় অস্তগামী সূর্যের আলো তার ছুরির উপর পড়ে ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠেছে, আর তলা দিয়ে ঘন দলবদ্ধ লাল কুকুরের দল তাকে অনুসরণ করে ছুটে চলেছে, তাদের গায়ের লাল ত্বক আগুনের মতো জ্বলছে। শেষ গাছটায় পৌঁছে মৌগলি রসুনের পুঁটুলিটা বার করে তার সারা গায়ে সযত্নে রসুন কচলে মেখে নিল, আর নিচ থেকে ঢোলরা ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে বলল, হে নেকড়ের ভাষায় কথাবলা বানর, তুই কি ভেবেছিস আমাদের কাছ থেকে তুই তোর গায়ের গন্ধ লুকিয়ে রাখতে পারবি? আমরা মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত তোকে অনুসরণ করব।

মৌগলি পেছন ফিরে যে পথে সে এসেছিল সেদিকে লাল কুকুরের লেজটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় দলের সবাই একযোগে সেদিকে ছুটে গেল, আর তখুনি শোনা গেল মৌগলির কণ্ঠস্বর, এবার তা হলে আমাকে অনুসরণ কর— মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত।

সে গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে পিছলে দ্রুত নেমে এসেছিল। ঢোলরা তার উদ্দেশ্য বুঝবার আগেই সে বাতাসের বেগে মৌমাছিদের শিলাখণ্ডের দিকে ছুটতে শুরু করল।

ঢোলরা সবাই একসঙ্গে একবার একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে লম্বা পা ফেলে মৌগলির পেছনে ছুটল। ওই ছোটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রাণীই টিকতে পারত না। মৌগলি জানত যে কুকুরকুলের ছোটার গতিবেগ নেকড়েদের চাইতে কম, তা না হলে খোলা মাঠে একেবারে চোখের সামনে সে দুমাইলের মতো জায়গা অতিক্রম করার ঝুঁকি কখনোই নিত না। কুকুরদল নিশ্চিত ছিল যে অবেশেষে এবার বালকটি তাদের মুঠোয় এসে যাবে, আর মৌগলি নিশ্চিত ছিল যে কুকুরদল নিয়ে সে এখন তার ইচ্ছেমতো খেলা করতে পারবে। মৌগলির একমাত্র চিন্তা ছিল, সে যেন ওদেরকে তার পেছনে যথেষ্ট উত্তেজিত অবস্থায় রাখতে পারে, ওরা যেন কোনো এক সময়ে হতাশ হয়ে রণে ভঙ্গ না দেয়। সে ছুটতে লাগল এক তালে, চমৎকার ছন্দ বজায় রেখে; কর্তিত লেজবিশিষ্ট কুকুরদলনেতা তার ঠিক পাঁচ গজ পেছনে; এভাবে কুকুরদল তার পেছন পেছন পৌনে-এক মাইলের মতো জায়গা অতিক্রম করল। ওরা তখন ভীষণ ক্ষিপ্ত, মৌগলিকে হত্যা করার নেশায় উন্মাদ। মৌগলি তার কানের উপর নির্ভর করে কুকুরদল থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখছিল। মৌমাছিদের শিলাখণ্ড চোখের পলকে পার হবার জন্য সে তার শক্তির শেষ বিন্দু সংরক্ষিত রাখছিল।

ক্ষুদে প্রাণীগুলি গোধূলি নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটা দেরিতে ফোটা ফুলের ঋতু নয়। কিন্তু ফাঁপা মাটিতে মৌগলির প্রথম পদপাত ফাঁপা আওয়াজ তুলতেই মৌগলির মনে হলো সে যেন সমস্ত পৃথিবীকে গুঞ্জন করতে শুনছে। তখন সে এমন ছোটা ছুটল যেরকম ছোটা সে তার জীবনে ইতিপূর্বে কখনো ছোটে নি। সে ছুটতে ছুটতে অন্ধকারের মধ্যে একটা দু'টা তিনটা প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ মিষ্টি গন্ধ-ছড়ানো গিরিখাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল। একটা গুহার মধ্যে সমুদ্রগর্জনের মতো গর্জন শুনল মৌগলি। তার চোখের কোনা দিয়ে সে দেখল যে তার পেছনে সমস্ত বাতাস ঘন কালো হয়ে গেছে। সে অনেক নিচে ওয়েনগুঙ্গার জলধারাকে বয়ে যেতে দেখল, আর সে জলের মধ্যে দেখল একটা হীরকখণ্ডের আকারের চ্যাপ্টা মাথা। মৌগলি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিল, তার কাঁধের কাছে লাঙুলহীন ঢোলটা হাওয়ার মধ্যে লাফিয়ে উঠে ক্ষিপ্ত চিৎকার করছিল। মৌগলি আগে পা বাড়িয়ে চমৎকারভাবে নদীর জলের

নিরাপত্তায় ডুব দিল। সে বিজয়ী, যদিও তার দম প্রায় ফুরিয়ে আসছিল। মৌমাছিরা তার গায়ে একটা হুলও বসাতে পারে নি। যে সামান্য কয়েক মুহূর্ত সে ওদের মধ্যে ছিল তখন রসুনের গন্ধের জন্য ওরা তার কাছে ঘেঁষতে পারে নি। জলের তলা থেকে সে উপরে উঠে আসতেই কা নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে ধরে তাকে সুস্থির করল। তখন উপরে পাহাড়ের ধার ঘেঁসে লাফিয়ে লাফিয়ে কী সব জিনিস যেন ছুটছে, বড় বড় জমাটবাঁধা মৌমাছির ঝাঁক, নিচের দিকে নেমে আসছে অজস্র পাথরের টুকরার মতো। কিন্তু জল স্পর্শ করার আগেই মৌমাছিগুলি আবার উপরের দিকে উড়ে চলে গেল, আর একটা ঢোলের দেহকে দেখা গেল প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে নিচের দিকে ভেসে যাচ্ছে। উপর থেকে তখন ভেসে আসছিল হিংস্র চিৎকারের শব্দ কিন্তু কুকুরদলের ওই শব্দও ডুবে যাচ্ছিল সমুদ্রের তরঙ্গমালার প্রবল গর্জনের মতো এক ধ্বনিতে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে প্রাণীর পাখার গর্জনের ধ্বনি। কয়েকটি ঢোল ভূগর্ভস্থ গুহার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী গিরিখাদের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে তারা ভেঙে পড়া মৌচাকের চারপাশে গুঞ্জনরত ক্রুদ্ধ মৌমাছিকুলের সহজ শিকারে পরিণত হয়। তারা প্রাণপণে লড়াই করার চেষ্টা করে কিন্তু স্রোতের মতো ধেয়ে আসা মৌমাছিগুলির বিরুদ্ধে তারা কিছুই করতে পারে নি। তারা নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। তাদের মৃত্যুর পরও নিচের আরো কোনো গর্ত থেকে আরো মৌমাছির দল বেরিয়ে এসে তাদেরকে কালো ধুলার স্তূপে মিশিয়ে দেয়। কয়েকটি ঢোল জলে ঝাঁপ দিতে পারে নি, গাছের শাখায় তারা আটকে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মৌমাছির দল ওই ঢোলগুলির দেহের আকৃতি আমূল পাল্টে দেয়। তবে বেশিরভাগ ঢোল মৌমাছিদের হুলের আক্রমণে পাগল হয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল, আর কা'র কাছ থেকে আমরা আগেই শুনেছি যে ওয়েনগুঙ্গা হলো এক বুভুক্ষু নদী।

বালকটি তার দম সম্পূর্ণ ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত কা তাকে নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। এখন সে বলল, আমাদের আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। ক্ষুদে প্রাণীগুলি সত্যিই ক্ষেপে গেছে। এসো!

নিচু হয়ে সাঁতার কেটে, যতক্ষণ সম্ভব ডুব-সাঁতার দিয়ে, ছুরি হাতে মৌগলি নদীর নিচের দিকে এগিয়ে গেল।

কা বলল, ধীরে ধীরে। কেউটে সাপ ছাড়া আর কারো ক্ষেত্রে একটি দাঁত ফোটালেই একশো জন মারা পড়ে না। ক্ষুদে প্রাণীগুলির আক্রমণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ঢোল নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। মৌগলি আবার ডুব দিতে

দিতে বলল, ভালোই তো, আমার ছুরির জন্য আরো কাজের ব্যবস্থা হলো। নদীর জলের উপরে বুনো মৌমাছিগুলি যেন চাদরের মতো বিস্তৃত হয়ে পড়ে ছিল। চারিদিকে শুধু তাদের বিরক্ত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সামনে যা কিছু পাচ্ছে তার গায়েই তারা তাদের হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে।

কোনো হুলই অবশ্য কা-র গায়ের আঁশযুক্ত শক্ত ত্বক ভেদ করতে পারছিল না। কা মৌগলিকে বলল, চুপ করে থাকার ফলে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অস্থির হয়ো না, শিকারের জন্য তোমার সারা রাত পড়ে রয়েছে। এখন ওদের চিৎকার শোনো!

কুকুরদলের অর্ধেকের মতো অংশ তাদের সঙ্গীরা যে একটা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে একপাশে সরে গিয়ে খাড়ি যেখানে কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সেখানে জলের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। গেছো-বানর তাদের যে কোথায় নিয়ে এসেছে সেই লজ্জায়, ক্রোধে, আর ক্ষুদে প্রাণীগুলির আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত তাদের সঙ্গীদের যন্ত্রণাদগ্ধ চিৎকারে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ঢোলই ইতোমধ্যে উপলব্ধি করেছিল যে উপরে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকলে মৃত্যু অবধারিত। তারা তাই জলে ঝাঁপ দেয়, আর স্রোতের টানে ভেসে যেতে থাকে, কিন্তু সেখানেও ক্ষুদে প্রাণীর দল তাদের ধাওয়া করে যায়। মৌগলি কুকুরদলের লাঙুলহীন নেতার গলা শুনতে পেল। সে তার লোকদের হাল ছেড়ে দিতে বারণ করল, সিওনির প্রত্যেকটি নেকড়ে হত্যা করার নির্দেশ দিল। কিন্তু মৌগলি তার কথায় কর্ণপাত করে সময় নষ্ট করল না।

একটা ঢোল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমাদের পেছনে অন্ধকারে একজন হত্যা করে চলেছে। আর এই জল কলুষিত, দুষ্ট।

মৌগলি উদ্বিড়ালের মতো ডুব দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। জলের নিচে একটা লাল কুকুর, মুখ খোলবার আগেই সে তাকে হত্যা করল। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটা কালো বৃত্ত তৈরি করে তার মৃতদেহ ভুশ করে উপরে ভেসে উঠল। লাল কুকুরের দল ঘুরে উল্টো দিকে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু প্রবল স্রোতের জন্য তা সম্ভব হলো না। তার উপর মৌমাছির দল এখনো তাদের পিছু ছাড়ে নি, তাদের মাথায় ও কানে সমানে হুল ফুটিয়ে চলেছে। আর সামনেই তারা শুনতে পাচ্ছে সিওনি নেকড়েদলের যুদ্ধের আহ্বান। ঘনায়মান অন্ধকারে তাদের গর্জন ক্রমে বেড়েই চলল। আবার মৌগলি ডুব দিল, আবার একটা লাল

কুকুর তলিয়ে গেল জলের নিচে, যখন ভেসে উঠল তখন সে মৃত। কুকুরদলের পেছনের দিক থেকে একটা হৈচৈ-এর শব্দ উঠল, কেউ বলছে বর্তমান অবস্থার চাইতে তীরে উঠে পড়াই ভালো, কেউ তাদের নেতাকে তাদের দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলছে। অন্যরা মৌগলিকে বলছে তাদের সামনে আসতে, তার মুখ দেখাতে এবং নিজের মৃত্যু বরণ করতে।

কা বলল, ওরা লড়তে এসেছে দুটো পেট নিয়ে আর অনেকগুলি কণ্ঠস্বর নিয়ে। এবার বাকি যা করণীয় তা ওইখানে অপেক্ষমাণ তোমার ভ্রাতৃবৃন্দ করবে। ক্ষুদে প্রাণীগুলি এখন ফিরে যাবে, আবার তারা ঘুমিয়ে পড়বে। তারা অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের ধাওয়া করেছে। এখন আমিও ফিরে যাব। আমি নেকড়েকুলের কোনো জ্ঞাতিগোষ্ঠী নই। শুভ শিকার, ছোট্ট ভাই, আর মনে রেখো লাল কুকুর নিচের দিকে তাদের কামড় বসায়।

নদীর তীর ধরে একটা নেকড়ে তিন পায়ে লাফাতে লাফাতে ফুটে এলো। সে তার মাথা একপাশে হেলিয়ে মাটির খুব কাছে নামিয়ে রাখল, তার পিঠ বাঁকা করল, তারপর আকাশের দিকে উঁচু এক লাফ দিল, মনে হলো সে তার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে। ওই নেকড়েটি হলো ওনতোল্লা, বহির্বাসী। বহুক্ষণ সে লালকুকুরদের তার ভয়ঙ্কর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করল। তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না। লাল কুকুরগুলি বহুক্ষণ জলে কাটিয়েছে, তারা এখন সাঁতার কাটছে গভীর ক্লান্তির সঙ্গে, তাদের গায়ের ত্বক ভিজে চুপচুপ আর ভারি হয়ে উঠেছে, তাদের ঝাঁকড়া লেজ স্পঞ্জের মতো তাদের পেছনে লেগে আছে। তারা এত ক্লান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না। তারা তাদের সামনে দুটি জলন্ত চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল।

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা কুকুর বলল, এটা কোনো শুভ শিকার নয়।

মৌগলি বলল, শুভ শিকার! শুভ শিকার! সে বিশালদেহ পশুটির সামনে নির্ভয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর তার কাঁধের পেছনে নিজের লম্বা ছুরিটা ঠেলে অনেকখানি সেঁধিয়ে দিল।

নদীর ওপার থেকে ওনতোল্লা প্রশ্ন করল, তুমি কি ওখানে আছো, মানবশিশু ?

মড়াগুলিকে জিজ্ঞাসা করো, বহির্বাসী। এদিকে ভাটির টানে কোনো ঢোল ভেসে আসে নি ? আমি ওই কুকুরগুলির মুখে কাদামাটি ঠুসে দিয়েছি, প্রকাশ্য

দিনের আলোয় আমি ওদের ফাঁদে ফেলেছি। তাদের দলপতি এখন লাঙুলবিহীন। কিন্তু এখনো ওদের কয়েকজনকে এখানে দেখা যাচ্ছে। আমি এখন ওদের কোন দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব ?

ওনতোল্লা বলল, আমি অপেক্ষা করব। সামনে সারা রাত পড়ে আছে।

সিওনি নেকড়েদের চিৎকার ক্রমেই নিকটবর্তী হলো। তারা চিৎকার করে বলল, দলের জন্য গোটা দলের জন্য, এই শিকার! নদীর একটা বাঁক ঢোলগুলিকে নেকড়ে-গুহাগুলির উল্টোদিকের বেলাভূমি আর অগভীর জলকাদার দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

তখনই ওরা ওদের ভুল বুঝতে পারল। ওদের উচিত ছিল আরো আধ মাইল উজানে থাকতেই তীরে উঠে সামনে ছুটে গিয়ে শুকনো মাটিতে নেকড়েদলের মোকাবিলা করা। এখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত নদীতীর জুড়ে দেখা যাচ্ছে শুধু আগুনের মতো জ্বলজ্বলে চোখের সারি। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হওয়া ফিয়ালের ভয়ঙ্কর ধ্বনি ছাড়া গোটা অরণ্যের আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মনে হচ্ছিল ওনতোল্লা যেন লাল কুকুরগুলিকে মধুর ভঙ্গিতে তীরে উঠে আসার আহ্বান জানাচ্ছে।

ঢোলদের দলপতি নির্দেশ দিল, ঘুরে দাঁড়াও, আক্রমণ করো! তারপরই গোটা দল তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অগভীর জলকাদার মধ্যদিয়ে যাবার সময় তারা চারিদিকে জলের ধারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। সমস্ত ওয়েনগুঙ্গা সাদা ফেনায় ভরে গেল, ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল, আর বড় বড় ঢেউ গড়িয়ে গেল একপাশ থেকে অন্য পাশে ,একটা জাহাজ চলে যাবার সময় তার পেছনে যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয় অনেকটা সেই রকম দেখাল। লালকুকুরের দল জোট বেঁধে একসাথে বেলাভূমির উপর ছুটে এলো, আর তাদের পেছন পেছন এলো মৌগলি তার ছুরি চালাতে চালাতে, তাদের শরীর চিরে দিতে দিতে।

তারপর শুরু হলো কঠিন সুদীর্ঘ লড়াই। সরু হয়ে আসা আর চওড়া হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত সিক্ত বেলাভূমিতে, জটপাকানো গাছের শিকড়ের উপরে আর ভেতরে, ঝোপঝাড়ে আর ঘাসের স্তূপে, সর্বত্র চলল কামড়াকামড়ি, জাপ্টাজাপ্টি, হানাহানি। সংখ্যায় লাল কুকুরের দল তখনো নেকড়েদের দ্বিগুণ। কিন্তু তাদের মুখোমুখি হতে হলো সেই নেকড়েদের যারা লড়ছিল যা কিছু তাদের দলকে গড়ে তুলেছে সেটা রক্ষা করার জন্য, আর দলের শুধু বড় প্রশস্তবক্ষ সাদা দাঁতের নেকড়েরাই লড়াই-এ নামল না, দুশ্চিন্তাভরা চোখের

মেয়ে নেকড়েরাও এগিয়ে এলো, তারা লড়ল তাদের বাচ্চাদের জন্য। মাঝে মাঝে দেখা গেল এক-দেড় বছরের নেকড়েশিশুদের, তাদের গায়ের চামড়া তখনো পশমের মতো, তারা মায়েদের সাথে চলেছে হুটোপুটি করতে করতে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো নেকড়েরা শত্রুর টুঁটি কামড়ে ধরতে কিংবা তার পার্শ্বদেশে আঘাত হানতে চায়, কিন্তু কুকুররা চায় শত্রুর পেটে দাঁত বসাতে। তাই লাল কুকুরগুলি যখন জল থেকে হুড়মুড় করে উঠে আসার জন্য তাদের মাথা উঁচু করছিল তখন বেশি সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল নেকড়েদেরই স্বপক্ষে। কিন্তু শুকনো মাটির উপর নেকড়েদল সুবিধা করতে পারছিল না। তবে কী জলে কী ডাঙায় মৌগলির ছুরি ছিল সমান সক্রিয়। মৌগলি বিরামহীনভাবে তার ছুরির সাহায্যে একটির পর একটি লাল কুকুর হত্যা করে চলেছিল। তার চার ভাই ধাক্কাধাক্কি করে তার পাশে চলে এসেছিল! ধূসরভাই নিচু হয়ে তার দু'হাঁটুর নিচে অবস্থান নিল, মৌগলির পেট সে রক্ষা করল, আর অন্যরা পাহারা দিল তার পিঠ ও পার্শ্বদেশ। একবার একটা ঢোল চিৎকার করে তার উপর লাফিয়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মৌগলির স্থির অব্যর্থ ফলা তাকে চিরে ফেলে দিল। সব কিছু তখন একটা জটপাকানো বিশৃঙ্খলা। যুদ্ধরত দল দুটি একবার ডান পাশে চলে যাচ্ছে, আরেকবার বাঁ পাশে। নদীর তীর ঘেঁসে চলছে এই লড়াই। তাছাড়া যার যার কেন্দ্র ঠিক করে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরেও ওরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও দেখা গেল একটা কম্পমান ঢিবি, ঘূর্ণিজলের মধ্যে একটা ফোস্কার মতো, যে ফোস্কা হঠাৎ ফেটে যায়। সেইভাবে ওই ঢিবি থেকে হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত চার পাঁচটা লাল কুকুর, ক্ষতবিক্ষত, প্রত্যেকেই আবার কেন্দ্রে ঢুকে পড়তে চেষ্টা করছে। কোথাও দেখা গেল একা একটা নেকড়ে প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় করে দু-তিনটা লাল কুকুরকে সামনে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কোথাও দেখা গেল বছর দেড়েকের একটা নেকড়ে শাবককে, চারপারশের ভিড়ের চাপে সে আটকে পড়েছে, যদিও অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়। তার মা বোবা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে আবার ছুটে চলেছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কোথাও হয়তো চারপাশের সব কিছু ভুলে গিয়ে একটা নেকড়ে এবং একটা কুকুর একে অন্যকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে, কখন কীভাবে একজন অন্যজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কৌশল নির্ধারণ করছে, তারপর ক্রোধোন্মত্ত যোদ্ধাদের প্রবল ধাক্কায় একসময় দুদিকে ছিটকে পড়ছে। একবার মৌগলি আকেলাকে দেখতে পেল। তার দুই পার্শ্বদেশে দুটি ঢোল, তার প্রায় দন্তহীন চোয়াল কঠিনভাবে চেপে

বসেছে তৃতীয় একটি ঢোলের কোমরের পশ্চাদ্ভাগে। একবার ফাওকে দেখতে পেল মৌগলি। একটা ঢোলের গলায় তার দাঁত বসিয়ে সে তাকে সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে দেড়-দুবছরের বাচ্চা নেকড়েরা তাকে খতম করবে। কিন্তু বেশিরভাগ লড়াই-ই একটা আকস্মিক অস্থির দ্বন্দ্ব, অন্ধকারে টুঁটি চেপে ধরা, আঘাত হানা, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া, হিংস্র চিৎকার ও আর্তনাদ, মৌগলির চারপাশে, তার পেছনে, তার উপরে, সর্বত্র মারামারি মারামারি মারামারি। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের হট্টগোল, চক্রাকারে ঘোরা, অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেল। লালকুকুররা এখন ভীত, আতঙ্কিত। অধিকতর শক্তিশালী নেকড়েদের তারা আক্রমণ করতে ভয় পাচ্ছে, অথচ পালিয়ে যাবার সাহসও সঞ্চয় করতে পারছে না। মৌগলি বুঝল যে শেষের আর দেরি নেই। এখন সে শুধু পঙ্গু করার জন্য আঘাত হেনেই তৃপ্ত থাকল। দেড়-দু'বছরের নেকড়েগুলির সাহস ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল। এখন মৌগলি নিঃশ্বাস ফেলবার কিছু সময় পেল, কোনো বন্ধুকে কোনো খবর দিতে পারল। তার ছুরির একটা ঝলকই লাল কুকুরকে ছুটে অন্য দিকে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ধূসর ভাই চিৎকার করে বলল, হাড়ের খুব কাছে মাংস। তার দেহের পনেরো-বিশ জায়গায় সদ্য পাওয়া আঘাতের চিহ্ন, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

মৌগলি ধূসর ভাই-এর চিৎকারের জবাবে বলল, কিন্তু হাড় এখনো মটকে ভেঙে দেয়া হয় নি।

ইয়োওয়াওয়া! অরণ্যে আমরা এভাবেই আমাদের কাজ করি! তার ছুরির ফলা একটা অগ্নিশিখার মতো লাফিয়ে উঠে একটা ঢোলের পার্শ্বদেশে আঘাত হানল, তার পশ্চাদ্দেশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এক নেকড়ের ভারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

নেকড়েটি কুঞ্চিত নাসিকার মধ্য দিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, আমার শিকার এটা! আমার হাতে ছেড়ে দাও ওকে।

মৌগলি বলল, তোমার পেট কি এখনো শূন্য, বহির্বাসী ? ওনতোল্লা ভীষণভাবে আহত হয়েছে কিন্তু তার বজ্রআঁটুনিতে লাল কুকুরটির আর নড়াচড়া করার সাধ্য ছিল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওনতোল্লাকে আক্রমণ করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না।

মৌগলি তিক্ত হাসি হেসে বলল, আমাকে কিনে নেওয়া ষাঁড়ের নামে শপথ করে বলছি, এটা যে লাঙুলবিহীনটা! সত্যিই ওটা ছিল বড় আকারের পিঙ্গলবর্ণ লাল কুকুর দলপতি।

মৌগলি তার চোখের উপর থেকে রক্তধারা মুছে দার্শনিকের মতো বলল, শিশুর আর মেয়েদের হত্যা করা ভালো কাজ নয়। আমার মনে হচ্ছে এবার ওনতোল্লার হাতে তোমার মৃত্যু হবে।

একটা ঢোল তাদের নেতার সাহায্যে আসার জন্য লাফ দিয়েছিল, কিন্তু ওনতোল্লার পাছায় দাঁত বসাবার আগেই মৌগলির ছুরি তার গলায় বিদ্ধ হয়। বাকি কাজটুকু শেষ করে ধূসর ভাই।

মৌগলি আবার বলল, অরণ্যে আমরা এভাবেই আমাদের কাজ করি।

ওনতোল্লা একটি কথাও বলল না। তার চোয়াল লাল কুকুরদলের নেতার মেরুদণ্ডের হাড়ের উপর কঠিনভাবে চেপে বসছিল, তার নিজের আয়ুও একই সঙ্গে ফুরিয়ে আসছিল। লাল কুকুরের শরীর একবার থরথর করে কেঁপে উঠল, তার মাথা ঝুলে পড়ল, সে নিশ্চল হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর তার মৃতদেহের উপরে পড়ল ওনতোল্লা।

হা! রক্তঋণ শোধ হলো, মৌগলি বলল। এবার গানটা করো, ওনতোল্লা।

ধূসর ভাই বলল, ও আর শিকার করবে না। আকেলাও অনেকক্ষণ হলো নিশ্চুপ হয়ে গেছে। ফাওনার পুত্র ফাও বজ্রগর্জনে বলে উঠল, হাড় মটকে ভেঙে দেয়া হয়েছে। যাও, হত্যা করো, হত্যা করো, ও অরণ্যের মুক্ত প্রাণীকুলের শিকারিদল।

একের পর এক লাল কুকুর কালো রক্তরঞ্জিত বালুর উপর দিয়ে হয় নদীর দিকে নয়তো ঘন জঙ্গলের দিকে চুপিসারে সটকে পড়ার চেষ্টা করছিল। ভাটির দিকে কিংবা উজানে যেপথ খোলা পেল সে পথেই তারা ছুটল।

মৌগলি চিৎকার করে উঠল, ঋণ! ঋণ! ঋণ পরিশোধ করো। ওরা নিঃসঙ্গ নেকড়েকে হত্যা করেছে। দেখো, একটি কুকুরও যেন প্রাণ নিয়ে ফিরে না যেতে পারে।

মৌগলি ছুরি হাতে নদীর দিকে যেন উড়ে গেল। কোনো কুকুর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে সে বাধা দেবে তাকে। এমন সময় সে নয়টি মৃত লাল কুকুরের স্তূপের নিচ থেকে আকেলার মাথা ও শরীরের ঊর্ধ্বাংশকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে দেখল। মৌগলি তৎক্ষণাৎ হাঁটু মুড়ে নিঃসঙ্গ নেকড়ের পাশে বসে পড়ল।

আকেলা অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, আমি বলি নি যে এটাই হবে আমার শেষ লড়াই ? খুব ভালো শিকার হয়েছে, ছোটভাই! তোমার কী খবর ?

আমি বেঁচে আছি। অনেক শত্রু বধ করেছি।

তাই। আমি মারা যাচ্ছি, ছোট ভাইটি। আমি— আমি তোমার পাশে শুয়ে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই, ছোট ভাই।

মৌগলি তার ভয়ঙ্কর ক্ষতবিক্ষত মাথা নিজের হাঁটুর উপর টেনে নিয়ে তার দু'হাত দিয়ে আকেলার ক্ষতবিক্ষত গলা জড়িয়ে ধরল।

কতদিন আগের শের খানের সময়ের কথা। একটা ন্যাংটা মানবশিশু ধুলোর বুকে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

না, না, আমি নেকড়ে। আমি মুক্ত প্রাণীকুলের স্বজাতি, মৌগলি উচ্চকণ্ঠে জানাল, আমি যে মানুষ তা আমার নিজের ইচ্ছায় নয়।

শোনো, ছোট ভাই, তুমি মানুষ। আমি তোমাকে বেড়ে উঠতে দেখেছি নেকড়েশাবক রূপে। তুমি মানুষ, তোমার জন্য না হলে আজ নেকড়েদল লাল কুকুরদের সামনে থেকে পালিয়ে যেত। একদিন আমি যেমন তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম সেইভাবে তুমি আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, সমস্ত দলকে তুমি বাঁচিয়ে দিয়েছ। তুমি কি সব ভুলে গেছো ? এখন সব ঋণ শোধ হয়েছে। তোমার নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাও, ছোট ভাই। আমি আবার বলছি, যাদু আমার, এই শিকার শেষ হয়েছে। তুমি এখন তোমার নিজের লোকজনের কাছে চলে যাও।

আমি কোনোদিন সেখানে যাব না। আমি একা অরণ্যে শিকার করব। এই আমি বলে দিলাম।

গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, আর বর্ষার পর আসে বসন্ত। তাড়িয়ে দেবার আগে তুমি ফিরে যাও।

কে আমাকে তাড়াবে ?

মৌগলি মৌগলিকে তাড়াবে। তোমার লোকজনদের কাছে ফিরে যাও। মানুষের কাছে যাও।

মৌগলি যখন মৌগলিকে তাড়াবে তখন যাব, জবাব দিল মৌগলি।

আর কিছু বলবার নেই, আকেলা বলল। ছোট ভাই, তুমি কি আমাকে একটু দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে ? আমিও এক সময় মুক্তস্বাধীন প্রাণীকুলের একজন নেতা ছিলাম।

খুব সতর্কতার সঙ্গে, সযত্নে, মৌগলি মৃতদেহগুলি একপাশে সরিয়ে দিল, তারপর নিজের দু'বাহু দিয়ে আকেলাকে জড়িয়ে ধরে তাকে তার পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিল, আর নিঃসঙ্গ নেকড়ে তখন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকে টেনে মৃত্যুকালে একজন দলপতির যেভাবে গান গাওয়া উচিত সেইভাবে মৃত্যুগীত গাইতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে তা উচ্চ পর্দায় উঠল, নদীর ওপারে বহু দূর পর্যন্ত তার রেশ ছড়িয়ে গেল, তারপর সব শেষে শুভ শিকার! -এ এসে তা থামল। আকেলা তখন এক মুহূর্তের জন্য মৌগলির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উপর দিকে একটা লাফ দিল, তারপর তার সর্বশেষ এবং সব চাইতে ভয়ঙ্কর শিকারটার উপর পিঠ দিয়ে পড়ে গেল।

মৌগলি তার মাথা নিজের হাঁটুর উপর টেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকল। চারপাশের কোনো কিছুর দিকে তার আর খেয়াল নেই। পলায়নরত অবশিষ্ট লাল কুকুরগুলির পেছনে তখন ছুটে যাচ্ছিল নির্মম মেয়েনেকড়েরা। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে সব চিৎকার থেমে গেল, নেকড়েরা ফিরে এলো খোঁড়াতে খোঁড়াতে, তাদের ক্ষতস্থানগুলি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে, আর ফিরে এসে তারা নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করল। দলের পনেরোটি নেকড়ে মারা গেছে, ছয়টি মৃত মেয়েনেকড়ে পড়ে আছে নদীতীরে, বাকি যারা তাদের মধ্যে একজনও নেই যে কিছু না কিছু আহত হয় নি। মৌগলি সকাল না হওয়া পর্যন্ত এক জায়গায় ঠায় বসে রইল। যখন ফাওর ভেজা লাল মুখ তার হাতের উপর নেমে এল তখন সে সরে গিয়ে আকেলার কঠিন কৃশ দেহটা তাকে দেখাল।

ফাও বলল, শুভ শিকার! যেন আকেলা তখনো বেঁচে আছে। তারপর সে তার কামড়-খাওয়া পিঠের উপর দিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল, আর্তনাদ করো, কুকুরের দল। আজ রাতে একটা নেকড়ের মতো নেকড়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

কিন্তু যে দু'শো সংগ্রামী ঢোলের দল গর্বভরে বলেছিল যে সব অরণ্যই তাদের অরণ্য, কোনো জীবিত প্রাণীই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না, তাদের মধ্যে ডেক্কানে ফিরে গিয়ে ফাও-র বাণী সেখানে পৌঁছে দেবার মতো একজনও বেঁচে ছিল না।

বসন্তের দৌড়

লাল কুকুরদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও আকেলার মৃত্যুর পর এখন দ্বিতীয় বৎসর চলছে। মৌগলি সতেরো বছরের নবযুবক, যদিও

কঠোর পরিশ্রম ও উত্তম খাওয়া দাওয়ার জন্য তাকে তার বয়সের চাইতে বড় দেখায়। সামান্য একটু গরম লাগলেই কিংবা শরীরকে ধূলিধূসরিত মনে হলেই সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করত। সব কিছু মিলে সে তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বড় ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। একটা গাছের উঁচু শাখা এক হাতে ধরে সে পাক্কা আধঘণ্টা এক নাগাড়ে ঝুলে থাকতে পারত। গেছো-পথে কোনো কিছুর উপর নজর রাখার দরকার হলে তাকে এরকম করতে হতো। একটা তরুণ হরিণকে লাফ দেওয়ার মাঝপথে সে ধাক্কা দিয়ে একপাশে ফেলে দিতে পারত। এমনকি উত্তরের জলাভূমিতে যেসব বৃহদাকার নীল বুনো শুয়োর বাস করত তাদেরও সে উল্টে ফেলে দিতে পারত। অরণ্যের প্রাণীকুল তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তাকে ভয় করত, এখন তার শক্তিমত্তার জন্যও তারা তাকে ভয় করে। সে যখন তার নিজের কোনো কাজে চলাফেরা করত তখন তার আগমনের সামান্যতম খবর পেলেই তারা অরণ্যের সব পথ তার জন্য খোলা রাখত। যদিও তার চোখের দৃষ্টি সর্বদা ছিল শান্ত ও কোমল। লড়াই করার সময়ও তার চোখ বাঘিরার চোখের মতো জ্বলে উঠত না। তার চোখ দুটি তখন শুধু আরো কৌতূহলী, আরো উত্তেজিত হয়ে উঠত। বাঘিরা তার ব্যাপারে যেসব জিনিস বুঝতে পারত না তার মধ্যে এটা ছিল একটা।

সে একদিন মৌগলিকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। মৌগলি সহাস্যে জানিয়েছিল, শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে আমি রেগে উঠি। দুদিন উপোস দিতে হলে আমি ক্রুদ্ধ হই। তখনো কি আমার চোখ কথা বলে না?

বাঘিরা বলেছিল, তোমার মুখ ক্ষুধার্ত দেখায় কিন্তু তোমার চোখ কিছু বলে না। শিকার করার সময় কিংবা খাবার সময় কিংবা সাঁতার কাটার সময় সর্বদাই তা এক রকম থাকে, বর্ষা অথবা গ্রীষ্মে, পাথরের মতো। মৌগলি তার দীর্ঘ আঁখি পল্লবের নিচ দিয়ে অলসভাবে বাঘিরার দিকে তাকিয়ে থাকল, আর নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে চিতার মাথা নামিত হলো। বাঘিরা তার প্রভুকে চিনত।

একটা পাহাড়ের উপর বেশ উঁচুতে তারা দুজন শুয়ে ছিল। সেখান থেকে অনেক নিচুতে ওয়েনগুঙ্গাকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। তাদের নিচের দিকে সকালের কুয়াশা সাদা-সবুজ স্তরের মতো ঝুলে আছে। সূর্য উঠতেই তার রং বদলে গিয়ে লাল-সোনালি হলো, আর সমুদ্রের তরঙ্গের মতো তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে শুকনো ঘাসের উপর মৌগলি ও বাঘিরা শুয়েছিল সূর্যের আলো তার উপর পড়ে স্থানটিকে রেখাঙ্কিত করে দিল।

শীতের মৌসুম প্রায় শেষ এখন, গাছ-গাছালি ও লতাপাতার চেহারা মলিন ও বিবর্ণ, একটু বাতাস উঠলেই সব জায়গা থেকে উত্থিত হচ্ছিল শুষ্ক সরসর শব্দ। একটা ছোট্ট গাছের পাতা কোনো শুকনা ডালে লেগে অনবরত শব্দ করে যাচ্ছিল। সে শব্দে বাঘিরার তন্দ্রা ঘুচে গেল। সকালের বাতাস নাক দিয়ে বুক ভরে টেনে নিল সে। একটা শুকনো কাশি দিল। চিৎ হয়ে শুয়ে সে তার সামনের দু'পা দিয়ে দোদুল্যমান পাতাটিকে আঘাত করল।

বাঘিরা বলল, বছর ঘুরছে। অরণ্য সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন সংলাপের সময় আসন্ন। ওই পাতাটা জানে সেকথা। খুব ভালো।

মৌগলি একগুচ্ছ ঘাস টেনে তুলতে তুলতে বলল, ঘাস শুকনো। এমনকি বসন্তের আঁখি, লাল ঘাসফুলগুলি, সেগুলির মুখও বন্ধ। বাঘিরার পক্ষে কি এই সময়ে চিৎ হয়ে শুয়ে গেছো বিড়ালের মতো হাওয়ায় পা ছোঁড়া খুব একটা ভালো কাজ হচ্ছে ?

অ্যাও ? বাঘিরা বলল। মনে হলো সে অন্য কিছু চিন্তা করছিল।

আমি বলছি, কালো চিতার পক্ষে কি এই রকম শব্দ করা, কাশি দেওয়া, মাটিতে গড়ানো খুব একটা ভালো কাজ হচ্ছে, মৌগলি বলল। মনে রেখো, আমরা হলাম অরণ্যের প্রভু। তুমি আর আমি।

বাঘিরা তাড়াতাড়ি একবার গড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল। তার কালো পার্শ্বদেশে ধুলো লেগে রয়েছে। সে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তোমার কথা শুনেছি, মানুষ-শিশু। অবশ্যই আমরা অরণ্যের প্রভু। মৌগলির মতো এত শক্তিমান আর কে আছে ? আর কে আছে তার মতো বিজ্ঞ ? মনে হলো বাঘিরার গলায় যেন একটা দীর্ঘায়িত টানা টানা সুর লেগেছে। মৌগলি দ্রুত ঘুরে তার দিকে তাকাল। ও কি ঠাট্টা করছে ? অরণ্য সব সময়ই ওই রকম কথাবার্তায় পূর্ণ থাকে। শব্দ হয় এক রকম, আসল মানে হয় ভিন্ন রকম। বাঘিরা আবার বলল, আমি বলেছি আমরা সন্দেহাতীতভাবে অরণ্যের প্রভু। আমি কি কোনো অন্যায় করেছি ? আমি জানতাম না মানবসন্তান আর মাটিতে শোয় না। সে কি তবে আকাশে ওড়ে ?

মৌগলি তার হাঁটুতে কনুই রেখে উপত্যকার ওপারে সূর্যালোকের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিচের বনানীতে একটা পাখি তার বসন্তের গান গাইবার জন্য তৈরি হচ্ছে। গানের প্রথম কলিগুলির সুর বারবার বারবার অনুশীলন করছে সে। পরে সে যে-সুর ও তানের ঝড় তুলবে তার তুলনায় তার এখনকার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ অতিশয় দুর্বল। কিন্তু বাঘিরা তা ঠিকই শুনতে পেল।

কালো চিতা মাটিতে তার লেজ আছড়াতে আছড়াতে বলল, আমি বলেছি যে নতুন সংলাপের সময় আসন্ন।

মৌগলি জবাব দিল, আমি শুনেছি। কিন্তু, বাঘিরা, তোমার সারা শরীর অমন কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন? সূর্য তো বেশ তাপ ছড়াচ্ছে।

বাঘিরা বলল, ওটা হলো ফেরাও, রক্তলাল কাঠ-ঠোকরা। ও ভোলে নি। এখন আমার গানের কথা মনে করতে হবে। সে উৎফুল্ল চিত্তে আপন মনে গান গাইতে শুরু করল, কিন্তু গলায় ঠিক সুর না লাগায় সে বারবার চেষ্টা করতে থাকল।

মৌগলি বলল, কাছে পিঠে তো কোনো শিকার নেই, বাঘিরা।

শোনো, ছোট্ট ভাইটি। তুমি কি তোমার দুটো কানই বন্ধ করে রেখেছ? ওটা তো শিকারের ডাক নয়। আমার এই গান প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজেকে তৈরি রাখার গান। আমি ভুলে গিয়েছিলাম নতুন সংলাপের সময় এলে আমি তা বুঝতে পারি, কারণ তখন তোমরা সবাই আমাকে একা ফেলে চলে যাও, কর্কশ কণ্ঠে বলল মৌগলি।

বাঘিরা বলতে শুরু করল, কিন্তু, ছোট্ট ভাই, আমরা তো সব সময়—

মৌগলি ক্রুদ্ধভাবে তার তর্জনী উঁচু করে বলল, আমি বলছি তোমরা তাই কর। তোমরা পালিয়ে যাও, আর আমাকে, অরণ্যের প্রভুকে, তখন একা একা হাঁটতে হয়। গত মৌসুমে কী হয়েছিল? একটা মানুষ দলের জন্য আমি ক্ষেত থেকে কিছু আখ তুলতে চেয়েছিলাম। আমি হাতিকে খবর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, তোমার মাধ্যমে, সে যেন নির্দিষ্ট রাতে এসে তার শুঁড় দিয়ে মিষ্টি ঘাসের দণ্ডগুলি উপড়ে এনে আমার হাতে দেয়।

বাঘিরা একটু ভয় পেল। সে বলল, ও আসতে মাত্র দুটো রাত দেরি করেছিল, কিন্তু তারপর তোমার প্রিয় মিষ্টি ঘাস এত বেশি পরিমাণে তোমার জন্য সংগ্রহ করেছিল যে একটা মানবসন্তান সারা বর্ষাকাল ধরে খেয়েও তা শেষ করতে পারত না। ওই ব্যাপারটায় আমার কোনো দোষ ছিল না।

আমি তাকে যখন আসতে বলেছিলাম তখন সে আসে নি। না, সে তখন চাঁদের আলোয় সারা উপত্যকা চষে বেড়াচ্ছিল, উচ্চ নিনাদ করছিল, ছোটাছুটি করছিল এদিকে ওদিকে। তার পদচিহ্নরেখা দেখে মনে হচ্ছিল একটা নয়, তিনটা হাতি ওখান দিয়ে গেছে। সে বৃক্ষরাশির আড়ালে নিজেকে লুকায় নি। মানুষদলের বাড়ির সামনে সে চাঁদের আলোয় নৃত্য করেছে। আমি নিজে দেখেছি, তবু সে আমার কাছে আসে নি। আর আমি হলাম অরণ্যের প্রভু!

চিতা, সর্বদা বিনীত, বলল, সেটা ছিল নতুন সংলাপের সময়। সম্ভবত ছোট্ট ভাই, তুমি প্রধান বাণী উচ্চারণ করে তাকে ডাকো নি। এখন ফেরাও-র গান শোনো, প্রফুল্ল হও!

মৌগলির বদমেজাজ যেন আপনা থেকেই দূর হলো। সে মাথার নিচে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল। ঘুম জড়ানো গলায় সে বলল, আমি জানি না, জানতে চাইও না। এস, বাঘিরা, আমরা ঘুমাই। আমার মন খুব ভার। আমার মাথার জন্য একটু বিশ্রামের জায়গা করে দাও।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চিতা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এখনো সে ফেরাওকে তার বসন্তকালীন নতুন সংলাপের গান অনুশীলন করতে শুনতে পেল।

ভারতের অরণ্যে একটা ঋতু অন্যটার সঙ্গে আলগোছে মিশে যায়, প্রায় কোনো বিভাজন ছাড়াই। সেখানে মনে হয় যেন মাত্র দুটি ঋতু আছে, বর্ষা ও গ্রীষ্ম। কিন্তু বর্ষার জলধারা ও কালো মেঘমালার নিচে ভালো করে তাকালে তুমি লক্ষ করবে যে সেখানে চারটি ঋতুই নিয়মিতভাবে আসা-যাওয়া করছে। সব চাইতে অপরূপ হচ্ছে বসন্ত। বিরাণ প্রান্তরকে নতুন পাতা ও ফুলে ঢেকে দেওয়া তার কাজ নয়, তার কাজ শুধু হাওয়ার ঝাপ্টায় যে আধা সবুজ পত্রপল্লব ও লতাগুল্মকে শীত সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে নি তাকে তাড়িয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর জীর্ণ মৃত্তিকা যেন নিজেকে আবার নতুন ও তরুণ বলে অনুভব করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আর এ কাজটা সে এত ভালো করতে পারে যে অরণ্যের বসন্তের মতো এত সুন্দর বসন্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

একটা দিন আছে যখন সব জিনিসকে মনে হয় ক্লান্ত, ভারি বাতাসে সব গন্ধকে মনে হয় বাসি ও ব্যবহৃত। এর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। দৃশ্যত কিছুই বদলায় নি, কিন্তু তারপর এক সময়ে নাকে পাওয়া যায় নতুন এবং খুশিতে মন ভরানো গন্ধ। অরণ্যের প্রাণীকুলের গোঁফের গোড়া অবধি থরথর করে কেঁপে ওঠে। তারপর, হয়তো, সামান্য একটু বৃষ্টি হলো, আর সমস্ত বৃক্ষরাজি, ঝোপঝাড়, বাঁশ, শ্যাওলা, তরুলতা, চারাগাছ সব এমন সশব্দে জেগে ওঠে যেন তুমি তোমার কান দিয়ে সেই শব্দ শুনতে পাও, আর সেই শব্দের তলা দিয়ে, দিনরাত অবিশ্রাম একটা গুঞ্জন প্রবাহিত হতে থাকে। এই কম্পমান ধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি নয়, জলধারা নিচে ঝরঝর করে পড়ার শব্দ নয়, বাতাস গাছের উপরের দিকের শাখায় যে মর্মরধ্বনি তোলে তাও নয়, এ হলো একটা উষ্ণ সুখী পৃথিবীর আনন্দের অনুচ্চ স্নিগ্ধ ধ্বনি।

বর্তমান বছরের আগ পর্যন্ত মৌগলি ঋতু পরিবর্তনের ঘটনাটা আনন্দে উপভোগ করে আসছিল। সাধারণত বসন্তের আঁখি নামে পরিচিত ফুল ঘন ঘাসের মধ্যে তার চোখেই প্রথম ধরা দিত, বসন্তের প্রথম মেঘতরঙ্গ, অরণ্যে যার তুলনায় আর কিছুই নেই, সেই সকলের আগে দেখতে পেত। সর্বত্র, তারাভরা আকাশের নিচে, প্রস্ফুটিত ফুলরাশির মধ্যে, সবরকম সিক্ত জায়গায় মৌগলির গলা শোনা যেত, ব্যাঙের কোরাস সঙ্গীতে সে গলা মেলাচ্ছে, তাদের উৎসাহিত করছে, কিংবা শুভ্র নিশীথে ঝুলে থাকা পেঁচার ডাককে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অনুকরণ করছে। অরণ্যে তার সব আপনজনের মতো সেও এই ঋতুকেই বেছে নিয়েছিল উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটির জন্য। সে উষ্ণ হাওয়ার মধ্য দিয়ে, নিছক আনন্দ উল্লাসে, গোধূলি লগ্ন থেকে প্রভাত-তারা ওঠা পর্যন্ত ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ মাইল দূর অবধি ছুটে যেত, তারপর ফিরে আসত হাঁপাতে হাঁপাতে, মাথায় বিচিত্র ফুলের মালা জড়িয়ে। অরণ্যে এই সব উদ্দেশ্যহীন ছোটাছুটির সময় মৌগলির চার সঙ্গী তার সঙ্গে থাকত না। তারা অন্য নেকড়েদের সঙ্গে তাদের গান গাইতে চলে যেত। বসন্তে অরণ্যের প্রাণীকুলের ব্যস্ততার শেষ ছিল না। মৌগলি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের তাদের স্বভাব অনুযায়ী নানারকম শব্দ করতে শুনত, কেউ মৃদু চিৎকার করছে, কেউ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, কেউ শিস দিয়ে উঠছে। বছরের অন্য সময়ের চাইতে এই সময়ে তাদের কণ্ঠস্বর ভিন্ন রকম হয়ে যেত। অরণ্যের বসন্তকে নতুন সংলাপের সময় বলে অভিহিত করার এটাও ছিল একটা কারণ।

কিন্তু এই বসন্তে, মৌগলি বাঘিরাকে বলেছে, তার পেট খুব ভার হয়ে আছে, তার মন খুব ভারি। বাঁশপাতার কিশলয়ের রং বাদামি হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মৌগলি সেই সকালের জন্য অপেক্ষা করেছিল যখন সব কিছুর মধ্যে নতুন গন্ধ জেগে উঠবে। মোর নামের ময়ূরটি তার তাম্রবর্ণ আর নীল আর লাল বর্ণের উজ্জ্বল পুচ্ছ ছড়িয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন বনানীর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠেছে।

মৌগলিও তার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নিজের মুখ খুলল, কিন্তু তার গলায় কথা আটকে গেল, আর একটা অচেনা অনুভূতি তার পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, একটা অবিমিশ্র অতৃপ্তি ও বেদনার অনুভূতি। সে তার সমস্ত শরীর খুঁটিয়ে দেখল, কোনো বিষাক্ত কাঁটার ওপরে যে পা দেয় নি সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইল। ময়ূরটি নতুন ঘ্রাণের খবর জানিয়ে দিল সবাইকে, অন্য পাখিরা তাদের কণ্ঠে ওই বার্তা তুলে নিল, আর ওয়েনগুঙ্গার পাশের টিলাগুলি থেকে বাঘিরার গলার ভাঙা চিৎকার ভেসে এল, ঈগলের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির মাঝামাঝি একটা শব্দ।

উপরে সদ্যগজানো গাছের শাখায় বান্দরলোক চেঁচামেচি করছে, আর নিচে ওইখানে মৌগলি দাঁড়িয়ে আছে, ময়ূরের ডাকের উত্তরে গান গাওয়ার জন্য তার বুক ফুলে উঠেছে কিন্তু তার ভেতরের অ-সুখ তার নিশ্বাসকে যেন গলা টিপে মেরে ফেলছে। সে শুধু হাঁফাতে থাকল, তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

সে তার চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল কিন্তু বৃক্ষশাখায় লাফালাফি করা, বিদ্রূপ করা, বানরের দল আর নিচে বর্ণাঢ্য পুচ্ছ মেলে নৃত্যরত ময়ূর ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

ময়ূর চিৎকার করে বলল, সব গল্প বদলে গেছে। শুভ শিকার, ছোট্ট ভাই! তোমার উত্তর কোথায়, ছোট্ট ভাই ?

চিল আর তার সঙ্গিনী শিস দিয়ে বলল, ছোট্ট ভাই, শুভ শিকার! তারপর তারা দুজন একসঙ্গে ছোঁ মেরে নিচের দিকে তার এত কাছে নেমে এলো যে মৌগলির মনে হলো সে বুঝি তার নাকের উপর ওদের কোমল ডানার পরশ পেল।

সামান্য এক ঝলক বসন্তের বৃষ্টি হলো— ওরা এর নাম দিয়েছে হাতিবৃষ্টি— অরণ্যের প্রায় আধ মাইল জুড়ে। বৃষ্টির শেষে নতুন পাতাগুলি দেখা গেল ভেজা, একটু একটু নড়ছে, আর দেখা গেল একটা যুগল রামধনু আর শোনা গেল একটা হাল্কা বজ্রগর্জন। এই সময় এক মিনিটের জন্য আবার জেগে উঠল বসন্তের গুঞ্জন, তারপরই নীরব হয়ে গেল। কিন্তু অরণ্যের সব প্রাণী যেন তখন একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। সবাই, কেবল মৌগলি ছাড়া।

মৌগলি আপন মনে বলল, আমি ভালো খাবার খেয়েছি। আমি ভালো জল পান করেছি। উ, কচ্ছপের কথা শুনে আমি একবার নীল দাগকাটা গাছের শিকড় খাবার পর আমার গলা খুব জ্বালা করেছিল, প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল, এখন তেমন কিছু হচ্ছে না। কিন্তু আমার মন খুব ভারাক্রান্ত। বাঘিরার সঙ্গে, অন্যদের সঙ্গে, অরণ্যের আমার সব নিজের লোকদের সঙ্গে আমি খুব খারাপ কথাবার্তা বলেছি। এখন, এক মুহূর্তে আমার গরম লাগছে, পরের মুহূর্তে শীত করছে, তারপর গরমও লাগছে না, শীতও করছে না, কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে, যদিও কী জন্য বা কার উপর তা বুঝতে পারছি না। হু হু হু! এখন দৌড়াবার সময় হয়েছে! আজ রাতে আমি পাহাড় পার হয়ে উত্তরের জলাভূমির দিকে দৌড়ে যাব, তারপর আবার দৌড়ে ফিরে আসব। আমি খুব দীর্ঘ কাল অতি সহজে শিকার করেছি। আমার চার সঙ্গীও আমার সাথে যাবে। ওরা সাদা গুবরে পোকার মতো মোটা হয়ে গেছে।

সে ওদের ডাক দিল, কিন্তু চারজনের মধ্যে একজনও সাড়া দিল না। ওরা তখন দলের অন্য নেকড়েদের সঙ্গে বসন্তের গান গাইছিল, চাঁদ ও শম্বর হরিণের গান। সেখানে ওদের কানে মৌগলির ডাক পৌঁছল না। বসন্তের সময় অরণ্যের প্রাণীকুলের কাছে দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। মৌগলি আবার তীব্র কণ্ঠে গর্জে উঠল, কিন্তু উত্তরে সে শুধু শুনল ডোরাকাটা গেছো বিড়ালের ব্যঙ্গাত্মক মিয়াও ধ্বনি। বিড়ালটা তখন এক বৃক্ষশাখা থেকে অন্য বৃক্ষশাখায় পাখির বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বিড়ালের মিয়াও শুনে মৌগলি রাগে কেঁপে উঠল, খাপ থেকে তার ছুরি অর্ধেকটা বেরিয়ে এলো। তারপর ওখানে তাকে লক্ষ করার মতো কেউ না থাকলেও, মৌগলি মাথা উঁচু করে, ভ্রুযুগল নিচে নামিয়ে, রাগী পদক্ষেপে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল। কিন্তু তার লোকদের মধ্যে একজনও তাকে কোনো প্রশ্ন করল না, তারা তখন অন্যত্র নিজেদের কাজ নিয়ে ছিল মহাব্যস্ত।

মৌগলি নিজের অন্তরে জানত যে এটা ছিল যুক্তিহীন, তবু সে আপন মনে বলল, দাক্ষিণাত্য থেকে লাল কুকুরের দল এলে কিংবা বাঁশঝাড়ে লাল ফুল নাচতে শুরু করলে গোটা অরণ্য কুঁইকুঁই করে মৌগলির কাছে ছুটে আসবে, তাকে বড় বড় নামে ডাকবে। কিন্তু এখন, যেহেতু বসন্তের আঁখি রক্তিম হয়ে উঠেছে, আর ময়ূর তার নগ্ন পা দেখিয়ে বসন্তনৃত্য করছে, সেই হেতু সমস্ত অরণ্য তাবাকির মতো পাগল হয়ে গেছে ...। যে ষাঁড়ের দামে আমাকে কেনা হয় সেই ষাঁড়ের শপথ! আমি কি অরণ্যের প্রভু, না প্রভু নই ? এই, চুপ কর ! তোমরা এখানে কী করছ ?

দলের দুটি তরুণ নেকড়ে ছুটতে ছুটতে এদিকে এসে পড়েছে। তারা মারামারি করার জন্য ফাঁকা জায়গা খুঁজছিল। তাদের ঘাড়ের রোম শক্ত খাড়া হয়ে উঠেছে তারের মতো, তারা ভীষণ তর্জনগর্জন করছে, ঘুরে ঘুরে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। মৌগলি এক লাফে সামনে এসে তার দু'হাত দিয়ে নেকড়ে দুটির টুঁটি চেপে ধরল। সে আশা করেছিল যে সে ওদের দু'জনকে এক ধাক্কায় দুদিকে ছিটকে ফেলে দিতে পারবে। অতীতে দলের শিকার বা খেলাধুলার সময় সে এরকম বহুবার করেছে। কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো বসন্তের কোনো দ্বন্দ্বে সে হস্তক্ষেপ করে নি। নেকড়ে দুটি এখন তাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে ঠেলে দিল, তারপর কোনো কথা না বলে নিজেদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হলো। মৌগলি প্রায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো। এখন তার ছুরি কোষমুক্ত, তার দাঁত অনাবৃত, ওই মুহূর্তে সে নেকড়ে দুটিকে মেরে ফেলতে পারত, তার ইচ্ছার

অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৌগলি আপন মনে বলল, আমি নিঃসন্দেহে বিষাক্ত কিছু খেয়েছি।

বিরুদ্ধে ওরা মারামারি করছিল শুধু ওই অপরাধে, যদিও অরণ্যের আইনে প্রতিটি নেকড়ের এই রকম মারামারি করার সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল। মৌগলি ওদের চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরল, তার কাঁধ ও হাত কাঁপছে, সে নেকড়ে দুটির মারামারির প্রথম পর্বটা স্তিমিত হবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন সে দুটোকেই মারাত্মক আঘাত করবে। কিন্তু ওই অপেক্ষা করার সময়ে তার মনে হলো তার শরীর থেকে যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সে তার ছুরি নামিয়ে আনল, তারপর সেটাকে খাপে ঢুকিয়ে ওদের লড়াই দেখতে লাগল।

অবশেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৌগলি আপন মনে বলল, আমি নিঃসন্দেহে বিষাক্ত কিছু খেয়েছি। লাল ফুল দিয়ে টিলামঞ্চে দলের সভা ভেঙে দেবার পর থেকে, শের খানকে হত্যা করার পর থেকে, দলের কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে

হটিয়ে দিতে পারে নি। আর আজ এই বাচ্চা দুটো নেকড়ে, ক্ষুদে দুটো শিকারি, তাই করল! আমার সব শক্তি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। আমি শিগগিরই এবার মারা যাব। ওহ্, মৌগলি, তুমি কেন ও দুটোকে খতম করে দিচ্ছ না?

ওদের লড়াই চলতে থাকল। অবশেষে একটা নেকড়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। আর মৌগলি ছেঁড়াখোঁড়া রক্তাক্ত জায়গাটায় একা দাঁড়িয়ে থাকল। সে একবার তার ছুরির দিকে তাকাচ্ছে, একবার তার হাত ও পায়ের দিকে আর একটা কাঠের গুঁড়ি যেমন জলের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে যায় তেমনিভাবে একটা অচেনা নিরানন্দ অনুভূতির মধ্যে তার সমগ্র সত্তা ডুবে গেল।

রাতের প্রথম দিকেই সে শিকার করল কিন্তু খেলো খুব সামান্য। বসন্তের দৌড়ের জন্য সে নিজেকে তরতাজা রাখতে চায়। সে আহার করল একাকী, কারণ অরণ্যের সব প্রাণী তখন হয় গান করছে নয় মারামারি করছে। অরণ্যের প্রাণীকুল এ রকম রাতকে বলত নিখুঁত সাদা রাত। সকল সবুজ জিনিস যেন সকাল থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যে এক মাসের বাড় বেড়ে গেছে। আগের দিনের একটা জীর্ণ হলুদ পাতার ডালকে মৌগলি ভেঙে ফেলতেই তার মধ্য থেকে টিপটিপ করে রস ঝরে পড়ল। তার পা ঢেকে যাচ্ছিল গভীর কোঁকড়ানো উষ্ণ শ্যাওলায়। কচি ঘাসগুলিতে এখন কোনো তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্ত নেই। অরণ্যের সমস্ত কণ্ঠস্বর চাঁদের ছোঁয়া লাগা একটা বীণার সুর তরঙ্গের মতো গভীর ধ্বনিতে গমগম করে বেজে উঠল—নতুন সংলাপের চাঁদ— চন্দ্রালোক ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড় আর জলাশয়ের উপর, পিছলে গেল গাছের কাণ্ড আর লতাগুল্মের মধ্য দিয়ে, প্রবাহিত হলো লাখ লাখ পাতার ভেতর দিয়ে। মৌগলি তার দৌড়ের গতি নিজের পছন্দসই ছন্দের মধ্যে এনে, নির্ভেজাল আনন্দে, তার সব বেদনা-অতৃপ্তি ভুলে, উচ্চস্বরে গান গেয়ে উঠল। সে উত্তরের জলাভূমিতে যাবার জন্য দীর্ঘ ঢালু পথটা বেছে নিয়েছিল, যেটা অরণ্যের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। সে তো দৌড়াচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন উড়ে যাচ্ছে। তার পদক্ষেপ থেকে কোনো শব্দ উত্থিত হলো না। একটা মানব-শিক্ষিত মানুষ এই প্রতারণামূলক চন্দ্রালোকের মধ্য দিয়ে ছুটলে বহুবার হোঁচট খেয়ে পড়ত, কিন্তু অনেক বছরের অভিজ্ঞতায় মৌগলির পেশিগুলি তাকে একটা পালকের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল। কোনো জীর্ণ কাঠের গুঁড়ি কিংবা লুকানো প্রস্তরখণ্ড তার পায়ের নিচে নড়ে উঠলে সে সাবলীলভাবে নিজেকে রক্ষা করল, তার গতিবেগকে একটুও শ্লথ না করে, সচেতনভাবে কিছু চিন্তা না করেই। মাটিতে

ছুটতে খারাপ লাগলে সে বান্দরলোকদের মতো দুহাত উঁচু করে সব চাইতে কাছের লতাটা ধরে ফেলে যেন ভাসতে ভাসতে উঠে গেল গাছের একেবারে সরু ডালপালার মধ্যে। তারপর সে বৃক্ষ-সরণি ধরে এগিয়ে চলল। তার মনের গতি পাল্টে গেলে আবার সে একটা গাছের পত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ বাঁক বেয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এলো। সেখানে সিক্ত শিলাখণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত ফাঁপা জায়গায় তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। চারিদিকে রাতের ফুলমালার গুরুভার গন্ধ, লতাগুল্মে অজস্র কুঁড়ি ফুটে আছে। দুপাশের বৃক্ষশোভিত কালো প্রশস্ত পথে চাঁদের সুবিন্যস্ত আলো পড়ে তাকে দেখাল কোনো গির্জার সরু পথের বিচিত্রিত মার্বেলের মতো। তারপর মৌগলি ছুটে চলল ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে, বুক-সমান উঁচু, ভেজা, কখনো কখনো কোনো লতা যেন দু'বাহু বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। সে পার হয়ে গেল ভাঙা প্রস্তরখণ্ডে ছাওয়া পর্বতশীর্ষমালা, অনায়াসে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফ দিল, নিচে গুহার মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত ক্ষুদে শিয়ালগুলি চমকে উঠল কয়েকবার। দূর থেকে খুব ক্ষীণভাবে ভেসে আসা একটা শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনল সে। শুয়োরটা একটা গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে তার দাঁত ক্ষুরধার করে শানিয়ে নিচ্ছিল। মৌগলি একা ওই বৃহদাকার ধূসর জানোয়ারটার সামনে এসে পড়ল, ওটা একটা দীর্ঘ তরুর বাকল আঁচড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, চোখ জ্বলছে আগুনের মতো। কিন্তু মৌগলি ছুটে গেল আপন মনে, নিঃশঙ্ক চিত্তে। একবার সে শুনল শিং-এ শিং-এ তীব্র ঘর্ষণের আওয়াজ, একটা হিসহিস ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, তারপরই সে দেখল দুটো ক্রোধোন্মত্ত শম্বর হরিণ তার পাশ ফিরে ছুটে গেল, মাথা নিচু করে, তাদের গায়ে রক্তের দাগ, চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে। অথবা নদীর অগভীর একটা দ্রুত ধাবমান অংশে সে কুমির জাকালাকে একটা ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে শুনল, কিংবা হঠাৎ সে বিষাক্ত প্রাণীকুলের একটা চাকের বিরক্তি উৎপাদন করল কিন্তু তার গায়ে ওরা একটি হুল ফোটাবার আগেই সে অনেক দূর ছুটে চলে গেল, তারপর একটা ঝলমলে নুড়ি ছড়ানো সৈকত পেরিয়ে আবার গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল।

এইভাবে সে দৌড়াল, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠল, মাঝে মাঝে আপন মনে গান গাইল, ওই রাতে গোটা অরণ্যের সব চাইতে সুখী প্রাণী সে। তারপর এক সময় ফুলদলের একটা বিশেষ গন্ধ তাকে সতর্ক করে দিল যে সে জলাভূমির কাছে এসে পড়েছে, আর এটা হলো তার দূরতম শিকারের জায়গারও অনেক বাইরে।

এখানেও মানবশিক্ষিত কোনো মানুষ তিন পা দিতে না দিতেই কাদামাটিতে ডুবে যেত, কিন্তু মৌগলির পায়ে চোখ বসানো ছিল, তাই তার কপালের নিচের চোখ থেকে কোনো সাহায্য না নিয়েই সে এক ঘাসের স্তূপ থেকে অন্য ঘাসের স্তূপে সহজে উত্তীর্ণ হলো। সে জলাভূমির কেন্দ্রস্থলে ছুটে গেল, ছুটে যাবার সময় হাঁসগুলিকে চমকে দিল, তারপর সে ওখানে শ্যাওলাবৃত, কালো জলের ঝাপ্টায় সিক্ত, একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল। তার চারপাশের জলাভূমি এখন সম্পূর্ণ জেগে গেছে। বসন্তে পক্ষীকুলের ঘুম খুব হাল্কা হয়। সারারাত ধরেই তাদের বিভিন্ন দল এখানে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করছিল। মৌগলি লম্বা লম্বা নলখাগড়ার পাশে বসে আপন মনে গান গাইল, শুধুই সুর, কোনো কথা ছিল না সেই গানে। সে তার পায়ের শক্ত বাদামি তলা খুঁটিয়ে দেখল, কোনো কাঁটা সেখানে বিঁধে আছে কিনা তা দেখে নিল। সে কী করছে বা না করছে কেউ তা লক্ষও করল না। মৌগলির মনে হলো সে তার সমস্ত অসুখ তার নিজের অরণ্যে ফেলে এসেছে, সে আবার তার ভরাট গলায় গান গাইবার উপক্রম করল, কিন্তু তখুনি আবার তার অসুখ-বেদনা-অতৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করল, আগের চাইতে দশগুণ বেশি তীব্রতা নিয়ে।

এবার মৌগলি যথার্থই ভীত হলো। সে অর্ধ-সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠল, এখানেও ওটা এসে উপস্থিত হয়েছে! এখানেও ওটা আমাকে অনুসরণ করেছে! সে তার কাঁধ ঘুরিয়ে দেখল ওটা তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা। না, ওখানে তো কেউ নেই। এদিকে জলাভূমির নৈশকালীন শব্দাবলি অব্যাহতভাবে চলতে লাগল, কিন্তু কোনো পাখি কিংবা কোনো পশু তার সঙ্গে একটি কথাও বলল না, আর তার নবজাগ্রত যন্ত্রণার অনুভূতি আরো বেড়ে গেল।

মৌগলি ভয়ার্ত গলায় বলল, আমি নিঃসন্দেহে বিষাক্ত কিছু খেয়েছি। অসাবধানে। আর তাই আমার সমস্ত শক্তি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। আমি ভয় পেয়েছিলাম— না, ঠিক আমি নয়—ওই নেকড়ে দুটোর লড়াইয়ের সময় মৌগলি পেয়েছিল। অথচ আকেলা, এমনকি ফা-ও, ওই দুটোকে থামিয়ে দিতে পারত। আমি যে বিষাক্ত কিছু খেয়েছি এটা তার নিশ্চিত প্রমাণ। কিন্তু অরণ্যের কারো এতে কী এসে যায়? তারা গান করে, চেঁচায়, মারামারি করে, চাঁদের আলোয় ছোটাছুটি করে, আর আমি এখানে বিষাক্ত জিনিস খাওয়ার ফলে জলাভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি।

নিজের প্রতি অনুকম্পায় সে এত দুঃখ বোধ করল যে তার চোখে জল এসে গেল। সে বলে চলল, পরে ওরা আমাকে এই কালো জলে মরে পড়ে থাকতে

হবে। না, না, আমি আমার নিজের অরণ্যে ফিরে যাব। আমি সভার টিলামঞ্চে মৃত্যুবরণ করব, আর বাঘিরা, যাকে আমি ভালোবাসি, সে যদি উপত্যকায় চিৎকার করতে না থাকে, সে হয়তো আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার ওপর নজর রাখবে, যেন আকেলার ক্ষেত্রে চিল যা করেছিল আমার ক্ষেত্রে তা করতে না পারে।

এক ফোঁটা বড় উষ্ণ অশ্রু তার হাঁটুর উপর পড়ল, আর মৌগলি তার এত বেদনার্ত অবস্থায়ও একটা সুখ অনুভব করল, তোমরা যদি এই জাতীয় উল্টো সুখের ব্যাপারটা বুঝতে পারো। সে আবার বলল, যে রাতে আমি দলকে লাল কুকুরদের হামলা থেকে রক্ষা করেছিলাম, সেই রাতে আকেলার ক্ষেত্রে চিল যা করেছিল তা যেন আমার ক্ষেত্রে না ঘটে। সে একটু সময় চুপ করে থাকল, নিঃসঙ্গ নেকড়ের শেষ কথাগুলি তার মনে পড়ল। তোমাদের তা অবশ্যই মনে আছে। তো আকেলা তখন অনেক বোকা-বোকা কথা বলেছিল, মৃত্যুর মুহূর্তে একজনের ভেতর অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে যায়। ও বলেছিল... কিন্তু না, আমি অবশ্যই অরণ্যের লোক !

উত্তেজনায়, ওয়েনগুঙ্গার তীরের ওই যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়ায়, মৌগলি তার শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল উচ্চস্বরে। ওই শব্দ শুনে একটা বুনো মেয়ে-মোষ নলখাগড়ার মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, মানুষ!

নাহ্। বন্য মহিষ মাইসা বলল, মানুষ নয়, সিওনি দলের রোমলোমহীন নেকড়েটা। এই রকম রাতে সে সর্বত্র ছুটে বেড়ায়।

মেয়ে-মোষটা ও! বলে, মাথা নিচু করে, আবার ঘাস খেতে শুরু করল। আমি ভেবেছিলাম মানুষ।

আমি বলছি না। তারপর মাইসা একটা ডাক ছেড়ে জিজ্ঞাসা করল, ও, মৌগলি, কোনো বিপদ আছে ?

মৌগলি ব্যঙ্গ করে জবাব দিল, ও, মৌগলি, কোনো বিপদ আছে ? মাইসা শুধু একটা কথাই চিন্তা করে : বিপদ আছে কিনা ? আর যে মৌগলি সারা রাত অরণ্যে ছুটে বেড়ায়, তাদের উপর নজর রাখে, তার কী হলো না হলো সে ব্যাপারে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই।

মেয়ে-মোষটা বলল, কী রকম চেঁচাচ্ছে দেখো।

মাইসা তাচ্ছিলের সঙ্গে জবাব দিল, ওরা ওই রকমই করে। ঘাস ছিন্নভিন্ন করার পর কীভাবে সেই ঘাস খেতে হবে তা ওরা জানে না।

মৌগলি নিজের উদ্দেশে বলল, এর চাইতে অনেক কম ঔদ্ধত্যের জন্য আমি গত বর্ষার সময় মাইসাকে খুঁচিয়ে কাদাজল থেকে তুলে এনে তার পিঠে চড়ে দাবড়ে বেড়িয়েছি। সে একটা নলখাগড়া ভেঙে আনবার জন্য হাত বাড়িয়েই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার হাত গুটিয়ে নিল। মাইসা নিরুদ্বেগে জাবর কেটে চলল, আর মেয়ে মোষটি তার চারণক্ষেত্রে লম্বা লম্বা ঘাসের গুচ্ছ টেনে ছিঁড়ে তার মুখে পুরতে থাকল। মৌগলি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, আমি এখানে মরব না। মাইসা আর জাকালা আর শুয়োরটা, ওরা এক রক্তের প্রাণী, ওরা এখানে আমাকে দেখবে। আমি জলাভূমির ওপাশে চলে যাই, দেখা যাক কী হয়। আমি এর আগে কখনো এরকম বসন্তের দৌড় দৌড়াই নি, একসঙ্গে উত্তপ্ত ও শীতল। ওঠো, মৌগলি, চল!

সে চুপিচুপি নলখাগড়ার ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাইসাকে তার ছুরির একটা খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারল না। মোষটা তার জলকাদার শয্যা থেকে একটা বোমা ফাটাবার মতো শব্দ করে উঠে এলো, আর মৌগলি হাসতে হাসতে বসে পড়ে বলল, এখন বলো, মাইসা, সিওনি দলের ওই রোমলোমহীন নেকড়েই এক সময় তোমার রাখাল-বালকের দায়িত্ব পালন করেছে, তাই না?

মাইসা কাদার মধ্যে পা ঠুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, তুমি! নেকড়ে! সমস্ত অরণ্য জানে তুমি পোষা গরুর রাখাল-বালকের কাজ করেছ, ওই ক্ষেতগুলির ওপাশে মানুষের বাচ্চারা চেঁচামেচি করে যে কাজ করে থাকে সেই কাজ। তুমি অরণ্যের প্রাণী? কোনো শিকারি এভাবে সাপের মতো চুপিচুপি এসে এ ধরনের নোংরা কৌতুক করত? এটা তো শিয়ালের কৌতুক! আমার সঙ্গিনীর সামনে আমাকে এ রকম লজ্জা দেবার কোনো মানে হয়? আমি... আমি তোমাকে... রাগে তার মুখে ফেনা উঠে এলো। অরণ্যের সব প্রাণীর মধ্যে মাইসা মোষের মতো বদমেজাজী আর কেউ ছিল না।

মৌগলি তাকে ফোঁস ফোঁস করতে শুনল। মাইসার চোখের দৃষ্টি একটুও বদলাল না। মৌগলি ছড়ানো ছিটানো কাদার শব্দের উপরে তার গলা চড়িয়ে বলল, মাইসা, এখানে কোনো মানুষদল বাস করে? এ অরণ্য আমার জন্য নতুন।

ক্রুদ্ধ মোষ গর্জে উঠে বলল, তা হলে উত্তরে চলে যাও। তুমি যা করেছ তা হলো একটা ন্যাংটা রাখাল বালকের কৌতুক। মৌগলি তাকে বেশ জোরে খোঁচা দিয়েছিল, সে ভীষণ রেগে গিয়েছিল। জলাভূমির পাদদেশে যে গ্রাম আছে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলো।

মৌগলি বলল, মানুষদল অরণ্যের গল্প ভালোবাসে না, আর আমার মনে হয় না, মাইসা, তোমার চামড়ায় একটু খোঁচা লাগলে তার জন্য দলীয় সভা ডাকতে হবে। যাই হোক, আমি ওই গ্রামটা একবার দেখে আসব। শান্ত হও, মাইসা, অরণ্যের প্রভু রোজ রাতে তোমাকে চরাতে আসে না।

সে জলাভূমির একেবারে কিনারে কম্পমান জমির ওপর এসে দাঁড়াল। সে বেশ ভালো করেই জানত যে মাইসা তার ওপর দিয়ে তাকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসবে না। ওর রাগের কথা স্মরণ করে সে হেসে উঠল, তারপর আবার ছুটতে শুরু করল।

মনে মনে মৌগলি বলল, আমার শক্তি একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। সম্ভবত বিষের ক্রিয়া হাড় পর্যন্ত পৌঁছায় নি। ওই যে, ওখানে একটা তারাকে বেশ নিচে জ্বলজ্বল করতে দেখা যাচ্ছে। সে তার দু'হাত গোল করে তার মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকাল। পরমুহূর্তে একটা শপথ বাক্য উচ্চারণ করে মৌগলি বলল, আরে, ওটা তো লাল ফুল—সিওনি দলে আসবার আগে যে লাল ফুলের পাশে আমি এক সময় চুপচাপ শুয়ে থাকতাম! আমার দেখা হয়ে গেছে, এবার আমি আমার দৌড় শেষ করব।

জলাভূমি একটা প্রশস্ত প্রান্তরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছিল। মানুষের কাজকর্মের সঙ্গে মৌগলি দীর্ঘকাল কোনো সম্পর্ক রাখে নি।

কিন্তু আজ রাতে ওই লাল ফুলের ঝিলিমিলি তাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সে আপন মনে বলল, বহুকাল আমি যেরকম করেছিলাম সেরকম করব আমি। আমি একটু দেখব। মানুষদল কতটুকু বদলেছে সেটা আমি দেখব।

সে ভুলে গেল যে সে এখন তার নিজের অরণ্যে নেই, তার যা খুশি তাই সে এখানে করতে পারে না। শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে সে অসতর্কভাবে কুটিরটির কাছে এসে দাঁড়াল। কুটিরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে। সে গ্রামের প্রান্তসীমানায় এসে পড়েছিল। তাকে দেখে তিন-চারটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল।

হো! বলে মৌগলি নিঃশব্দে বসে পড়ল। একটা গম্ভীর নেকড়ে-ডাক দিয়ে সে কুকুরগুলিকে নিস্তব্ধ করে দিল। যা হবার তাই হবে, মৌগলি, কিন্তু মানুষদলের বাসগুহা নিয়ে তোমার কী করবার আছে? মনে মনে নিজেকে এই প্রশ্ন করে সে মুখে হাত বুলাল। কয়েক বছর আগের কথা তার মনে পড়ল।

অন্য একটা মানুষদল যখন তাকে তাড়িয়ে দেয় তখন তাদের ছোঁড়া একটা পাথর তার মুখে এসে লেগেছিল।

এমন সময় কুটিরের দরজা খুলে গেল। একটি মেয়েমানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উঁকি দিয়ে দেখল। ঘরের মধ্যে একটা শিশু কেঁদে উঠতেই মেয়েমানুষটি পেছন ফিরে বলল, ঘুমাও। শিয়াল দেখে কুকুরগুলি চিৎকার করেছিল। একটু পরেই সকাল হবে।

ঘাসের মধ্যে বসা মৌগলির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। ওই কণ্ঠস্বর তার অতিপরিচিত। তবু নিশ্চিত হবার জন্য সে নিচু গলায় ডাকল, মেসুয়া! ও মেসুয়া!

মেয়েমানুষ বলল, কে ডাকে ? তার গলাও কেঁপে গেল।

মৌগলি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ভুলে গেছ ? তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মেয়ে মানুষটি কুটিরের দরজা অর্ধেক বন্ধ করে ফেলেছিল। একটা হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরে সে বলল, তুমি যদি সত্যিই সে হও, তাহলে তোমাকে আমি কী নাম দিয়েছিলাম বলো।

মৌগলি বলল, নাথু! নাথু! তোমাদের বোধহয় মনে আছে যে মৌগলি তখন প্রথম মানুষদলের কাছে আসে তখন মেসুয়া তাকে ওই নাম দিয়েছিল।

মেয়েমানুষটি তাকে কুটিরের মধ্যে আসতে আহ্বান করল। মৌগলি আলোর বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে পূর্ণ দৃষ্টিতে মেসুয়ার দিকে তাকাল। এই মেয়েমানুষ তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছে, বহুদিন আগে সে মানুষদলের হাত থেকে এই রমণীকে রক্ষা করেছিল। এখন তার বয়স হয়েছে, চুল সাদা, কিন্তু তার চোখ আর কণ্ঠস্বর একটুও বদলায় নি। মেয়ে মানুষের মতো মেসুয়া আশা করেছিল যে মৌগলি আগের মতোই আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সে বিভ্রান্ত চোখে মৌগলির বুক থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। মৌগলির মাথা দরজার ওপর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে।

মেসুয়া মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার ছেলে। তারপর সে মৌগলির পায়ের কাছে বসে পড়ল। কিন্তু তুমি এখন আর আমার ছেলে নও, তুমি অরণ্যের দেবতা।

তেলের প্রদীপের লাল আলোয় মৌগলিকে অরণ্যের কোনো রূপকথার দেবতার মতোই দেখাচ্ছিল। বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায়, সুদর্শন, মাথার লম্বা কালো চুল কাঁধের উপর দিয়ে নিচে নেমে এসেছে, গলায় ঝোলানো ছুরি একটু একটু দুলছে, মাথায় সাদা চামেলির মালা মুকুটের মতো করে জড়ানো। পাশের খাটে

একটি শিশু অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে ছিল। হঠাৎ সে জেগে গিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। মেসুয়া ওর দিকে ঘুরে ওকে শান্ত করতে লাগল, আর মৌগলি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখা জলের কলস, রান্নার হাঁড়িপাতিল, ধান-চাল রাখার ঢাকনা দেওয়া পাত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মানুষের ব্যবহার্য এমন জিনিসের স্মৃতি তার মনে ভালোভাবে জেগে আছে।

মেসুয়া গুঞ্জন করে বলে উঠল, তুমি কী খাবে ? কী পান করতে চাও তুমি ? এই সবই তোমার। আমাদের জীবনের জন্য আমরা তোমার কাছে ঋণী। কিন্তু তুমি কি সত্যি সেই ছেলে যাকে আমি নাথু বলে ডাকতাম, নাকি তুমি অরণ্যের কোনো দেবতা ?

মৌগলি বলল, আমি নাথু। আমার নিজের জায়গা থেকে অনেক দূর চলে এসেছি আমি। আমি এই আলোটা দেখতে পাই, আর তার টানে আমি এখানে চলে আসি। তুমি যে এখানে আছ তা আমি জানতাম না।

মেসুয়া বলল, আমরা খানিওয়ারায় আসার পর, যে গ্রামবাসীরা আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে চায়। ওই ঘটনার কথা তোমার মনে আছে ?

আছে। আমি কিছু ভুলি নি।

কিন্তু ইংরেজদের আইনী ব্যবস্থা যখন ঠিক হলো তখন আমি ওই দুষ্ট লোকদের খোঁজ করতে গিয়ে ওই গ্রামের কোনো চিহ্নই কোথাও খুঁজে পেলাম না।

মৌগলির নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল, এটাও আমার মনে আছে।

তখন আমার মরদ ক্ষেতের কাজ করতে শুরু করল। সে বেশ জোয়ান। এখানে আমাদের একটু জমি হলো। আগের গ্রামের মতো অত বড় নয়, কিন্তু আমাদের মাত্র দুজন মানুষের চাহিদা তো ছিল সামান্য।

ও কোথায় ? যে মানুষটা সেই আতঙ্কের রাতে ঘরের কোনায় মাটি খুঁড়েছিল ?

ও মারা গেছে, বছর খানেক আগে।

শিশুটিকে দেখিয়ে মৌগলি বলল, আর ও ?

আমার ছেলে। দুই বর্ষা আগে জন্মেছে। তুমি যদি দেবতা হও তাহলে ওকে অরণ্যের বরাভয় দাও, তোমার— তোমার লোকেরা যেন তাকে নিরাপদ রাখে, যেমন তারা আমাদের রেখেছিল ওই রাত্রে।

সে শিশুটিকে উঁচু করে তুলে ধরল, আর শিশুটিও এখন তার ভয় ভুলে গিয়ে মৌগলির বুকের কাছে ঝুলতে থাকা ছুরির দিকে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। মৌগলি সন্তর্পণে ওর ছোট ছোট আঙুলগুলো একপাশে সরিয়ে দিল।

মেসুয়া বলে চলল, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল, আর তুমি যদি বাঘে তুলে নিয়ে যাওয়া আমার সেই নাথু হও তাহলে ও তোমার ছোট ভাই। ওকে তুমি বড় ভাই-এর আশীর্বাদ দাও।

হায়-মাঈ! আশীর্বাদ কী জিনিস ? আমি ওসবের কী জানি ? আমি দেবতা নই, আর এই শিশুও আমার কোনো ভাই নয়, কিন্তু মা, ওহ্ মা, আমার বুকের ভেতরটা কেন এমন ভার হয়ে আছে ? তার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। সে আস্তে শিশুটিকে নামিয়ে দিল।

মেসুয়া রান্নার হাঁড়িপাতিল নাড়তে নাড়তে বলল, খুব স্বাভাবিক। সারা রাত জলাভূমিতে দৌড়াদৌড়ি করলে এরকমই হয়। জ্বর যে তোমার মজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অরণ্যের কোনো কিছু যে তার অনিষ্ট করবে এটা ভাবতেই মৌগলির মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। মেসুয়া বলল, আমি আগুন জ্বেলে তোমাকে দুধ গরম করে দিচ্ছি। ওটা খাবে তুমি। আর তোমার চামেলির মালা মাথা থেকে খুলে ফেলো।

এতটুকু ঘরে তার গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

মৌগলি বিড়বিড় করতে করতে দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে বসে পড়ল। নানা রকম অজানা অচেনা অনুভূতি হতে লাগল তার, সে যেন যথার্থই কোনো বিষাক্ত দ্রব্য খেয়েছে। তার মাথা ঘুরতে লাগল, একটু বমির ভাবও হলো। বড় বড় চুমুক দিয়ে সে গরম দুধটা খেয়ে ফেলল। মেসুয়া মাঝে মাঝে সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে দিল। সে এখনও নিশ্চিত নয়, ও তার বহু দিন আগের হারিয়ে যাওয়া ছেলে নাথু, নাকি অরণ্যের কোনো অত্যাশ্চার্য প্রাণী। কিন্তু সে যে অন্তত রক্ত মাংসের কেউ তাতেই মেসুয়া খুশি হলো।

অবশেষে সে বলল, তার দুচোখে অহঙ্কারের দ্যুতি, বাছা, তোমাকে কি কেউ বলেছে যে তোমার মতো সুপুরুষ আর কেউ নেই ?

হাঁ ? বলল মৌগলি। স্বাভাবিকভাবেই ওরকম কোনো কথা সে কারো কাছ থেকে কখনো শোনে নি। মেসুয়া সুখে আনন্দে মৃদু হাসল। মৌগলির মুখের চেহারাই তার জন্য যথেষ্ট হলো। সে বলল, তাহলে আমিই প্রথম ? একজন মা তার পুত্রকে এসব সুন্দর কথা সর্বপ্রথম বলবে, এটাই সঙ্গত। যদিও খুব কম

কা বলল, খোলস ছাড়ার পর আমরা কেউ তার মধ্যে নতুন করে আবার প্রবেশ করি না। এটাই আইন।

সময়ই তা ঘটে থাকে। তুমি খুব সুন্দর দেখতে। এরকম পুরুষ মানুষ আমি এর আগে কখনো দেখি নি।

মৌগলি তার শক্ত সমর্থ কাঁধের উপর দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করল, আর মেসুয়া তার ভাবভঙ্গি দেখে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে আবার হাসতে শুরু করল যে মৌগলি নিজেও তার সঙ্গে সঙ্গে হাসতে লাগল, আর শিশুটিও খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে একবার মায়ের কাছে একবার মৌগলির কাছে যেতে লাগল।

মেসুয়া শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, না, তোমার ভাইকে ঠাট্টা করবে না তুমি। তুমি যদি তোমার ভাইয়ের অর্ধেক সুন্দর হয়েও বড় হও তাহলে আমরা তোমাকে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেব, আর তুমি মস্ত বড় হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবে।

এসব কথাবার্তার তিন ভাগের দু'ভাগই মৌগলি বুঝতে পারল না। দীর্ঘ দৌড়ের শেষে গরম দুধ খাওয়ার পর তার খুব ঘুম পেল। সে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল এবং এক মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। মেসুয়া হাত দিয়ে চোখের উপর থেকে তার চুল সরিয়ে দিল, তার গা ঢেকে দিল একটা চাদর দিয়ে। তাকে খুব সুখী দেখাল। মৌগলি, অরণ্যের ধারা অনুযায়ী, বাকি রাতটুকু এবং পরের গোটা দিনটা ঘুমিয়ে কাটাল। তার সহজাত অনুভূতি, যদিও তা কখনোই সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়ত না, তাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে এখানে তার ভয়ের কিছু নেই। অবশেষে তার ঘুম ভাঙল, এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল, তার হাতে খোলা ছুরি। মুখের উপর চাদর থাকার জন্য সে ফাঁদের স্বপ্ন দেখছিল। সে ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তার দুচোখ তখনো ঘুমে ভারি হলেও সে লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মেসুয়া হেসে উঠে তার সামনে খাবার বেড়ে দিল।

আগুনে সেঁকা কয়েকটা মোটা মোটা পিঠা, কিছু ভাত, আর এক গোল্লা টক তেঁতুল। তার রাতের শিকারের আগ পর্যন্ত যথেষ্ট। জলাভূমিতে শিশিরের গন্ধ তাকে ক্ষুধার্ত ও চঞ্চল করে তুলল। সে তার বসন্তের দৌড়টা শেষ করতে চাইল, কিন্তু শিশুটি তার কোল ছেড়ে নামল না, আর মেসুয়া জোর দিয়ে বলল যে তার দীর্ঘ নীলচে কালো চুল সে ভালো করে আঁচড়ে দেবে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সে মৌগলির চুল আঁচড়ে দিল, তাকে তার ছেলে বলে সম্বোধন করল, মৌগলি যেন মেসুয়ার শিশুপুত্রকে তার অরণ্য-ক্ষমতার খানিকটা দেয় সেজন্য মিনতি করল। কুটিরের দরজা বন্ধ ছিল। মৌগলি এই সময় একটা অতিপরিচিত শব্দ শুনল, মেসুয়ার ভীত সন্ত্রস্ত চিবুককে ঝুলে পড়তে দেখল। তখন মৌগলির চোখ গিয়ে পড়ল দরজার তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া একটা বিশাল ধূসর থাবার উপর। দরজার বাইরে ধূসর ভাই একটা কাতর অনুতপ্ত শব্দ করল। তার গলায় দুর্ভাবনা ও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

মৌগলি মাথা না ঘুরিয়ে অরণ্যের ভাষায় বলল, যাও, বাইরে অপেক্ষা কর। যখন ডেকেছিলাম তখন তুমি আসো নি।

মেসুয়া বলে উঠল, বাবা, তুমি যখন আসবে তখন তোমার ভৃত্যদের সঙ্গে এনো না, কেমন ? আমি— আমরা সর্বদা অরণ্যের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছি।

মৌগলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শান্তি অক্ষুণ্ন থাকবে। ওই রাতে খানিওয়ারায় যাবার পথের কথা মনে করে দেখো। তখন এই রকম অনেকগুলি প্রাণী

তোমাদের সামনে পেছনে ছিল। কিন্তু আমি এখন দেখছি যে বসন্তেও অরণ্যের প্রাণীকুল সব সময় ভুলে যায় না। মা, আমি যাই।

মেসুয়া বিনীতভাবে একপাশে সরে দাঁড়াল। সে মনে মনে ভাবল, ও নিঃসন্দেহে অরণ্যের কোনো দেবতা। কিন্তু মৌগলি দরজার গায়ে হাত রাখতেই তার ভেতরকার মায়ের অন্তর কোনো ভয়ের বাধা মানল না। সে বারবার তার দু বাহু দিয়ে মৌগলির গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর ফিসফিস করে বলল, আবার ফিরে এসো। ছেলে হও বা না হও, আবার ফিরে এসো। দিনে কিংবা রাতে, তোমার জন্য এ দরজা কখনো বন্ধ থাকবে না।

মৌগলির মনে হলো তার গলার ভেতরকার শিরা-উপশিরা ধরে যেন কেউ টানাটানি করছে। সে কোনোরকমে বলল, আমি অবশ্যই ফিরে আসব।

কুটিরের বাইরে এসে সে লেজ নাড়া, তোষামোদ করা, নেকড়েটির পাশে চৌকাঠের ওপর বসে বলল, ধূসর ভাই, তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। অনেক দিন আগে আমি তোমাদেরকে আমার কাছে আসার জন্য ডেকেছিলাম, তখন চারজনের কেউ আসো নি।

কেন ?

অনেক দিন আগে ? এটা তো মাত্র গত রাতের কথা! আমি–আমরা, অরণ্যে নতুন গান গাইছিলাম। এটা নতুন সংলাপের সময়। মনে নেই তোমার ?

ঠিক, ঠিক।

আর গান গাওয়া হয়ে গেলেই, ধূসর ভাই আন্তরিকভাবে বলল, আমি তোমার পদচিহ্নরেখা ধরে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমি অন্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুতবেগে তোমাকে অনুসরণ করেছি। কিন্তু, ছোট্ট ভাই, এ তুমি কী করেছ, মানুষদলের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছ, তাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছ ?

ওরা দু'জন তখন আর বসে নেই। ওরা ছুটছিল। মৌগলি প্রচণ্ড গতিতে দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, যখন ডেকেছিলাম তখন যদি আসতে তাহলে এসব ঘটত না। ধূসর ভাই বলল, এখন কী হবে ?

মৌগলি উত্তর দিতে যাবে, এমন সময় গ্রামের প্রান্তসীমায় একটা মেঠো পথ দিয়ে সাদা কাপড় পরা একটি মেয়েকে আসতে দেখা গেল। চোখের পলকে ধূসর ভাই দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মৌগলিও নিঃশব্দে একটা শষ্যের ক্ষেতের মধ্যে পিছিয়ে এলো। শস্যের উষ্ণ সবুজ ডাঁটাগুলি তার মুখ ঢেকে দিল। সে তার মধ্যে একটা অশরীরী প্রাণীর মতো নিজেকে মিশিয়ে দিল। মেয়েটি তার এত কাছ দিয়ে গেল যে হাত বাড়ালেই সে তাকে প্রায় স্পর্শ

করতে পারত। মেয়েটির মনে হলো সে যেন একটা ভূত দেখেছে, সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল, তারপরই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মৌগলি দু'হাত দিয়ে শস্যের ডাঁটাগুলি ফাঁক করে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ নির্নিমেষ চোখে তাকে দেখতে থাকল।

তারপর সেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তো, আমি যখন ডাকলাম তখন তোমরা আসো নি কেন?

ধূসর ভাই মৌগলির গোড়ালির কাছটা চাটতে চাটতে বলল, আমরা তোমাকে অনুসরণ করেছি— তোমাকে আমরা অনুসরণ করেছি। নতুন সংলাপের সময় ছাড়া সব সময় আমরা তোমার পেছন পেছন আসি।

মৌগলি নিচু গলায় বলল, আর তোমরা কি মানুষদলের মধ্যেও আমাকে অনুসরণ করবে?

যে রাতে আমাদের পুরনো দল তোমাকে তাড়িয়ে দেয় সে রাতে কি আমি তোমাকে অনুসরণ করি নি? ক্ষেতের মধ্যে তুমি যখন ঘুমিয়েছিলে তখন কে তোমাকে জাগিয়েছিল?

কিন্তু যদি আবার তেমন কিছু ঘটে?

কেন, আমি কি আজ রাতেও তোমাকে অনুসরণ করি নি?

কিন্তু যদি বার বার, বার বার, এরকম ঘটে? এরকম আবারও ঘটতে পারে, ধূসর ভাই।

ধূসর ভাই চুপ করে থাকল। যখন সে কথা বলল তখন আপন মনেই গর্জে উঠল, কালো চিতা সত্য কথাই বলেছিল।

কী বলেছিল?

মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছেই যায়। আমাদের মা, রক্ষাও তাই বলেছিল—।

মৌগলি বিড়বিড় করে বলল, লাল কুকুরের রাতে আকেলাও একই কথা বলেছিল।

আমাদের মধ্যে সব চাইতে যে জ্ঞানী সেই কা-ও একই কথা বলেছে।

তুমি নিজে কী বলো, ধূসর ভাই?

ওরা তোমাকে একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল। তোমার সম্পর্কে মন্দ কথা উচ্চারণ করেছিল। পাথর ছুঁড়ে ওরা তোমার মুখ কেটে দিয়েছিল। ওরা বলদেওকে পাঠিয়েছিল তোমাকে হত্যা করার জন্য। ওরা তোমাকে লাল ফুলের

মধ্যে ফেলে দিতে চেয়েছিল। আমি না, তুমি বলেছ যে ওরা অশুভ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন। আমি না, তুমি বলেছ— আমি আমার নিজের লোকদের অনুসরণ করি— তুমিই ওদের মধ্যে অরণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছ। আমি না, তুমিই ওদের বিরুদ্ধে গান বানিয়েছ।

লাল কুকুরদের বিরুদ্ধে বানানো গানের চাইতেও বেশি তিক্ত।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তুমি কী বলো ?

তারা দৌড়াতে দৌড়াতে কথা বলছিল। ধূসর ভাই কোনো উত্তর না দিয়ে আরো কিছুক্ষণ দৌড়াল, লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটল, আর দু'লাফের মধ্যে থেমে থেমে বলল, মানবসন্তান, অরণ্যের প্রভু, রক্ষার পুত্র, আমার গুহা-ভ্রাতা, বসন্তে অল্প কিছু সময়ের জন্য ভুলে গেলেও, তোমার চিহ্নরেখা আমারও চিহ্নরেখা, তোমার শিকার আমারও শিকার, তোমার মরণ-লড়াই আমারও মরণ-লড়াই। আমি অন্য তিন জনের হয়েও কথা বলছি। কিন্তু তুমি অরণ্যকে কী বলবে ?

তুমি ঠিক বলেছ, শিকার দেখার পর তাকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করা ভালো নয়। তুমি আগে আগে যাও, সবাইকে দলীয় টিলামঞ্চে আসতে বলো। আমার মনে কী আছে আমি সেটা তখন সবাইকে বলব। কিন্তু নতুন সংলাপের এই সময়ে তারা হয়তো আসবে না, আমাকে তারা হয়তো ভুলে গেছে।

তো, তুমি নিজে কি কিছুই ভোলো নি ? ঘাড় ঘুরিয়ে তীব্র কণ্ঠে একথা বলে ধূসর ভাই সামনের দিকে ছুটে চলল, আর মৌগলি চিন্তান্বিত মুখে তাকে অনুসরণ করল।

অন্য যে কোনো ঋতু হলে অরণ্যের সব প্রাণী এই খবর পেয়ে জোট বেঁধে ছুটে চলে আসত।

কিন্তু এখন তারা শিকার করছে, মারামারি করছে, লড়াই করছে, হত্যা করছে আর গান গাইছে। ধূসর ভাই একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, অরণ্যের প্রভু মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছে! তোমরা সবাই সভার টিলামঞ্চে চলে আসো। কিন্তু প্রফুল্লচিত্ত, ব্যস্ত, প্রাণীকুল উত্তরে শুধু বলল, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে সে আবার ফিরে আসবে। বর্ষার জলধারা তাকে আবার গুহায় তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। ধূসর ভাই, এখন আমাদের সঙ্গে ছোটো আর গান গাও।

ধূসর ভাই আবার বলল, কিন্তু অরণ্যের প্রভু মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছে।

তারা উত্তর দিল, ই-ই-ই! ইয়োওয়া ওয়া ? সেজন্য কি নতুন সংলাপের সময় কিছু কম মধুর হবে ? তাই, ভারাক্রান্ত চিত্তে, মৌগলি যখন তার অজস্র

স্মৃতিমাখা শিলাখণ্ডে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে একদিন সভার সামনে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সে শুধু অল্প কয়েক জনকে উপস্থিত দেখতে পেল। বালু, এখন বয়সের জন্য চোখে প্রায় কিছুই দেখে না, মৌগলির চার ভাই, আর শীতল রক্ত ও বিশাল দেহের কা। আকেলার শূন্য আসনের চারপাশে কা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

মৌগলি দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ধপ করে ওখানে বসে পড়তেই কা বলল, তাহলে মানবশিশু, এখানেই তোমার চিহ্নরেখা শেষ হচ্ছে ? কাঁদো, মানবশিশু। কাঁদো। তুমি আর আমি এক রক্তের, একসঙ্গে আমরা দু'জন, মানুষ আর সাপ।

মৌগলি কাতর কণ্ঠে বলল, কেন লাল কুকুরদের সঙ্গে যুদ্ধে আমি মারা গেলাম না ? আমার শরীর থেকে সব শক্তি বিদায় নিয়েছে, আর এটা কোনো বিষের ক্রিয়া নয়। দিনরাত আমি আমার পেছন পেছন আরেকটা পদধ্বনি শুনি। আমি মাথা ঘোরালেই কেউ যেন মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। আমি গাছের পেছনে তাকে খুঁজতে যাই, সে সেখানে নেই। আমি চিৎকার করে ডাকি, কেউ সে চিৎকারের জবাব দেয় না। কিন্তু মনে হয়, কেউ যেন সেই ডাক শুনতে পেয়েছে। কিন্তু উত্তরটা ধরে রেখেছে। আমি শুই কিন্তু আমার কোনো বিশ্রাম হয় না। আমি বসন্তের দৌড় দৌড়াই কিন্তু আমার দেহ-মন শান্ত হয় না। আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করি কিন্তু আমার শরীর ঠাণ্ডা হয় না। শিকারে আমি বিরক্তি বোধ করি, অথচ শিকার করা ছাড়া অন্য কোনো লড়াই-এ আমি উৎসাহ পাই না। আমার ভেতরে লাল ফুল জ্বলছে আর আমার হাড়গুলি যেন জলের মতো শীতল-তরল। আমি জানি না কী আমি জানি।

মৌগলি যেখানে শুয়ে ছিল সেদিকে তার মাথা ঘুরিয়ে বালু ধীরে ধীরে বলল, এত কথার দরকার কী ? নদীর পাশে আকেলা বলেছিল, মৌগলি মৌগলিকে মানুষদলের কাছে তাড়িয়ে দেবে। আমি সে কথা বলেছি। কিন্তু বালুর কথায় কে কান দেয় ? বাঘিরা— আজ এই রাতে বাঘিরা কোথায় ?— সেও জানে। এটাই আইন।

কা তার বিশাল কুণ্ডলী একটু নাড়িয়ে বলল, মানবশিশু, শীতল গুহায় আমাদের যখন দেখা হয়, তখনই আমি এটা জানতাম। শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের কাছে ফিরে যায়, যদিও অরণ্য তাকে বার করে দেয় না।

ভাই চারজন পরস্পরের দিকে আর মৌগলির দিকে তাকাল, বিভ্রান্ত কিন্তু অনুগত।

মৌগলি থেমে থেমে বলল, অরণ্য তা হলে আমাকে বার করে দিচ্ছে না ?

ধূসর ভাই আর তার তিন সঙ্গী ভীষণভাবে গর্জে উঠে বলতে শুরু করল, যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে আছি কারো সাহস হবে না— কিন্তু বালু তাদের থামিয়ে দিল। সে বলল, আমি তোমাদের আইন শিখিয়েছি। এ বিষয়ে আমারই কথা বলা সঙ্গত। আর আমি যদিও এখন আমার সামনের টিলাগুলিও দেখতে পাই না, তবুও আমার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। ছোট্ট ব্যাঙ, তোমার নিজস্ব পদচিহ্নরেখা অনুসরণ কর তুমি ; তোমার আপন রক্ত, দল, আর লোকদের মধ্যে তুমি তোমার বাসা বাঁধো ; কিন্তু যদি কখনো পা কিংবা দাঁত কিংবা চোখের প্রয়োজন পড়ে, কিংবা যদি কখনো কোনো খবর দ্রুত কোথাও পাঠাবার দরকার হয়, তখন অরণ্যের প্রভু, মনে রেখো যে সমগ্র অরণ্য তোমার আজ্ঞাধীন।

কা বলল, মধ্যঅরণ্যও তোমার।

মৌগলি দু'হাত উপরে তুলে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, হায়-মাঈ! ভাইরা আমার, আমি জানি না কী আমি জানি! আমি যেতে চাই না, কিন্তু আমার দুই পা আমাকে টানছে। কেমন করে আমি এইসব রাত ছেড়ে থাকব ?

বালু আবার বলল, না, ছোট্ট ভাই। মুখ তোলো। এরকম শিকারের মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। মধু খাওয়া হয়ে গেলে আমরা শূন্য চাককে ফেলে রেখে চলে আসি।

কা বলল, খোলস ছাড়ার পর আমরা কেউ তার মধ্যে নতুন করে আবার প্রবেশ করি না। এটাই আইন।

বালু বলল, আমার সব চাইতে যে প্রিয়, তাকে বলছি, শোনো। তোমাকে এখানে ধরে রাখার মতো কোনো কথা নেই, কোনো ইচ্ছা নেই। মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে। অরণ্যের প্রভুকে কে প্রশ্ন করবে ? তুমি যখন ছোট্ট একটা ব্যাঙ ছিলে, তখন আমি তোমাকে ঐখানে সাদা পাথরের নুড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখেছি। আর বাঘিরা, যে সদ্য শিকার করা একটা তরুণ ষাঁড়ের মূল্যে তোমাকে কিনেছিল, সেও দেখেছে। সেদিন ওই পর্যবেক্ষণের সময় যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে শুধু আমরা দুজন বেঁচে আছি। রক্ষা, তোমার গুহা-মাতা, আর তোমার গুহা-পিতা, তারা দুজনই মারা গেছে। পুরনো নেকড়ে দল অনেক কাল আগে ভেঙে গেছে। শের খান কোথায় গেছে তুমি তা জানো, আর আকেলা মৃত্যুবরণ করেছে লাল কুকুরদের মধ্যে, আর তোমার প্রজ্ঞা ও শক্তি না থাকলে সিওনির দ্বিতীয় দলও সেদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এখন এক

মানবশিশু তার দলের অনুমতি চাইছে না, বরং অরণ্যের প্রভু তার নতুন পথে যাবার কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তার কাজকর্ম সম্পর্কে মানুষকে কে প্রশ্ন করবে ?

মৌগলি বলল, কিন্তু বাঘিরা আর যে ষাঁড়ের মূল্যে আমাকে কেনা হয়েছিল—

তার কথা শেষ না হতেই একটা গর্জন আর নিচে ঝোপের মধ্যে একটা ভারি পতনের শব্দ শোনা গেল। তারপরই লঘু, বলিষ্ঠ, ভয়ঙ্কর বাঘিরাকে মৌগলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সে তার ডান থাবাটা বাড়িয়ে দিল। সেখান থেকে রক্ত ঝরছিল। বাঘিরা বলল, তোমার ডাক শুনে আমি আসি নি। তখন আমি শিকার করছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল ওই শিকারপর্ব। কিন্তু এখন ওটা ওই ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে।

দেড় বছর বয়সের একটা ষাঁড়। ছোট্ট ভাই, ওই ষাঁড় তোমাকে মুক্ত করেছে। সব ঋণ এখন পরিশোধিত। বাকিটুকুর ক্ষেত্রে বালুর যে কথা সেটা আমারও কথা। সে মৌগলির পা চেটে দিল। তারপর সে গলা তুলে বলল, মনে রেখো, বাঘিরা তোমাকে ভালোবাসে। বলেই সে এক লাফে ছুটে চলে গেল। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে সে আরেকবার দীর্ঘ চিৎকার করে উচ্চকণ্ঠে বলল, অরণ্যের প্রভু, তোমার নতুন পথে শুভ শিকার! মনে রেখো, বাঘিরা তোমাকে ভালোবাসে।

বালু বলল, সব তুমি শুনলে। আর কিছু নেই। এখন যাও। তবে যাবার আগে আমার কাছে একবার আসো। ও বিজ্ঞ ছোট্ট ব্যাঙ, আসো আমার কাছে।

মৌগলি অন্ধ ভালুকের পার্শ্বদেশে মাথা রেখে, দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকল, আর বালু তার দুর্বল ঠোঁট দিয়ে মৌগলির পা দুটি চাটবার চেষ্টা করল, আর কা বলল, খোলস ছাড়াটা একটা কঠিন কাজ।

প্রভাতের বাতাস শুঁকতে শুঁকতে ধূসর ভাই বলল, তারাগুলি নিভে যেতে শুরু করেছে। তো, আজ রাতে আমরা কোথায় বাসা বাঁধব ? কারণ, এখন থেকে আমরা অনুসরণ করব নতুন চিহ্নরেখা।

আর মৌগলি গল্পমালার এটাই হলো শেষ গল্প।